ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

পঞ্চতন্ত্রে সমাজনীতি ও রাজনীতি

(Social Policy and Politics in Panchatantra)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক

অধ্যাপক

সংস্কৃত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা – ১০০০

গবেষক

কালিদাস ভক্ত

সহকারী অধ্যাপক

সংস্কৃত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা – ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি আনন্দের সাথে প্রত্যয়ন করছি যে, কালিদাস ভক্ত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ‘পঞ্চতন্ত্রে সমাজনীতি ও রাজনীতি’ **(Social Policy and Politics in Panchatantra)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করেছে। আমার জানামতে ইতঃপূর্বে এই শিরোনামে কোথাও কোনো গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়নি। আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। অত্র অভিসন্দর্ভে যে সব পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছে তা অধ্যায় শেষে তথ্য নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছে। এটি তাঁর নিজস্ব, মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমি অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি এবং গবেষকের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক)

তত্ত্বাবধায়ক

ও

অধ্যাপক

সংস্কৃত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমি অধ্যাপক ড. দুলাল কান্তি ভৌমিকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ‘পঞ্চতন্ত্রে সমাজনীতি ও রাজনীতি’ **(Social Policy and Politics in Panchatantra)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করেছি। অত্র অভিসন্দর্ভে যে সব পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তা অধ্যায় শেষে তথ্য নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছি। নির্দেশিত অংশ ব্যতীত এটি আমার নিজস্ব, মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। ইতঃপূর্বে এই শিরোনামে কোথাও কোনো গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়নি। আমি অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

কালিদাস ভক্ত

পিএইচ.ডি. গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. দুলাল কান্তি ভৌমিকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'পঞ্চতন্ত্রে সমাজনীতি ও রাজনীতি' শিরোনামে এই অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়েছে। তাঁর সার্বিক দিকনির্দেশনা ও উৎসাহের কারণেই আমি গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। আমি তাঁর অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও ভালোবাসা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি সংস্কৃত বিভাগের আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাসের অবদানকে, যিনি গবেষণাকর্ম সুসম্পন্ন করার জন্য নানাভাবে পরামর্শ দিয়েছেন। প্রতি মুহূর্তে অনুপ্রেরণা ও পরামর্শ দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. অসীম সরকার। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহাশীষ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। গবেষণার প্রতি মনোনিবেশ করতে সার্বিক পরামর্শ দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য আমার শ্রদ্ধেয় জনাব এস এম বাহালুল মজনুন চুন্নু। তাঁর প্রতি জানাই অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা। গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম মফিজুর রহমান। গবেষণাকর্মে সার্বিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান নমিতা মণ্ডল ও বিভাগীয় সহকর্মী ড. চন্দনা রাণী বিশ্বাস, ড. ময়না তালুকদার, ড. সঞ্চিতা গুহ। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণাকর্মে মনোনিবেশ করতে সার্বক্ষণিক উৎসাহ দিয়েছেন আমার সহধর্মিণী ইডেন মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক সুইটি রানী মোদক। গবেষণা সংক্রান্ত নানা সহযোগিতা ও পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীদের। গবেষণাকালে আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লেখকদের মূল্যবান বই ও শিক্ষকদের পরামর্শ নিয়েছি। সে সকল লেখক ও শিক্ষকদের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত বিভাগের সেমিনার, বাংলা বিভাগের সেমিনার, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সেমিনার, জগন্নাথ হল গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এই সুযোগে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাবা-মা ও দাদা-বৌদির পরম আশীর্বাদ আমাকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করেছে। কম্পিউটার কম্পোজ ও অক্ষরবিন্যাসসহ বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করেছে আমার বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা শৈবাল দে ও অফিসের প্রধান সহকারী উজ্জ্বল পাল, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার-মুদ্রাক্ষরিক সঞ্জয় সরকার ও আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র আবির কুমার দে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও যেসকল শুভাকাঙ্ক্ষী এই গবেষণা কাজে নিরন্তর উৎসাহ-প্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁদের জানাই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

কালিদাস ভক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
ভূমিকা	:		১ – ৮
প্রথম অধ্যায়	:	সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৯ – ২২
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের ধারা	২৩ –৪৩
তৃতীয় অধ্যায়	:	গল্পসাহিত্য হিসেবে পঞ্চতন্ত্রের মূল্যায়ন	৪৪ – ৮১
চতুর্থ অধ্যায়	:	পঞ্চতন্ত্রে সমাজনীতি	৮২ –১৫৬
পঞ্চম অধ্যায়	:	পঞ্চতন্ত্রে রাজনীতি	১৫৭ –২৩৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	পঞ্চতন্ত্রে নীতিশিক্ষা	২৩৬ – ২৬০
সপ্তম অধ্যায়	:	পঞ্চতন্ত্রে সমাজনীতি ও রাজনীতির আলোচনায় বিষ্ণুশর্মার সার্থকতা	২৬১ –২৭৪
উপসংহার	:		২৭৫ – ২৮২
সহায়ক গ্রন্থাবলি	:		২৮৩ – ২৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সাহিত্যে গল্পের ভূমিকা অপরিহার্য। গল্প মানব জীবনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক বিষয়। গল্প ব্যতীত হৃদয় ও মনের পরিস্ফুটন হয় না। কোনো বাস্তব বিষয়ের চেয়ে গল্পে বর্ণিত কল্পনার জগৎ অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক। *কালের পুত্তলিকা* গ্রন্থে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন–

> এক লক্ষ বছরের আগেরকার নিয়ানডারথাল মানুষের জীবনযাত্রার যে প্রামাণ্য উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার থেকে আমরা অনায়াসে অনুমান করতে পারি, মানুষ তখন মনের ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিল। চতুর্থ বরফ যুগের মানুষ যখন গুহাবন্দী ছিল তখন সে মনোভাব প্রকাশ করত গুহাচিত্রে। সে চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তা থেকেই অনুমান করতে পারি মানুষ তার ভয় ও উল্লাস প্রকাশের মাধ্যম খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার মনের মধ্যে গল্পের জন্ম হচ্ছে।[১]

তাই বলা যায় মানুষের মনের এই আনন্দ-উল্লাস-উচ্ছ্বাস থেকে গল্পের সৃষ্টি হয়েছে।

সংস্কৃত কাব্য প্রধানত দুই প্রকার – দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। শ্রব্যকাব্য আবার তিন প্রকার – গদ্য, পদ্য ও মিশ্র। এই মিশ্র কাব্যের একটি শ্রেণিভেদই গল্পসাহিত্য। গদ্যকাব্য থেকে কথা, আখ্যায়িকা, খণ্ডকথা, পরিকথা ও কথানিকার সৃষ্টি। এগুলোকে এক কথায় বলা হয় উপকথা। এই উপকথাই গল্পসাহিত্য।

গল্পসাহিত্য সম্পর্কে বিভিন্নজন বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী *নারায়ণ-প্রণীত হিতোপদেশে* গল্পসাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন –

> রাজনীতি-শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, এবং অন্যান্য শাস্ত্রের জটিল, নিরস তত্ত্ব সদ্যোযুবকের মনে আগ্রহের বদলে বিরাগের সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু গল্পের মাধ্যমে সেই তত্ত্বগুলি সরসভাবে পরিবেশন করা যায়, তবে তা গ্রহণ করতে কারুর মনে বিরক্তি আসে না – ক্লান্তিকরও মনে হয় না। ফলে একই সঙ্গে উপদেশ বা নীতিশিক্ষা লাভ এবং চিত্ত-বিনোদন – দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় গল্পসাহিত্যের মাধ্যমে।[২]

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে গল্পকে বলা হয় কথা। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ কথাকাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন –

কথায়াং সরসং বস্তু গদ্যৈরেব বিনির্মিতম্॥
ক্বচিদত্র ভবেদার্যা ক্বচিদ্ বক্ত্রাপবক্ত্রকে।
আদৌ পদ্যৈর্নমস্কারঃ খলাদের্বৃত্তকীর্ত্তনম্॥[৩]

অর্থাৎ, রসাত্মক বিষয় নিয়ে গদ্যে রচিত কাব্যকে কথাকাব্য বলে। কথাকাব্যে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য থাকে, কোনো অংশে আর্যা, কোনো অংশে বক্ত্র এবং কোনো অংশে অপবক্ত্র ছন্দের রচনা থাকে। এর প্রথমে পদ্যে রচিত নমস্কার এবং দুষ্ট ব্যক্তির ঘটনা বিবৃত হয়। *পঞ্চতন্ত্রে* এসব লক্ষণ যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অতএব *পঞ্চতন্ত্র* একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণির কথাকাব্য বা গল্পসাহিত্য।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *সোনার তরী* কাব্যে 'বর্ষাযাপন' কবিতায় গল্পরচনার পটভূমি সম্পর্কে বলেছেন –

ইচ্ছে করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।

এ থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্প লেখার উৎসাহ বা ভাবাবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শতশত গল্প রচনা করে তাঁর আবেগকে বাস্তবে রূপায়িতও করেছেন এবং গল্পের মাধ্যমে পাঠকদের আনন্দ দিয়েছেন। তাঁর *গল্পগুচ্ছ* পাঠকসমাজে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও সমাদৃত।

অমিতা চক্রবর্তী *পঞ্চতন্ত্রম্*-এর *বিষ্ণুশর্মা প্রণীতম্ মিত্রভেদ* গ্রন্থে বলেছেন –

> গদ্যরীতির চরমোৎকর্ষ ঘটেছিল দণ্ডী, সুবন্ধু, বাণভট্টের রচনায়। যেগুলিকে আলঙ্কারিকেরা গদ্যকাব্য আখ্যা দিয়েছেন। এই ধরনের অতি পরিশীলিত রচনা ছাড়াও গদ্যসাহিত্যের আর

Dhaka University Institutional Repository

একটি ধারা নানা গল্পের আকারে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলছিল। এগুলিকে পণ্ডিতেরা সাধারণভাবে 'গল্পসাহিত্য' এই শিরোনাম দিয়ে আলোচনা করেছেন।[৪]

বিমান ভট্টাচার্য *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা* গ্রন্থে বলেছেন –

> গল্পসাহিত্য সৃষ্টির পেছনে তিনটি কারণ রয়েছে – অবসর যাপন, চিত্তবিনোদন, রাজকুমারদের শিক্ষাদান। রাজদরবারে কোমলমতি রাজকুমারদের অর্থশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করে তোলার জন্য রাজারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের নিযুক্ত করতেন। রাজকুমারদের সুকুমারচিত্তে অর্থ ও নীতিশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বসমূহ যাতে অতি সহজে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ গল্পকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করতেন। গল্প মূলত শিশুশিক্ষার যথার্থ মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা হতো। গল্পের চরিত্ররূপে পশু-পাখিদের নির্বাচিত করে শিশুশিক্ষার পুরোধাগণ শিশুদেরকে জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত করার চেষ্টা করেছেন। গল্পসাহিত্যের অন্তর্গত গল্পগুলির তাই দুটি সুনির্দিষ্ট ভাগ রয়েছে। এক ভাগের চরিত্রগুলি মানুষ আর এক ভাগের চরিত্রগুলি পশুপাখি। সামগ্রিকভাবে উভয় শ্রেণির গল্পসাহিত্যই popular tales এর অন্তর্গত তবে দ্বিতীয় শ্রেণির গল্পগুলিকে কিছুটা স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়ার জন্য ইংরেজিতে বলা হয় fables। সাধারণত গল্পের আখ্যানভাগকে শিশুদের বোঝার সুবিধার্থে সহজ অনাড়ম্বর ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে এবং সমগ্র গল্পটি পড়ে শিশু যাতে তার নীতি কথাটি সহজে মনে রাখতে পারে সে উদ্দেশ্যে গল্পে নীতিশ্লোক সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সে হিসেবে গল্পসাহিত্য যথার্থ নীতির ধারক।[৫]

সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রেষ্ঠতম ও প্রাচীনতম গল্পগ্রন্থ হচ্ছে *পঞ্চতন্ত্র*। এখানে গল্পের বিশাল ভাণ্ডার সঞ্চিত রয়েছে। ছোটবেলায় শিশুরা মায়ের কোলে কিংবা ঠাকুরমার কোলে বসে খরগোশ-কচ্ছপ, বক ও কাঁকড়া, ব্রাহ্মণী ও বেঁজির প্রভৃতি গল্প শুনে থাকে। আর সেগুলোর উৎসই হচ্ছে *পঞ্চতন্ত্র*। *পঞ্চতন্ত্র*-এর লেখক পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা। তাঁর আবির্ভাবকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক কিংবা তার কিছু পরবর্তী সময়ে। বিষ্ণুশর্মা তাঁর প্রকৃত নাম কি না এ সকল ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সঠিকভাবে জ্ঞাত হবার কোনো উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতদের কেউই নিজ নিজ গ্রন্থে তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত তথা লৌকিক পরিচয় সন্নিবেশিত করেননি। তাঁরা কোন সময়, কোন দেশে,

Dhaka University Institutional Repository

কোন বংশে আবির্ভূত হয়েছেন তার ঐতিহাসিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁরা আত্মপরিচয় না দিয়ে আত্মবিস্তৃত হয়ে ভাবাবেগে জ্ঞান চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। তাতে সিদ্ধ হলেই সৃষ্টির আনন্দে পরিতৃপ্তি লাভ করতেন। গ্রন্থে নাম-ধাম, পুষ্পিকা-ভনিতা প্রভৃতি পরিচয় দিতে হয় সে সম্পর্কে তাঁদের কোনো উদ্যোগই ছিল না। বিষ্ণুশর্মা এ রকম ভাবধারার লেখক। তবে তিনি *পঞ্চতন্ত্রে* শুধু গল্প বলেই ক্ষান্ত হননি, গল্পের মাধ্যমেই বাস্তব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ দিকের ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বিশেষ করে সহজ-সরল ভাষায় ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, মানুষের আচার-ব্যবহার, ভ্রষ্টা নারীর বিবিধ বিবরণ, প্রকৃতির নানা বিষয়, রোমাঞ্চ, ধর্মশিক্ষা, মানবতা, মনস্তত্ত্ব, আদর্শজীবন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করেছেন। দাক্ষিণাত্যের রাজা ছিলেন অমরশক্তি। তাঁর অমনোযোগী তিন মূর্খ পুত্রকে সর্বশাস্ত্রে শিক্ষিত করার জন্য বিষ্ণুশর্মাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি রাজপুত্রদের শেখানোর জন্য সর্বশাস্ত্রের সারস্বরূপ *পঞ্চতন্ত্র* রচনা করেন। রাজপুত্রদের রাজনীতিতে মাত্র ছয় মাসে অসাধারণ পণ্ডিত করে দিবেন এটা ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। বিষ্ণুশর্মা এই রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে সমাজের কথাও চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চতন্ত্র রচনার পেছনে *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর প্রভাব লক্ষণীয়। লেখক *রামায়ণ-মহাভারত* গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলো থেকে নানা উপমা ও বিভিন্ন চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন–

পৌলস্ত্যঃ কথমন্যদারহরণে দোষং ন বিজ্ঞাতবান্
রামেণাপি কথং ন হেমরিণস্যাসম্ভবো লক্ষিতঃ।
অক্ষৈশ্চাপি যুধিষ্ঠিরেণ সহসা প্রাপ্তো হ্যনর্থঃ কথং
প্রত্যাসন্নবিপত্তিমূঢ়মনসাং প্রায়ো মতিঃ ক্ষীয়তে॥ ২/৪

অর্থাৎ, পরস্ত্রীহরণ যে দোষণীয় রাবণের তা অজানা ছিল না। সোনার হরিণ পাওয়া যে অসম্ভব রাম তা ভালো করেই জানতেন। অনুরূপভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও জানতেন পাশা

Dhaka University Institutional Repository

খেলা সর্বনাশের কারণ। মূলত বিপদ ঘনিয়ে এলে মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে গিয়ে বুদ্ধিনাশ ঘটে।

পঞ্চতন্ত্রে কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এর প্রভাবও লক্ষণীয়। গল্পের শুরুতেই অর্থ উপার্জনের উপায় এবং অর্থের গুরুত্ব সম্পর্কে বিষ্ণুশর্মা *অর্থশাস্ত্র*-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।[৬]

সংস্কৃত গল্পসাহিত্য কীভাবে এত সমৃদ্ধ হয়েছে তা জানতে হলে অবশ্যই বিষ্ণুশর্মার *পঞ্চতন্ত্র* গল্পগ্রন্থখানি ধরে নিয়ে এগুতে থাকলে সামনে যে ভুবন দেখা তা যথেষ্টই প্রসস্থ। তিনি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মহামূল্যবান এই নীতিশাস্ত্রখানি রচনা করেন। পরবর্তীতে এর অনুকরণে কয়েকখানা বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন – *কথাসরিৎসাগর, হিতোপদেশ, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, বেতালপঞ্চবিংশতি, দশকুমারচরিত* প্রভৃতি।

বিষ্ণুশর্মার *পঞ্চতন্ত্রে* সমাজনীতি ও রাজনীতির নানা বিষয়ের প্রাধান্য লক্ষণীয়। মূল গ্রন্থ পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। এই পাঁচটি খণ্ডের নাম হলো – মিত্রলাভ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রণাশ, অপরীক্ষিতকারক। বিষ্ণুশর্মা রাজপুত্রদের শেখানোর জন্য সর্বশাস্ত্রের সারস্বরূপ এই *পঞ্চতন্ত্র* রচনা করেন। ফলে গল্পগ্রন্থটি হয়েছে অত্যন্ত উপভোগ্য।

অভিসন্দর্ভটি সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম হলো – সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এখানে *পঞ্চতন্ত্র*-সহ অন্যান্য গল্পগ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থগুলো হলো – *কথা-সরিৎসাগর, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, শুকসপ্ততিকথা, হিতোপদেশ, বেতালপঞ্চবিংশতি, পুরুষপরীক্ষা* ও *আরব্যযামিনী* ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় – সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের ধারা বিশ্লেষণ। গল্পসাহিত্য সুপ্রাচীন কাল থেকে আর্থাৎ বৈদিক যুগ থেকে শুরু হয়ে নানাভাবে অগ্রযাত্রার মাধ্যমে ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে এসে প্রবেশ করেছে। এ বিষয়গুলো দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে গল্পসাহিত্য হিসেবে *পঞ্চতন্ত্র*-এর মূল্যায়ন করা হয়েছে। গল্পসাহিত্য হিসেবে *পঞ্চতন্ত্র*-এর মূল্যায়নের জন্য কতগুলো বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, যেমন – মনীষীদের গবেষণালব্ধ মন্তব্য, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় *পঞ্চতন্ত্র*-এর সংস্করণ, সবকিছুতে সমদর্শন, মনস্তাত্ত্বিক বিষয়, শিশুশিক্ষায় গুরুত্বারোপ, হাস্যরস ও ব্যঙ্গ প্রকাশ, সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ, বিভিন্ন সাহিত্যে পঞ্চতন্ত্র-এর প্রভাব। এ বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে *পঞ্চতন্ত্র*-এর মূল্যায়ন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনার বিষয় হলো – *পঞ্চতন্ত্রে* সমাজনীতি। এ অধ্যায়ে তৎকালীন সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, নারীদের অবস্থা, ধর্ম, কৃষি, খাদ্য, জ্যোতিষশাস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক ও মানবিক নানা বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে *পঞ্চতন্ত্রে* রাজনীতি বিষয়ে। এ অধ্যায়ে রাজসেবা, রাজধর্ম, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ষড়গুণ তথা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, রাষ্ট্রীয় নীতি-পদ্ধতি, মন্ত্রীদের ধর্ম, দণ্ডবিধান, শত্রুতা, যুদ্ধ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, দুর্গ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ক্রিয়াকলাপ, রাজকর্মচারীদের ভূমিকা ও মতামতের যৌক্তিকতা প্রভৃতি বিষয় নানা যুক্তিতর্কের মাপকাঠিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো – *পঞ্চতন্ত্রে* নীতিশিক্ষা। *পঞ্চতন্ত্র*-এর নীতিশিক্ষা অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। নৈতিক উপদেশে বারিধিসমতুল্য *পঞ্চতন্ত্র* সংস্কৃত সাহিত্যের

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসে অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। এ গ্রন্থে চিত্তবিনোদন ও শিশু-কিশোরদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গল্প রচিত হয়েছে। গল্প পড়ে শিশু যাতে তার নীতিকথাটি সহজে মনে রাখতে পারে সে উদ্দেশ্যে নীতিশ্লোক সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মানব জীবনে নৈতিকতার শিক্ষা যে সবচেয়ে বড় ও মহান শিক্ষা সেটি দেখানো হয়েছে। বস্তুতপক্ষে লেখক শিশু-কিশোরদের জন্য গ্রন্থটি রচনা করলেও সকল বয়সের মানুষের জন্য এটি জ্ঞানগর্ভ পাঠ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে অতিলোভের পরিণতি, বুদ্ধির শক্তি, পরিশ্রমের সুফল, একতার প্রয়োজনীয়তা, অতিউৎসাহী হয়ে কোনো কাজ না করা, অপ্রয়োজনীয় কাজ না করা, দুর্জন বিদ্বান হলেও তাকে ত্যাগ করা, বহুর সঙ্গে বিরোধ না করা, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ইত্যাদি বিষয়ে প্রদত্ত নির্দেশনা সর্বযুগে-সর্বকালে অনুকরণীয়।

সপ্তম অধ্যায়ে *পঞ্চতন্ত্রে* সমাজনীতি ও রাজনীতির আলোচনায় বিষ্ণুশর্মার সার্থকতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। তিনি সমাজনীতি ও রাজনীতির বিচিত্র বিষয় গল্পের মাধ্যমে চমৎকারভাবে পরিবেশন করায় পাঠকমানস ব্যাপকভাবে স্পর্শ করেছেন।

সর্বশেষে অধ্যায়গুলোর আলোচনার মূল বক্তব্য উপসংহারে সন্নিবেশিত হয়েছে। এরপর এ গবেষণায় ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জির তালিকা সংযোজন করা হয়েছে। আমি আশা করি অভিসন্দর্ভটি পাঠ করে গবেষক, রাজনীতিক, সমাজবিজ্ঞানী, ধর্মবেত্তা সর্বোপরি সর্বস্তরের পাঠকগণ *পঞ্চতন্ত্রে* উল্লিখিত সমাজনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান ও তার ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা,* চতুর্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২

২. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, *নারায়ণ-প্রণীতঃ হিতোপদেশঃ,* তৃতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৮ পৃ. ১১

৩. শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণঃ,* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৮৯

৪. অমিতা চক্রবর্তী, *বিষ্ণুশর্মা প্রণীতম্ পঞ্চতন্ত্রম্ মিত্রভেদ,* প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২

৫. বিমান ভট্টাচার্য, *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা,* বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, ষোড়শ মুদ্রণ, ২০০৪, পৃ. ১৪৬-১৪৭

৬. যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যর্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।

যস্যার্থাঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ॥
ন সা বিদ্যা ন তদ্ দানং ন তচ্ছিল্পং ন সা কলা।
ন তৎ স্থৈর্যং হি ধনিনাং যাচকৈর্যন্ন গীয়তে॥
ইহ লোকে হি ধনিনাং পরোঽপি স্বজনায়তে।
স্বজনোঽপি দরিদ্রাণাং সর্বদা দুর্জনায়তে॥ (১/৩-৫)

প্রসূন বসু সম্পাদিত, বিষ্ণুশর্মা, *পঞ্চতন্ত্রম্, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* ১৫দশ খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, পৃ. ২৩৬ [উল্লেখ্য যে, উক্ত গবেষণায় *পঞ্চতন্ত্র*-এর সমস্ত উদ্ধৃতি এ সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।]

প্রথম অধ্যায়

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সংস্কৃত ভাষায় গল্পসাহিত্যের অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাণ্ডার লক্ষ্য করা যায়। গল্পসমূহ পুরাতন রূপ পরিবর্তন করে নতুনরূপ পরিগ্রহ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *পঞ্চতন্ত্র, কথা-সরিৎসাগর, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, শুকসপ্ততিকথা, হিতোপদেশ, বেতালপঞ্চবিংশতি* এবং *পুরুষপরীক্ষা* ইত্যাদি। এই গল্পগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো –

পঞ্চতন্ত্র: সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ *পঞ্চতন্ত্র*। এখানে দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির তিন মূর্খ পুত্র বসুশক্তি, উগ্রশক্তি, অনেকশক্তিকে গল্পচ্ছলে রাজনীতি-সমাজনীতি তথা সর্বশাস্ত্রে শিক্ষিত করার জন্য রাজার অনুরোধে বিষ্ণুশর্মা *পঞ্চতন্ত্র* রচনা করেন। মূলগল্প পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত বলে *পঞ্চতন্ত্র* নাম হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্র*-এর কথামুখে গল্পকার তা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছেন। পাঁচটি তন্ত্রের নাম হলো – মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রণাশ ও অপরীক্ষিত কারক।[১]

মিত্রভেদ: প্রথম তন্ত্র মিত্রভেদের বিষয়বস্তু হলো – বর্ধমান নামে এক বণিকের সঞ্জীবক নামে এক ষাঁড়ের সঙ্গে দমনক নামে এক ধূর্ত শেয়াল পিঙ্গলক নামে পশুরাজ সিংহের সাথে প্রথমে বন্ধুত্ব করিয়ে দিয়ে তারপর তাদের বন্ধুত্ব ভেঙ্গে দেয় এবং পরবর্তীতে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পিঙ্গলকে দিয়ে সঞ্জীবককে হত্যা করায়। এখানে মোট তেইশটি গল্প রয়েছে। যেমন – ১) গোঁজ-উপড়োনো বানর ২) শেয়াল ও দামামা ৩) দন্তিল ও গোরম্ভ ৪) সন্ন্যাসী ধূর্ত ও দুই দুষ্টা ৫) বিষ্ণুরূপধারী তাঁতি ৬) কাকী কেউটে ও সোনার হার ৭) বক ও কাঁকড়া ৮) খরগোস ও সিংহ ৯) উকুন ও ছারপোকা ১০) নীলবর্ণ শেয়াল ১১) সিংহ উট ও কাক ১২) সমুদ্র ও টিট্টিভ ১৩) দুই হাঁস ও কচ্ছপ ১৪) অনাগতবিধাতা ১৫) চড়ুই কাঠঠোকরা মাছি ব্যাঙ ও হাতি ১৬) সিংহ শেয়াল ও উট ১৭) বানররা ও সূচীমুখ

১৮) বানর ও চড়ুইনী ১৯) ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি ২০) বক ও বেঁজি ২১) জীর্ণধন ও শ্রেষ্ঠী ২২) রাজা ও বানর ২৩) চোরপণ্ডিত ও বিদেশীরা ।

মিত্রপ্রাপ্তি: দ্বিতীয় তন্ত্র মিত্রপ্রাপ্তি'র মূল গল্পটি হলো – ব্যাধের জালে আটকা পড়ে, পায়রারাজ চিত্রগ্রীবের পরামর্শে কবুতরদের ব্যাধের জালসমেত উড়ে যাওয়া দেখে লঘুপতনক নামে কাক চিত্রগ্রীবের পিছনে-পিছনে গিয়ে ইঁদুর হিরণ্যকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। তারপর সেদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ায় চলে যায় কচ্ছপ-বন্ধু মন্থরকের কাছে। হিরণ্যকও সবকিছু হারিয়ে মনের দুঃখে তার সঙ্গ নেয়। চিত্রাঙ্গ নামে এক হরিণও সেখানে তাদের বন্ধু হলো। একদিন চিত্রাঙ্গ ব্যাধের জালে আটকা পড়ে। হিরণ্যক তার বাঁধন কেটে দিলেও মন্থরক ব্যাধের হাতে ধরা পড়ে অবশেষে লঘুপতনকের বুদ্ধিতে উদ্ধার পায়। এখানে আছে মোট ছয়টি গল্প – ১) হিরণ্যকের আত্মকথা ২) ব্রাহ্মণীর তিলের লাড্ডু ৩) অতি লোভী শেয়াল ৪) প্রাপ্তব্যমর্থ ৫) সোমিলক গুপ্তধন ও উপভুক্তধন এবং ৬) ষাঁড় ও শেয়ালদম্পতি ।

কাকোলূকীয়: তৃতীয় তন্ত্র কাক ও উলূকীয়ের সারসংক্ষেপ হলো – কাকরাজ মেঘবর্ণের আবাসস্থলে পেঁচারাজ অরিমর্দন প্রতি রাতে আক্রমণ করে কাকদের হত্যা করত। মেঘবর্ণের বিজ্ঞ মন্ত্রী স্থিরজীবী মেঘবর্ণের সাথে কপটকলহ করে অরিমর্দনের বন্ধু সেজে তার দুর্গে যায় এবং কৌশলে পেঁচাদের পুড়িয়ে মারে। এখানে আছে চৌদ্দটি গল্প – ১) কাক ও পেঁচার চিরশত্রুতার কারণ নিয়ে গল্প ২) হাতির দল ও খরগোসেরা ৩) চড়ুই খরগোস ও বিড়াল ৪) মিত্রশর্মা ও তিন ধূর্ত ৫) কেউটে ও পিঁপড়েরা ৬) হরিদত্ত ও ক্ষেত্রদেবতা ৭) রাজা ও সোনার হাঁসের দল ৮) ব্যাধ ও কপোতদম্পতি ৯) ব্রাহ্মণ চোর ও ব্রহ্মদৈত্ত ১০) রাজপুত্র রাজকন্যা ও দুই সাপ ১১) সিম্মুক পাখি ও সোনার পুরীষ ১২) সিংহ, শেয়াল ও শেয়ালের গুহা ১৩) কেউটে ও ব্যাঙেরা ১৪) ব্রাহ্মণ ও দুষ্টা ব্রাহ্মণী।

লব্ধপ্রণাশঃ চতুর্থ তন্ত্র লব্ধপ্রাশের মূল গল্পটি হলো – করালমুখ নামে এক কুমির স্ত্রীর কুপরামর্শে তার বন্ধু বানরকে হত্যার পরিকল্পনা করে চিরদিনের জন্য বন্ধুকে হারালো । এখানে আছে সতেরটি গল্প – ১) ব্যাঙ ও কেউটে ২) সিংহ শেয়াল ও গাধা ৩) কুমোর যুধিষ্ঠির ৪) সিংহ সিংহী ও শেয়ালেরবাচ্চা ৫) বাঘের চামড়াপরা গাধা ৬) চার জামাই ৭) বোকা ছুতোর ৮) পূনমূর্ষিকা ৯) তিন মুনি ১০) বৃদ্ধ বণিক ও চোর ১১) তাঁতি-বৌ ও শেয়ালনী ১২) চড়ুইনী ও বানর ১৩) ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ও পঙ্গু ১৪) নন্দ ও বররুচি ১৫) লায়েক উট ১৬) মরা হাতি ও শেয়াল ১৭) চিত্রাঙ্গর বিদেশবাসের অভিজ্ঞতা।

অপরীক্ষিতকারকঃ পঞ্চম তন্ত্র অপরীক্ষিতকারকের মূল গল্পটি হলো – মণিভদ্র নামে এক বণিককে পূর্বপুরুষের ধন স্বপ্নে ক্ষপণকের বেশে দেখা দিয়ে বলে, কাল আমি এই বেশে তোমার বাড়িতে আসব। তুমি আমার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করবে, তাহলে আমি অক্ষয় সোনা হয়ে তোমার কাছে থাকব। পরের দিন ঠিক তাই হলো। এক নাপিত এই দৃশ্য দেখে সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে ডেকে এনে মাথায় আঘাত করতে থাকে। এতে সন্ন্যাসীদের মৃত্যু হয়। বিচারে নাপিতের মৃত্যুদণ্ড হলো। এখানে আছে চৌদ্দটি গল্প – ১) ব্রাহ্মণী ও বেঁজি ২) চার ব্রাহ্মণ যুবক ও সিদ্ধবর্তিকা ৩) চার ব্রাহ্মণ যুবক ও মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ৪) চার পণ্ডিতমূর্খ ৫) শতবুদ্ধি সহস্রবুদ্ধি ও একবুদ্ধি ৬) গাধার গান ৭) তাঁতি মন্থরক ৮) ব্রাহ্মণ ও ছাতুর ঘট ৯) রাজা চন্দ্র ও বানরদলপতি ১০) রাজকন্যা রাক্ষস ও চোর ১১) রাজকন্যা অন্ধ ও কুঁজো ১২) রাক্ষস ও ব্রাহ্মণ ১৩) দুমুখো ভারণ্ড এবং ১৪) ব্রহ্মদত্ত ও কাঁকড়া ।

বৃহৎকথাঃ *বৃহৎকথা*'র রচয়িতা গুণাঢ্য। তাঁর কাল আনুমানিক ১ম শতক। জনশ্রুতি অনুসারে বৃহৎকথা পৈশাচী ভাষায় সাত লক্ষ শ্লোকে রচিত হয়েছিল। মূল *বৃহৎকথা* লুপ্ত হয়ে যায় তবে পরবর্তীতে তিনটি সংস্কৃত রচনায় মূল গ্রন্থের গল্পগুলি সংরক্ষিত। যেমন – ১. বুদ্ধস্বামীর *বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহে* ২. ক্ষেমেন্দের *বৃহৎকথামঞ্জরীতে* ৩. সোমদেবের *কথাসরিৎসাগরে*। দেশি বিদেশি কবি ও সমালোচকগণ বিশেষ করে সুবন্ধু, বাণ, দণ্ডী

গুণাঢ্য রচিত *বৃহৎকথা'র* প্রশংসা করেছেন। ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন – প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে *রামায়ণ-মহাভারত*-এর পরেই *বৃহৎকথা*'র মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা।[২] ব্যুলারের মতে – তিনি সম্ভবত সাতবাহন রাজা হালের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর কাল খ্রিস্টাব্দ ১ম বা ২য় শতক। ক্ষেমেন্দ্রের মতে গোদাবরীর তীরে প্রতিষ্ঠানপুর হলো গুণাঢ্যের জন্মস্থান। প্রতিষ্ঠানপুর অন্ধ্রবংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল।

বৃহৎকথার মূল গল্পটি হলো –

একদিন দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীকে সাতজন বিদ্যাধর চক্রবর্তীর কাহিনি বর্ণনা করেন। সেই কাহিনি পুষ্পদন্ত নামে মহাদেবের এক অনুচর আড়ালে বসে শুনে নিজস্ত্রী জয়ার নিকট বর্ণনা করেন। জয়ার মুখ থেকে সেই কাহিনি লোক-সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এই বৃত্তান্ত পার্বতী অবগত হয়ে পুষ্পদন্তকে অভিশাপ দিলেন পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণের জন্য। পুষ্পদন্তের ভ্রাতা মলয়বান পুষ্পদন্তের অভিশাপ প্রশমনের সুপারিশ করায় সেও অনুরূপ অভিশাপগ্রস্থ হলেন। জয়া ছিল পার্বতীর পরিচারিকা। জয়ার পরিচর্যায় পার্বতী খুশি হয়ে অনুগ্রহ করে বললেন, পুষ্পদন্ত যেদিন তার পূর্বজন্মের সমস্ত ঘটনা স্মরণ করে, কর্ণভূতি নামে পিশাচের কাছে বিবৃত করবে সেদিন পুষ্পদন্ত অভিশাপ হতে মুক্তি পাবে। আর কর্ণভূতির কাছ থেকে সেই কাহিনি শুনে যেদিন মলয়বান তা পৃথিবীতে প্রচার করবে সেদিন সেও অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। অভিশপ্ত পুষ্পদন্ত জন্ম গ্রহণ করেন বররুচি-কাত্যায়নরূপে আর মলয়বান জন্ম গ্রহণ করেন গুণাঢ্যরূপে। একদিন রাজা সাতবাহন ব্যাকরণের অজ্ঞানতার জন্য রানিদের কাছে লজ্জিত হয়ে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হন। বৈয়াকরণ শরবর্মা ছয়মাসের মধ্যেই ব্যাকরণে অভিজ্ঞ করে দিবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। গুণাঢ্য শপথ করে বলেন, শরবর্মা যদি রাজাকে ছয়মাসের মধ্যে সংস্কৃতে অভিজ্ঞ করতে পারেন, তবে তিনি জীবনে আর কোন দিন দেশজ ভাষা এমনকি সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষাও ব্যবহার করবেন না। শরবর্মা তাঁর প্রতিজ্ঞানুসারে রাজাকে ছয় মাসের মধ্যেই পারদর্শী করে তুললেন। এমতাবস্থায় গুণাঢ্য লজ্জিত হয়ে মৌনাবলম্বন করে বিন্ধ্যপর্বতে চলে গেলেন। বিন্ধ্যপর্বতে গুণাঢ্যের সাথে কর্ণভূতির দেখা

হলো। তখন কর্ণভূতি বররুচি-কাত্যায়নের কাছে শ্রুত কাহিনি গুণাঢ্যের কাছে বিবৃত করেন। পূর্বপ্রতিজ্ঞানুসারে গুণাঢ্য সংস্কৃত, প্রাকৃত বা কোনো দেশজ ভাষার ব্যবহার না করে নিজের রক্ত দিয়ে সাত লক্ষ শ্লোকে পৈশাচী ভাষায় সেই কাহিনি লিপিবদ্ধ করে রাজা সাতবাহনের নিকট প্রেরণ করেন। রাজা গ্রন্থের সমাদর না বুঝে গুণাঢ্যের কাছে ফেরত পাঠান। গুণাঢ্য মর্মাহত হয়ে গল্পগুলো পড়ে পড়ে পশু-পাখিদের শোনাতে থাকেন এবং এক একটি গল্প পড়া শেষ হয়ে গেলে পঠিত অংশটি আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। গুণাঢ্যের রচনা শুনে বনের পশু-পাখির চোখেও জল আসে এবং আহার-নিদ্রা ভুলে তারা গল্পগুলো শুনে চলে। বনের শিকারকৃত পশু রাজবাড়িতে আনা হলে তা আর আগের মতো হৃষ্টপুষ্ট না অপরদিকে খেতেও সুস্বাদু হয় না। কারণ অনুসন্ধান করে রাজা অনুতপ্ত হয়ে গুণাঢ্যের কাছে দ্রুত চলে এলেন কিন্তু ততদিনে গুণাঢ্য ছয়টি গল্প অগ্নিদগ্ধ করে ফেলেছেন। রাজা এক লক্ষ শ্লোকে রচিত যে অবশিষ্ট কাহিনি উদ্ধার করেন তাই পৃথিবীতে *বৃহৎকথা* নামে অমূল্য গল্পগ্রন্থ।

বৃহৎকথা'র প্রভাবে সংস্কৃত সাহিত্য নানাভাবে প্রসারিত হয়েছে। এর কাহিনি অবলম্বন করে অনেক কাব্য-নাটক রচিত হয়েছে। যেমন – দণ্ডীর *দশকুমারচরিত*, বাণের *কাদম্বরী*, ধনপালের *তিলকমঞ্জরী*, সুবন্ধুর *বাসবদত্তা*, সোমদেবের *যশস্তিলকচম্পূ*, ভাসের *স্বপ্নবাসবদত্ত* ও *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ*, শ্রীহর্ষের *নাগানন্দ* ও *রত্নাবলী* প্রভৃতি। গণিকা মদনমঞ্জুকার আখ্যান *বৃহৎকথা*'র একটি প্রসিদ্ধ গল্প। ভাসের *চারুদত্ত* এবং শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* নাটকের বসন্তসেনার চরিত্র বর্ণনায় আলোচ্য গল্পের প্রভাব রয়েছে। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে – গুণাঢ্য রচিত *বৃহৎকথা* অবলম্বন করে রচিত পরবর্তীতে তিনটি গ্রন্থ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, যেমন – *শ্লোকসংগ্রহ*, *বৃহৎকথামঞ্জরী* এবং *কথাসরিৎসাগর*। তবে এই তিনটি গ্রন্থই পদ্যে রচিত।

বুদ্ধস্বামীর *শ্লোকসংগ্রহ* গ্রন্থটি *বৃহৎকথা*'কে অবলম্বন করে সর্বপ্রধান গল্পসংকলন। এটি আনুমানিক ষষ্ঠ শতকে রচিত। অনেকের মতে গ্রন্থটি অসমাপ্ত। গ্রন্থ সম্পর্কে ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

> নেপালে রচিত বুদ্ধস্বামীর *শ্লোকসংগ্রহ* সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও মূলানুগ। পাণ্ডুলিপি বিচার করে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন গ্রন্থটির রচনাকাল খ্রিস্টীয় ৮ম বা ৯ম শতক। তবে কেউ-কেউ মনে করেন এটি গুপ্তযুগের রচনা। আলোচ্য গ্রন্থ আবিষ্কারের পূর্বে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল কাশ্মীরীয় *কথাসরিৎসাগর* ও *বৃহৎকথামঞ্জরী* মূল *বৃহৎকথা*'র যথাযথ অনুবাদ। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে বোঝা গেল *শ্লোকসংগ্রহই* অধিক মূলানুগ সংস্কলন। এই সূত্রে কেউ-কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন কাশ্মীরের দুই প্রান্তে *বৃহৎকথা*'র দুটি ভিন্ন সংস্করণ প্রচলিত ছিল এবং সোমদেব ও ক্ষেমেন্দ্র প্রত্যেকে পৃথক সংস্করণ অনুসরণ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থকারদ্বয় আপন গ্রন্থের অনুসরণ, বিশাল আকার থেকে সংক্ষেপীকরণ এবং ভাষার ভেদ উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধস্বামীর *শ্লোকসংগ্রহ* সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না ; ২৮টি সর্গ ৪৫৩৯টি শ্লোক অবধি উপলব্ধ। অনুমান করা যায় আলোচ্য গ্রন্থে মোট ২৫০০০ শ্লোক ছিল। নেপালী ও কাশ্মীরী গল্পগুলির মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে। নায়ক-নায়িকাদের বৈচিত্র্যময় জীবনধারা, উদার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের প্রতি গভীর মমতা, বর্ণনার নৈপুণ্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে বুদ্ধস্বামী সার্থক গল্পকার। তিনি সাধারণভাবে সরল রচনারীতির পক্ষপাতী ; তবে কখনও প্রয়োজনবোধে বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি ও বর্ণনারীতি, অপ্রচলিত শব্দচয়ন প্রভৃতিরও পক্ষপাতী ছিলেন।[২]

ক্ষেমেন্দ্রের *বৃহৎকথামঞ্জরী* একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত বলে ধারণা করা হয়। ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীররাজ অনন্তের সভাকবি ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল খ্রিষ্টাব্দ ১০২৯ থেকে ১০৬৪। এই গ্রন্থে ৭৫০০ শ্লোক আছে।

সোমদেবের *কথাসরিৎসাগর* দশটি লম্বকে বিভক্ত। সোমদেবও ছিলেন কাশ্মীররাজ অনন্তের সভাকবি । রাজমহিষী সূর্যমতীর চিত্তবিনোদনের জন্য *রামায়ণ*-এর মতো বিশালকায় গল্পগ্রন্থটি রচিত হয়। ১৮টি লম্বকে মোট ১২৪টি তরঙ্গে প্রায় ২৪ হাজার শ্লোক আছে। প্রথম লম্বকে *বৃহৎকথা* রচনার ভূমিকা ও পাটলীপুত্র নগরের বর্ণনা আছে।

পরবর্তীতে বিভিন্ন গল্প বর্ণিত হয়েছে। যেমন – মৃগাবতী, শ্রীদত্ত-মৃগাঙ্কবতী, বাসবদত্তা, পিঙ্গলা, জীমূতবাহন, নরবাহনদত্ত, শক্তিদেব, কলিঙ্গদত্তা, সুলোচনা, কলিঙ্গসেনা, হেমপ্রভা, রাজা বিক্রমাদিত্য, শূরবর্মা প্রভৃতি গল্প।

বেতালপঞ্চবিংশতিঃ *বেতালপঞ্চবিংশতি* শিবদাসের রচিত। তিনি দ্বাদশ শতকের পরবর্তীতে গল্পগ্রন্থটি রচনা করেন বলে অনুমান করা হয়। ২৫ টি গল্পের সঙ্কলনে *বেতালপঞ্চবিংশতি* রচিত। মূল গল্পগুলো গদ্যে-পদ্যে রচিত হয়েছিল। এগুলি মানুষের মুখে-মুখে প্রচার হতে হতে লোকসাহিত্যের আনন্দদায়ক গল্পরূপে রচিত হয়েছিল। সোমদেবের *কথাসরিৎসাগরে* এবং ক্ষেমেন্দ্রের *বৃহৎকথামঞ্জরীতে* কাহিনিগুলি সংরক্ষিত। অনেকের মতে শিবদাস কর্তৃক রচিত গদ্যপদ্যমিশ্রিত *বেতালপঞ্চবিংশতি* সংস্করণটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সঙ্কলন। বেঙ্কটভট্ট রচিত *বেতালপঞ্চবিংশতি* সর্বাপেক্ষা আধুনিক রচনা। এছাড়া জম্ভল দত্তের রচিত একটি গদ্যাত্মক সংস্করণ এবং কোনো অজ্ঞাতনামা লেখকের আরেকটি গদ্যরচনাও পাওয়া যায়। তবে সমগ্র কাহিনির সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন করেছেন জনৈক বল্লভদাস। পূর্বোক্ত লেখকগণের সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এই কাহিনী *বৃহৎকথামঞ্জরীতে* ১২২০ টি শ্লোকে এবং *কথাসরিৎসাগরে* ২১৯৫ টি শ্লোকে বর্ণিত। সুতরাং সোমদেব রচিত গল্পগুলি অপেক্ষাকৃত বড়। তবে শিবদাসকৃত *বেতালপঞ্চবিংশতি*'র কাহিনি সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। রাজা ত্রিবিক্রম সেন বা বিক্রমাদিত্যের নিকট বেতালের মুখে ২৫ টি উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে –

রাজা বিক্রমাদিত্যকে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নিয়মিত ফলের ভিতর লুক্কায়িত রত্ন উপহার দিতেন। উপহারের কারণ হিসেবে রাজাকে বলত, সে রাজার শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য রাজার সাহায্য প্রার্থনা করেন। মূলত সে রাজাকে বলিদানের জন্য মিথ্যা ছলনার আশ্রয়ে তাঁকে হত্যার প্রতিজ্ঞা করেছেন। সন্ন্যাসীর কপট অনুরোধে বিক্রমাদিত্য তাঁর নির্দেশমতো শ্মশানস্থ বৃক্ষ থেকে শব আনতে গমন করেন। অমনি শব আশ্রিত এক বেতাল রাজাকে এক-একটি গল্প শুনিয়ে তৎসম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধান করতে বলে।

বিক্রমাদিত্য প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলেন। বেতাল রাজার বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরে খুশি হয়ে, সন্ন্যাসীর কপটতার কথা তাকে খুলে বলে। পরবর্তীতে বিক্রমাদিত্য আত্মরক্ষার্থে বেতালের সহায়তায় ধূর্ত সন্ন্যাসীকে হত্যা করেন।

এখানে বেতালের প্রশ্নগুলি ছিল কতগুলো জনপ্রিয় ও বুদ্ধিদীপ্ত ধাঁধা। কাহিনিগুলিও অতীব চিত্তাকর্ষক ও বৈচিত্রময়। প্রত্যেকটি গল্প অভিনব সেই সাথে হাস্যরস পরিবেশনে লেখকের নিপুনতা সুস্পষ্ট। তাই সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে *বেতালপঞ্চবিংশতি* অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ।

সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা: *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা* অন্য নামে *বিক্রমচরিত* নামেও প্রসিদ্ধ। গ্রন্থটির রচয়িতা ও রচনাকাল অজ্ঞাত। তবে মহাকবি কালিদাস, রামচন্দ্র, সিদ্ধসেন দিবাকর, ক্ষেমঙ্কর প্রভৃতি রচয়িতার নামে ভিন্ন-ভিন্ন পাঠ পাওয়া গেছে। এখানে বিক্রমাদিত্য রাজাকে কেন্দ্র করে ৩২টি গল্প রচিত হয়। প্রাচীনতম মূল রচনাটি লুপ্ত। তবে তিনটি সংস্করণে গল্পগুলি পাওয়া যায়। সংস্করণগুলি হলো – (১) জৈন লেখক ক্ষেমঙ্কর রচিত (মহারাষ্ট্রী সংস্করণ), (২) বররুচিকৃত বঙ্গীয় সংস্করণ (মহারাষ্ট্রী সংস্করণ অনুসরণে রচিত), (৩) অজ্ঞাতপরিচয় লেখকের রচিত (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)।

গল্পানুসারে – মহারাজ বিক্রমাদিত্য দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট থেকে একটি মণিমাণিক্য খচিত রত্ন সিংহাসন উপহার পেয়েছিলেন। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর সিংহাসনটি ভূগর্ভে পতিত হয়। পুত্র ভোজরাজ অনেক সাধনায় সিংহাসনটি উদ্ধার করতে সমর্থ হন। তিনি যখন সিংহাসনে বসতে যাচ্ছিলেন তখন ৩২টি পুতুল জীবন্ত হয়ে প্রত্যেকে ভোজরাজকে একটি করে গল্প বলে। কারণ বিক্রমাদিত্যের মতো গুণবান না হলে সিংহাসনে আরোহণের অযোগ্য। সেই ৩২টি গল্পের সমষ্টিই *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা*। এখানে প্রত্যেকটি গল্পেই বিক্রমাদিত্যের গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। গল্পগুলো পাঠ করলে মানব মনে মানবতা, পরোপকার, দয়া-মায়া, দাক্ষিণ্য, দায়িত্ববোধ, ভালোবাসা ইত্যাদি মহৎ গুণ জন্ম নেবে।

সিংহানদ্বাত্রিংশিকা'র অনুসরণে অর্বাচীন কালে আরও কতিপয় গল্প-কথা রচিত হয়েছিল। তন্মধ্যে *অনন্তচরিত, বীরচরিত,* শিবদাসকৃত *শালিবাহনচরিত,* অজ্ঞাতনামা লেখকের *বিক্রমসেনচরিত* প্রভৃতি।

শুকসপ্ততিকথা: সংস্কৃত সাহিত্যের অতি জনপ্রিয় গল্পগ্রন্থ *শুকসপ্ততিকথা*। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পরে গ্রন্থটি রচিত বলে মনীষীগণ ধারণা করেন। *শুকসপ্ততিকথা*'য় রয়েছে সত্তরটি আকর্ষণীয় গল্পের সঙ্কলন। দুটি সংস্করণে গ্রন্থটি পাওয়া যায়। (১) চিন্তামণি ভট্টকৃত বৃহৎ সংস্করণ এবং (২) পূর্ণভদ্রকৃত জৈন সংস্করণ। এখানে *পঞ্চতন্ত্র*-এর অনুকরণে কাহিনি বিন্যাস পরিলক্ষিত। *পঞ্চতন্ত্রে* যেভাবে নারীর ব্যভিচারিতা, লাম্পট্য, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায় তেমনি *শুকসপ্ততিকথা*'য়ও এমনটি পরিলক্ষিত হয়। জনশ্রুতি আছে নারদ মুনি দেবরাজ ইন্দ্রকে এই গল্পগুলি শুনিয়ে ছিলেন। গল্পের বিষয়বস্তু হলো –

বণিক দেবদাসের পত্নী প্রভাবতীকে কেন্দ্র করে পোষা শুকপাখির দ্বারা কথিত গল্পগুলি। রাজ্যের রাজা দেবদাসের অতি সুন্দরী স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দেবদাসকে কাজের দায়িত্ব দিয়ে বিদেশে প্রেরণ করেন। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে দেবদাস পত্নী প্রণয় বাসনা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে প্রতি সন্ধ্যায় রাজার সাথে মিলনের জন্য গোপনে ঘরের বাইরে পা বাড়াতেই পোষা শুকপাখিটি তিরস্কার করে একটি করে মজার গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াত। গল্পের আকর্ষণে দেবদাস পত্নীর আর ঘরের বাইরে যাওয়া হয় না। এভাবে সত্তর দিনে সত্তরটি গল্প শেষ হলে দেবদাস ঘরে ফিরে আসেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

> অনুমান *শুকসপ্ততিকথা* মূলে গদ্যে রচিত ছিল ; পরবর্তী যুগে সেগুলির সঙ্গে নীতি উপদেশাত্মক শ্লোক যুক্ত হয়। অধিকাংশ গল্পই বিবাহিত নারীর অবৈধ প্রণয়কে ভিত্তি করে পরিকল্পিত। প্রায় সব গল্পই সাহিত্যগুণবর্জিত রচনা ; দু-একটি ছোট গল্প আধুনিক চুট্‌কিজাতীয় এবং প্রাচীন লোককথার ভাণ্ডার থেকে গৃহীত। ইউরোপের বিখ্যাত লেখক বোকাচিও সঙ্কলিত ইতালীয় গল্পসংগ্রহ *ডেকামেরন* গ্রন্থের সঙ্গে এর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য

আছে ; অবশ্য *ডেকামেরন*-এর রচনাশৈলী উন্নত স্তরের, কিন্তু উভয় গ্রন্থের দু-একটি গল্পের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় যে, সহজেই একটির ওপর অন্যটির প্রভাব সম্পর্কে মনে সন্দেহ জাগে। চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভে *তুতিনামা* নামে *শুকসপ্ততিকথা*'র ফার্সী অনুবাদ হয়। আনুমানিক একশ বছর পরে তুর্কী অনুবাদ সম্পন্ন হয়। ফার্সী অনুবাদ *তুতিনামা* অবলম্বনে Nachschabi ও কাদিরি কর্তৃক আরও দুটি অনুবাদ হয়। সম্ভবত সংস্কৃতে আরও কয়েকটি সংস্করণ প্রচলিত ছিল ; এরূপ একটির নাম *দিনালাপনিকাশুকসপ্ততি*।[৩]

হিতোপদেশঃ *হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র*-এর অনুকরণে একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। রাজা ধবলচন্দ্রের সভাসদ পণ্ডিত নারায়ণ গ্রন্থটি রচনা করেন। *হিতোপদেশ* বঙ্গদেশে বহুলভাবে পঠিত। অনেকের ধারণা, ধবলচন্দ্র বঙ্গের অধিপতি ছিলেন। *হিতোপদেশে*'র যে পুঁথি পাওয়া গেছে তাতে এর একটি পুঁথির কাল ১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দ। সেহিসেবে এ গ্রন্থের রচনাকাল উক্ত সময়ের পূর্বে। *পঞ্চতন্ত্র*-এর মতো এটি পাটলিপুত্রের রাজা সুদর্শনের পুত্রদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য রচিত হয়েছিল। *হিতোপদেশে* আছে চারটি খণ্ড – মিত্রলাভ, মিত্রভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি। *পঞ্চতন্ত্রে* আগে মিত্রভেদ ও পরে মিত্রলাভ।

মিত্রলাভঃ মিত্রলাভে গল্পগুলোর একটির সঙ্গে একটির যোগসূত্র রয়েছে। প্রথমটির প্রসঙ্গক্রমেই দ্বিতীয় গল্প, দ্বিতীয়টির প্রসঙ্গে তৃতীয় – এইভাবেই অগ্রসর হয়েছে। প্রথমটিতে 'কাক-কচ্ছপ-হরিণ আর ইঁদুর' গল্পে, যেমন – কোনো অবলম্বন না থাকলেও বুদ্ধিমান লোকেরা ভালো বন্ধুর সহায়তায় কিভাবে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। এখানে মোট গল্পের সংখ্যা আটটি। মূল গল্পগুলো হলো – ১. কাক-কচ্ছপ-হরিণ-ইঁদুরের গল্প। সেই মূল গল্পের ভিতরেই ২. বুড়ো বাঘ আর পথিকের গল্প, ৩. হরিণ-কাক-শিয়ালের গল্প, ৪. জরদ্‌গব শকুনি আর বিড়ালের গল্প, ৫. চূড়াকর্ণ-বীণাকর্ণ, বণিকদম্পতীর গল্প, ৬. অতিসঞ্চয়ী ব্যাধের গল্প, ৭. রাজপুত্র-বণিকবধুর গল্প এবং ৮. হাতী ও শিয়ালের গল্প।

মিত্রভেদঃ মিত্রভেদে গল্পের প্রসঙ্গ অনুসারে প্রথম গল্প তারপর আবার মূল গল্পে ফিরে আসে ; পুনরায় মূল গল্প থেকে তৃতীয় গল্পে প্রবেশ এবং আবার মূল গল্পের যোগসূত্র উত্থাপন করে – এভাবেই গল্পগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মোট গল্পের সংখ্যা দশটি। মূল গল্পগুলো হলো – ১. সিংহ, বৃষ এবং দুই শৃগালের গল্প। সেই গল্পের প্রসঙ্গ অনুসারে এসেছে ২. কীলোৎপাটী বানরের গল্প, ৩. রজক-চোর-গর্দভ এবং কুকুরের গল্প, ৪. সিংহ-মার্জার-মূষিকের গল্প, ৫. কুট্টনী-ঘণ্টাকর্ণ রাক্ষসের গল্প, ৬. রাজা-রাজপুরুষ-পরিব্রাজক সাধু-গোপ-গোপবধূ-নাপিতবধূর গল্প, ৭. গোপী এবং তার দুই জার (উপপতি) এর গল্প, ৮. কাকদম্পতি-কৃষ্ণসর্প-কনকহারের গল্প, ৯. সিংহ-শশকের গল্প এবং ১০. সমুদ্র ও টিট্টিভ দম্পতির গল্প।

বিগ্রহঃ মিত্রভেদের পিঙ্গলক-সঞ্জীবক-করটক-দমনকের গল্পের পরে রাজকুমারেরা একটি যুদ্ধের গল্প দেখা যায়। সেই প্রসঙ্গে বিগ্রহের মূল গল্প হলো – হিরণ্যগর্ভ নামে এক রাজহংস কর্পূরদ্বীপে পদ্মকেলি সরোবরে বসবাস করত। সে ঐ রাজ্যের রাজা। একদিন রাজার অনুচর দীর্ঘমুখ নামে এক বক অন্যদেশ থেকে ফিরে এসে রাজাকে প্রণাম করে আসন গ্রহণ করল। রাজা তাকে সেদেশ সম্পর্কে জানানোর জন্য বললে, বক বলতে শুরু করল –

চিত্রবর্ণ নামে জম্বুদ্বীপে বিন্ধ্যপর্বতে এক ময়ূর পাখিদের রাজা। সেখানে বেড়ানোর সময় ময়ূররাজের অনুচর হিসেবে পাখিরা বককে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করল – সে কোথা থেকে এসেছে? দুই দেশের মধ্যে কোন দেশ বেশি ভাল? এছাড়া কোন দেশের রাজা বেশি ভাল? এসব জানতে চাইলে, বক বললো যে, কর্পূরদ্বীপ এবং সেরাজ্যের রাজা হিরণ্যগর্ভ সব দিক থেকেই ভালো। এতে জম্বুদ্বীপের পাখিরা ক্ষেপে গেল। তারপর পাখিদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেল। এ প্রসঙ্গে এখানে নয়টি গল্প রয়েছে। গল্পগুলো হলো – ১. হংস ময়ূর আর কাকের গল্প, ২. চিতাবাঘের চামড়া পরা গর্দভের গল্প, ৩. শশকের গল্প, ৪. দুষ্টু

কাক ও দয়ালু হাঁসের গল্প, ৫. কাক ও ভারুই পাখির গল্প, ৬. ব্যভিচারিণী স্ত্রীর গল্প, ৭. নীলবর্ণ শিয়ালের গল্প, ৮. বীরবরের গল্প, ৯. চূড়ামণি ক্ষত্রিয়ের গল্প

সন্ধিঃ বিগ্রহ খণ্ডে যুদ্ধের গল্পের পর এখানে দেখা যায় সন্ধির গল্প। হিরণ্যগর্ভ এবং চিত্রবর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে বহু সৈন্য নিহত হলো। তারপর গৃধ্র এবং চক্রবাক আলোচনার মাধ্যমে সন্ধি স্থাপন করল। সে আঙ্গিকে এখানে মোট বারটি গল্প আছে। গল্পগুলো হলো – ১. মূর্খ কচ্ছপের গল্প, ২. অনাগতবিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি ও যদ্ভবিষ্য মাছের গল্প, ৩. ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও গৃহভৃত্যের গল্প, ৪. কচ্ছপ ও হাঁসের গল্প, ৫. মূষিক ও মুনির গল্প ৬. লোভী বকের গল্প, ৭. এক ব্রাহ্মণের গল্প, ৮. সুন্দ-উপসুন্দের গল্প, ৯. ব্রাহ্মণ ও ধূর্তের গল্প, ১০. উটের গল্প, ১১. বৃদ্ধ মন্দবিষ সাপের গল্প, ১২. ব্রাহ্মণ ও নকুলের গল্প।

পুরুষপরীক্ষাঃ *পুরুষপরীক্ষা* গ্রন্থটি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির রচিত। তাঁর কাল আনুমানিক পঞ্চদশ শতক। *পুরুষপরীক্ষা* গ্রন্থে ৪৪ টি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। এখানে *পঞ্চতন্ত্র* ও *হিতোপদেশ*-এর অনুরূপ নীতি-উপদেশাত্মক ও অতিজনপ্রিয় আকর্ষণীয় লোককাহিনী রয়েছে। সেই সাথে অতিশয় সহজ-সরল ভাষা, হাস্য কৌতুক প্রভৃতি কারণে গল্পগুলি অত্যন্ত মনোরঞ্জক। মূল কাহিনি হলো – রাজা রাজকন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে চিন্তিত। তখন এক ব্রাহ্মণ রাজাকে বলেন, রাজকন্যার জন্য পুরুষপাত্রের অনুসন্ধান করছেন তো? উত্তরে রাজা বললেন কন্যার পাত্রতো পুরুষই হয়। রাজার কথা শুনে ব্রাহ্মণ আবার বললেন, হে রাজন! পৃথিবীতে আকারে পুরুষ তো অনেক হয় কিন্তু গুণবান পুরুষের অভাব আছে। অতএব পুরুষপরীক্ষা প্রয়োজন। এ বাস্তবতায় বিদ্যাপতি সৎগুণবিশিষ্ট দানবীর, দয়ালু, সত্যনিষ্ঠ ইত্যাদি অপরদিকে নিকৃষ্ট গুণের অধিকারী চোর, আদম, মূর্খ প্রভৃতি পুরুষ চরিত্র নিয়ে অসাধারণভাবে গল্পগুলো রচনা করেন।

ভোজপ্রবন্ধঃ *ভোজ-প্রবন্ধ* গ্রন্থটি ধারারাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজা ভোজকে কেন্দ্র করে রচিত। এটি বল্লাল সেন বা বল্লভ রচনা করেন। গ্রন্থটি আনুমানিক ষোড়শ শতকে রচিত। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চরিত্র সমাবেশে বিবিধ গল্পের সঙ্কলন। রাজা ভোজের রাজদরবারে কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, মল্লিনাথ প্রভৃতি ব্যক্তিকে নিয়ে ছোট ছোট ফক্কিকা বা চুট্‌কি ও হেঁয়ালির আকারে অত্যন্ত রসালোভাবে কাহিনির সৃষ্টি। গল্প অনুসারে মহারাজ ভোজের বিদ্যানুরাগ ও বদান্যতা গুণে আকৃষ্ট প্রসিদ্ধ কবি ও বিদ্বজ্জন তাঁর সভায় উপস্থিত হন। প্রত্যেকে আপন-আপন কবিত্বগুণে গল্প রচনার মাধ্যমে রাজাকে সন্তুষ্ট করে যথাযোগ্য উপহার লাভ করেন। বল্লাল সেন বা বল্লভ ব্যতীত মেরুতুঙ্গ, রাজবল্লভ, বৎসরাজ, শুভশীল ও পদ্মগুপ্ত রচিত *ভোজপ্রবন্ধ* নামক গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে।

ভরটকদ্বাত্রিংশিকাঃ *ভরটকদ্বাত্রিংশিকা* গল্পগ্রন্থটির লেখকের নাম অজ্ঞাত। গ্রন্থটি অনুমানিক ১৫শ-১৬শ শতকে রচিত বলে ধারণা করা হয়। আলোচ্য গ্রন্থে ৩২টি গল্প রয়েছে। গল্পগুলো সম্পূর্ণ গদ্যে রচিত। ভরটক শব্দের অর্থ শৈব সাধু বা সন্ন্যাসী। কাহিনি অনুসারে শৈব সাধু বা সন্ন্যাসীর ভণ্ডামি ও নীতিহীনতার চমৎকার কাহিনি এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

আরব্যযামিনীঃ জগদ্বন্ধু নামে জনৈক পণ্ডিত *আরব্যরজনী* নামক প্রখ্যাত আরবি গল্প সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। উনিশ শতকে জনৈক জমিদারের উৎসাহে গ্রন্থটির অনুদিত হয়। গ্রন্থটির নামকরণ করা হয় *আরব্যযামিনী*। এই শতকে ঈশপের গল্পসহ আরও কতিপয় গল্পের সংস্কৃত অনুবাদ পাওয়া যায়। যেগুলো সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

এছাড়া শ্রীধররচিত *কথাকৌতুক*, রাজশেখরের *প্রবন্ধকোষ*, মেরুতুঙ্গের *প্রবন্ধচিন্তামনি* এবং হেমবিজয়গণির *কথারত্নাকর* প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. সকলার্থ শাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্ ।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চাভিরেতচ্চকার সুমনোহরং শাস্ত্রম্॥

প্রসূন বসু সম্পাদিত, বিষ্ণুশর্মা, *পঞ্চতন্ত্রম্, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১৫দশ খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, পৃ. ২৩৫

২. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, – ২০১২, পৃ. ৪৬৩

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের ধারা

প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের ধারা বিষয়ে আলোচনা করা হবে। মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যে মানুষের আনন্দদায়ক নানা গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুমান করা যায় বৈদিক যুগের পূর্বেই লোকসমাজে কোনো না কোনো গল্পের প্রচলন ছিল। কালের পরিক্রমায় সেগুলো গল্পসাহিত্যরূপে উৎকর্ষ লাভ করেছে। প্রাচীনযুগে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বনজঙ্গলে জীবজন্তুর সাথে বসবাস করত। এজন্য মানুষ পশুপাখির মুখের ভাষা নিয়ে নানারূপ কাহিনি রচনা করেছে। সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ *বেদে* প্রত্যক্ষভাবে গল্প না থাকলেও সংলাপের ভিতরে গল্পের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। *বেদ*-এর পরে *রামায়ণ-মহাভারত* মহাকাব্য হলেও এখানে বিপুল গল্পের সমাবেশ রয়েছে। যেমনটি *পুরাণে*ও লক্ষ্য করা যায়। এসব গ্রন্থে গল্পসাহিত্যের আঙ্গিকে গল্প না থাকলেও সংলাপ হোক, কাহিনি হোক মূল কেন্দ্রবিন্দুতে একটি গল্পের ধারণা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন – 'ঐসব কাহিনিতে লোকপরাম্পরায় নৈতিক উপদেশ যোগ করা হতো, কখনও বা নীতিউপদেশ ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পই থাকত। মানুষের কল্পনাপিয়াসী স্বপ্নবিলাসী মন মনুষ্যজগৎকে নিয়ে এবং মনুষ্যজগতের অনুকরণে সৃষ্ট কাল্পনিক জগতের দেব-দেবী, রক্ষঃ-যক্ষ-কিন্নর-গন্ধর্ব-অপ্সরা প্রভৃতিকে নিয়ে গল্প কথা সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা পেত।'[১]

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, খ্রিস্টপূর্ব যুগের বহু আগেই সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। মনীষীদের মতে, গল্পের সূচনা বৈদিক যুগের সূচনা লগ্নেই। তার গঠন-পঠন একটু ভিন্নরকম ছিল। কবিতা ও সংলাপ আকারে এসব গল্প দেখতে পাওয়া যায়। *বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ*-এর অসংখ্য কাহিনি থেকে গল্পের ধারা প্রবাহিত হয়ে গল্পসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এ সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে যুগে যুগে কালে কালে গল্প

বলার কৌশল এবং সৃজনশৈলীর কারণে নবনব আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলা যায়, সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের ধারা অনেক বিস্তৃত। এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতিপয় গল্প নিম্নে উপস্থাপন করা হলো –

ঋগ্বেদ-এর দশম মণ্ডলে সংবাদ-সূক্তে উপস্থাপিত 'পুরূরবা-উর্বশীর প্রেম কাহিনি' সংলাপ আকারে, যেমন –

> স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী মর্ত্যের রাজা পুরূরবার প্রণয়ে আবদ্ধা, প্রেমিকের কাছে অন্তরের অনুরাগ নিবেদন করে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন। স্বর্গের দেবতা বাঞ্ছিতা উর্বশীকে প্রেমসঙ্গিনীরূপে লাভ করে রাজার জীবন ধন্য। তাঁদের এই মধুময় ভালোবাসার মুহূর্তে উর্বশী বিদায় চাইলেন। কিন্তু পুরূরবার কাছে উর্বশীর বিচ্ছেদ অকল্পনীয়। তবু দয়িতকে পরিত্যাগ করে অপ্সরা ফিরে চললেন আকাশপথে আপন আলয়ে। বিরহ কাতর রাজা তাঁকে অনুসরণ করেন। পুরূরবা বললেন – 'হে পত্নী ! তোমার চিত্ত কি এত নিষ্ঠুর! অতি শিঘ্র চলে যেও না, আমাদের কিঞ্চিৎ কথোপকথনের দরকার আছে। উভয়ে যদি এসময়ে মনের কথা প্রকাশ না করি তবে ভবিষ্যতের জীবন সুখের হবে না। তোমার বিরহে সবকিছু শোভাহীন হয়েছে।' এভাবে রাজা প্রণয়ের সুখস্মৃতি নানাভাবে উর্বশীকে অনুরাগের বাণীতে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অপ্সরার প্রেমতো ক্ষণস্থায়ী। প্রেমিকের আবেদনে তার উদাসীনতার ভাব। প্রেমের আকুতি তাঁর কাছে নিষ্ফল। নবজাতক সন্তানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও উর্বশী মর্ত্যে থাকতে রাজী না, তখন রাজা তাঁকে আত্মহত্যার ভয় দেখালেন। এপর্যায়ে উর্বশী রাজাকে আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা করলেন এবং নির্দ্বিধায় স্বীকার করলেন – 'স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বৃকের হৃদয় একই প্রকার।' উর্বশীর কাছে প্রেমিকের করুণ আবেদন-নিবেদন সব ব্যর্থ হলো। প্রেমিকের আবেদন-নিবেদন উপেক্ষা করে তিনি অন্তর্হিত হলেন। প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছেদের ইঙ্গিত দিয়েই *ঋগ্বেদ*-এর এই প্রণয়গাথার পরিসমাপ্তি ঘটে।[২]

ঋগ্বেদ-এর এই প্রণয় কাহিনিটি পরবর্তীকালে *মহাভারত, ব্রাহ্মণ, শ্রৌতসূত্র, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ,* কালিদাসের নাটক প্রভৃতিতে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। মূলত এভাবে বৈদিক যুগেই গল্পের বীজ উপ্ত হয়ে গল্পের ভাণ্ডারকে বিকশিত করেছে।

পুরূরবা-উর্বশীর কথোপকথনের মতো প্রসিদ্ধ কাহিনি *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলের 'যম-যমী' সূক্তে লিপিবদ্ধ আছে। যেমন –

> পিতা গন্ধর্বের ঔরসে মাতা অপ্যা ঘোষা অপ্সরার গর্ভে যমজ যম-যমীর জন্ম হলো। জন্মের পরে উভয়ে একত্রে লালিত-পালিত হয়। যখন তারা যৌবনে পদার্পণ করলো, তখন যৌবনদীপ্ত ভ্রাতা যমকে মনে মনে ধারণ করে ভগ্নী যমীর অন্তরে কামভাব জেগে উঠল। ভ্রাতার সাহচর্যে বোন যমী সঙ্গমে পরিতৃপ্ত হতে অধীরা হয়ে উঠলো। একদিন সমুদ্রের মাঝখানে এক নির্জন দ্বীপে যম-যমী উপস্থিত। কামতাড়িতা উদ্‌ভ্রান্তা যমী যমকে বললে – 'তুমি আমার আজন্ম সাথী। এই বিস্তীর্ণ দ্বীপে তুমি ভিন্ন অন্য কেউ নেই। তোমাকে ডাকি নিভৃত শয়নে। বিধাতার ইচ্ছা এক সুন্দর নাতির মুখ দর্শনের। সেই শিশুর জন্ম হবে তোমার আর আমার মিলনে।' যমীর কথার উত্তরে যম জানালেন ভ্রাতা-ভগ্নীর মিলন যে মহাপাপ। এমন পাপকে ঠেকাতে দেবতাদের গুপ্তচরেরা সর্বত্র পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু যমী ভাইয়ের কথা অগ্রাহ্য করে নির্লজ্জভাবে উৎসাহিত করতে লাগলেন। তিনি বললেন – 'এ মিলন ত্যাজ্য হলেও দেবতাদের কাম্য, তুমি যুক্ত কর তোমার তনুতে আমার তনু, তুমি হও আমার পুত্রের জন্মদাতা পতি। ভগবান ব্রহ্মা যেমন নিজ দুহিতার পতি হয়েছিলেন তেমনি তুমিও আমার পতি হও।' যমীর কথার উত্তরে যম বললেন – 'ব্রহ্মা কর্তৃক কন্যাগমনের ঘটনা দেব-সমাজে অতি নিন্দনীয় হয়েছে। সেরকম নিন্দনীয় কাজ কেন করব?' আরও বোঝালেন ভ্রাতা-ভগ্নীর পবিত্র সম্পর্কের কথা। যমী তবুও অবুঝ। তিনি ভাইকে নানাভাবে প্ররোচিত করতে লাগলেন। কিন্তু যম ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ, সচ্চরিত্রবান, পূতপবিত্র, সদাচারী, স্বাভাবিক মানুষ। তাঁর মনে কোনো দুর্বলতা ছিল না। তিনি শেষ পর্যন্ত যমীর কামসংঙ্কল্পের নিন্দা করলেন এবং ভ্রাতৃসুলভ অকৃত্রিম স্নেহে বুঝিয়ে বললেন – 'হে যমী! তুমি অন্য পুরুষকে আলিঙ্গন করো। যেরূপ লতা বৃক্ষকে জড়িয়ে থাকে, তদ্রূপ অন্য পুরুষই তোমাকে আলিঙ্গন করুক। তার মনই তুমি হরণ কর, সেও তোমার মন হরণ করুক। তার সাথেই সহবাসের ব্যবস্থা স্থির করব, তাতেই তোমার মঙ্গল হবে।'[৩]

এভাবে সংলাপ আকারে কাহিনির সমাপ্তি হয়েছে।

ঋগ্বেদ-এর তৃতীয় মণ্ডলের তেত্রিশতম সূক্তে বিশ্বামিত্র ও নদীদ্বয়-এর কথোপকথনের একটি কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে।

ভারতসহ দশ জাতি সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল, তখন সৈন্যদল নদী পার হবার সময় পুরোহিত বিশ্বকর্মা নদীদ্বয়ের স্তব করে বললেন –

> হে ! জলপ্রবাহবতী বিপাশা ও শূতুদ্রী নদীদ্বয়, পর্বতের উৎসঙ্গপ্রদেশ হতে সাগর সঙ্গমাভিগামিণী হয়ে মন্দুরাবিমুক্ত ঘোটকীদ্বয়ের ন্যায় স্পর্ধা করে গোদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হয়ে, বৎসলেহনাভিলাষিণী ধেনুদ্বয়ের ন্যায় বেগে গমন করছ, ইন্দ্র তোমাদের প্রেরণ করেছেন, তোমরা তাঁর প্রার্থনা রক্ষা করেছ ও রথীদ্বয়ের ন্যায় সমুদ্রাভিমুখে যাচ্ছ। তোমরা একযোগে প্রবাহিত হয়ে তরঙ্গদ্বারা বর্ধিত হয়ে পরস্পর পরস্পরের নিকট গিয়ে শোভা পাচ্ছ। হে ! মাতৃসদৃশী নদী, তোমরা উভয়ে গোবৎসাভিলাষিণী ধেনুর ন্যায় এক স্থানাভিমুখে কোথায় যাচ্ছ? নদীদ্বয় বললেন – আমরা এ জল দ্বারা স্ফীত হয়ে দেবকৃত স্থানের অভিমুখে যাচ্ছি। আমাদের গমনের উদ্যোগ নিবৃত্ত হবার নয়। হে বিপ্র ! কি জন্য বার বার আমাদেরকে আহ্বান করছেন? বিশ্বামিত্র বললেন – হে জলবতী নদীদ্বয় ! আমার সোম সম্পাদক বাক্যের জন্য মুহূর্তের জন্য গমন হতে বিরত হও। আমি কুশিকের পুত্র, আমি প্রসাদাভিলাষে মহতী স্তুতি দ্বারা তোমাদেরকে আমার উদ্দেশে আহ্বান করছি। নদীদ্বয় বললেন, হে ! পরিবেষ্টক বৃত্রকে হনন করে বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদের খনন করেছেন। জগৎপ্রেরক সুহস্ত, দ্যুতিমান ইন্দ্র আমাদের প্রেরণ করেছেন, তাঁর আজ্ঞায় আমরা নির্ভরযোগ্য হয়ে গমন করছি। বিশ্বামিত্র বললেন, যে ইন্দ্র অহিকে বিদীর্ণ করেছিলেন, তাঁর সে বীর কর্ম সর্বদা কীর্তন করা উচিত। ইন্দ্র চতুর্দিকে আসীন অর্থাৎ অবরোধকারীদের বজ্রদ্বারা বধ করেছিলেন। তাতে গমনাভিলাষী জলসমূহ এসেছিল। নদীদ্বয় বললেন, হে স্তোতা ! তুমি এই যে বাক্য ঘোষণা করেছ, তা বিস্মৃত হয়ো না, ভবিষ্যৎ যজ্ঞ দিবসে তুমি ঐ কথা রচনা করে আমাদের সেবা করো। আমরা তোমাকে নমস্কার করছি, আমাদের পুরুষের ন্যায় প্রগলভ করো না। বিশ্বামিত্র বললেন, হে ভগিনীভূত নদীদ্বয় আমি স্তব করছি। আমাদের কথা শ্রবণ কর। আমি দূরদেশ হতে রথ ও অশ্ব নিয়ে এসেছি ! তোমারা অবনত হও, যাতে সুখে পার হওয়া যায়। হে নদীদ্বয় ! তোমরা স্রোতের জল নিয়ে রথচক্রের অক্ষের অধোদেশে যাও। নদীদ্বয় বললেন, হে স্তোতা! আমরা তোমার এ সকল বাক্য শুনলাম। তুমি দূর

হতে এসেছ, অতএব রথ ও শকটের সাথে যাও। মাতা যেমন পুত্রকে স্তন পান করবার জন্য অবনত হয় এবং যুবতী যেরূপ পুরুষকে আলিঙ্গন করবার জন্য অবনত হয়, সেরূপ আমরা তোমার জন্য অবনত হচ্ছি। বিশ্বামিত্র বললেন, হে নদীদ্বয় ! যেহেতু ভারতগণ তোমাদের পার হবে এবং পার হতে অভিলাষী ভারত বংশীয়েরা ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত ও তোমাদের কর্তৃক অনুজ্ঞাত হয়ে পার হবে ও পার হবার উদ্যোগ নিয়েছে ও অনুমতি পেয়েছে, অতএব আমি সর্বত্র তোমাদের স্তুতি করব ; তোমরা যজ্ঞার্হ। গোধন অভিলাষী ভারতগণ পার হয়ে গেলেন, বিপ্র নদীদ্বয়ের সুন্দর স্তুতি করে বললেন – তোমরা অন্নকারিণী ও ধনযুক্তা হয়ে সকলকে তৃপ্ত কর ও পূর্ণ কর এবং শীঘ্র যাও। তোমাদের তরঙ্গ এরূপভাবে প্রবাহিত হোক। পাপরহিতা, কল্যাণকারিণী, অনিন্দ্যনীয়া বিপাশা ও শূতুদ্রু যেন এক্ষণে বর্ধিত না হয়।[৪]

এভাবে বিশ্বামিত্র ও নদীদ্বয়ের কথোপকথন শেষে সৈন্যদল পুরোহিতগণ সহ নদী পাড় হয়ে সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলেন।

ঋগ্বেদ-এর দশম মণ্ডলের একশত আট সূক্তে 'পণিগণ ও সরমা'র কথোপকথনে গাভী উদ্ধারের একটি কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে –

পণিগণ বললেন, হে সরমা! তুমি কি ইচ্ছায় এ স্থানে এসেছ! এ অতি দূরের পথ। এ পথে আসতে হলে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করলে আসা যায় না, আমাদের নিকট এমন কি বস্তু আছে, যার জন্য এসেছ? কয় রাত্রি ধরে এসেছ? নদীর জল পার হলে কি রূপে? সরমা বললেন, ইন্দ্রের দূতী স্বরূপ প্রেরিত হয়ে আমি এসেছি। হে পণিগণ! তোমরা যে বিস্তর গোধন সংগ্রহ করেছ তা গ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। জল আমাকে রক্ষা করেছে, জলের ভয় হলো, পাছে আমি উল্লঙ্ঘনপূর্বক চলে যাই। এরূপে নদীর জল পার হয়েছি। পণিগণ বললেন – হে সরমা ! যে ইন্দ্রের দূতী হয়ে তুমি দূরদেশ হতে এসেছ, সে ইন্দ্র কি রূপ? তাঁকে দেখতে কি প্রকার ? তিনি আসুন, তাঁকে আমরা বন্ধু বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি। তিনি আমাদের গাভী নিয়ে গাভীগণের সত্ত্বাধিকারী হোন। সরমা বললেন, যে ইন্দ্রের দূতী হয়ে আমি দূরদেশ হতে এসেছি, তাঁকে পরাজয় করে এরূপ ব্যক্তিকে দেখি না। তিনিই সকলকে পরাজিত করেন। গম্ভীর নদীগণ তাঁর গতিরোধ করতে সমর্থ নয়। হে পণিগণ ! নিশ্চয় তোমরা ইন্দ্রের হস্তে নিধন হয়ে শয়ন করবে।

পণিগণ বললেন, হে সুন্দরি সরমে! তুমি স্বর্গের শেষ সীমা হতে এসেছ, অতএব তোমাকে এসকল গাভীর মধ্য হতে যে কয়েকটি ইচ্ছা কর, দিচ্ছি, তবে বিনা যুদ্ধে এসকল গাভী নিতে পারবে না। তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অনেক অস্ত্র আমাদের নিকট বিদ্যমান আছে। সরমা বললেন, হে পণিগণ সৈনিক পুরুষের উপযুক্ত তোমাদের এসব কথা হয়নি। তোমাদের শরীরে পাপ আছে, এ শরীর যেন ইন্দ্রের বাণের লক্ষ্য না হয়। তোমাদের গৃহে আসবার যে পথ, তা যেন দেবতারা আক্রমণ না করেন । আমি আশঙ্কা করছি, পাছে বৃহস্পতি তোমাদের ক্লেশ দেন। অর্থাৎ যদি তোমরা নম্র হয়ে গাভী না দাও, তাহলে তোমাদের বিপদ সন্নিকটে। পণিগণ বললেন হে সরমা ! আমাদের এ ধন পর্বত দ্বারা রক্ষিত। এখানে গাভী, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। যারা উত্তমরূপে রক্ষা করতে পারে, এরূপ পণিগণ ধন রক্ষা করছে। সরমা বললেন, অযাস্য ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানগণ এবং নবগুগণ, সোমপানে উৎসাহিত হয়ে আসবেন। তাঁরা এ বহু পরিমাণ গাভী ভাগ করে নেবেন, হে পণিগণ ! তখন তোমাদের এপ্রকার দর্পের উক্তি ত্যাগ করতে হবে। পণিগণ বললেন, হে সরমা ! দেবতারা ভয় প্রদর্শন করে তোমাকে এ স্থানে পাঠিয়েছেন, সে নিমিত্তেই তুমি এসেছ। তোমাকে আমরা ভগিনীস্বরূপে পরিগ্রহ করছি, তুমি আর ফিরে যেও না। হে সুন্দরি ! তোমাকে এ গোধনের ভাগ দিচ্ছি। সরমা বললেন, আমি ভ্রাতৃভগিনী সংক্রান্ত কোন কথা বুঝতে পারি না। ইন্দ্র ও পরাক্রান্ত অঙ্গিরার সন্তানেরা সকলি জানেন। তাঁরা গাভী পাবার জন্য আমাকে রক্ষাপূর্বক পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমি তাঁদের আশ্রয় পেয়ে এসেছি। হে পণিগণ ! এস্থান হতে অতি দূরে পালাও। গাভীগণ কষ্ট পাচ্ছে, তারা ধর্মের আশ্রয়ে এ পর্বত হতে উঠে যাক। বৃহস্পতি, সোম, সোমপ্রস্তুতকারী প্রস্তরগণ, ঋষিগণ এবং মেধাবীগণ এসকল গুপ্ত স্থানস্থিত গাভীদের বিষয়ে জানতে পেরেছেন।[৫]

এভাবে সরমাকর্তৃক গাভী উদ্ধারের কাহিনি *ঋগ্বেদে* বর্ণিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেবতা ও মানুষ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গল্পের উল্লেখ আছে। *ঋগ্বেদ*-এর ঐতরেয় *শতপথব্রাহ্মণ*-এ 'মনুমৎস্য কথা' নামক একটি কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে –

একদিন সকাল বেলা ভৃত্যরা মনুর হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের জন্য জল আনলে সেই জলের মধ্যে থেকে একটি মৎস্য প্রক্ষালনকারী মনুর হাতের মধ্যে এলো। সে মনুকে বলল – তুমি আমাকে এখন ভরণপোষণ কর, আমি আসন্ন সর্বপ্রাণিবিনাশকারী প্রবল জলোচ্ছ্বাস থেকে তোমায় পরিত্রাণ করব। মনু তাকে বললেন – কিভাবে আমি এখন তোমার ভরণপোষণ করব? উত্তরে মৎস্য বলল – শৈশবেই আমাদের গুরুতর বিপদের আশঙ্কা থাকে, যেহেতু বড় মাছেরা ছোট মাছেদের খেয়ে ফেলে। সুতরাং প্রথমে আমাকে একটি কলসীর মধ্যে স্থাপন করো। যখন আমি সেই কলসীকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠব, তখন একটি জলাশয় খনন করে সেখানে এবং সেটিকেও ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠলে আমাকে শেষকালে সমুদ্রে ছেড়ে দেবে। তাহলেই আমি সমস্ত বিপদ অতিক্রম করতে পারব। মনু তার কথা অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা করলে শ্রীঘ্রই সেই মৎস্য নির্বিঘ্নে মহামৎস্যে পরিণত হয়। সমুদ্রে যাবার আগে মনুকে নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে বলল, যখন প্রবল জলোচ্ছ্বাস হবে, মনু যেন নৌকা নির্মাণ করে সেই নৌকায় আশ্রয় নেয়। তাহলে সে এসে তাঁকে উদ্ধার করবে। মনু নির্ধারিত সময়ে নৌকা নির্মাণ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং জলোচ্ছ্বাস উত্থিত হলে তিনি নৌকায় আরোহণ করলেন। সেসময় মৎস্য এসে তার শৃঙ্গে নৌকাটিকে বেঁধে নিয়ে উত্তরদিকের পর্বতে তাঁকে নিয়ে গেল। মৎস্য মনুকে বলল যে সে মনুকে বিপদ থেকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে এসেছে। এখন তিনি যেন নৌকা এমনভাবে বন্ধন করেন যাতে জল তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে। পরে জল যখন নীচের দিকে নেমে যাবে তখন তিনি যেন নীচের দিকে নেমে যান। মনুও যথাসময়ে জল চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীচের দিকে নেমে এলেন। যে পথ দিয়ে তিনি নীচে অবতরণ করেছিলেন উত্তরদিকের গিরির সেই পথ মনুর অবতরণমার্গ নামে পরিচিত হয়েছিল। জলপ্রবাহে সকল প্রাণিবর্গ বিনষ্ট হয়েছিল, কেবল মনুই জীবিত ছিলেন।[৬]

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-এর তেত্রিশতম অধ্যায়ে 'শুনঃশেপোপাখ্যান' নামক কাহিনিটির অবতারণা করা হয়েছে। কাহিনির প্রারম্ভিক অপুত্রক ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্রকামনাকে কেন্দ্র করে। উপাখ্যান অনুসারে –

ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র শতপত্নীপরিবৃত হয়েও পুত্রহীন অবস্থায় ছিলেন। নারদ নামক এক ঋষির উপদেশানুসারে রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণদেবতার নিকট পুত্র সন্তান লাভের জন্য বর প্রার্থনা করলেন। বরুণ দেবতার বরে তাঁর পুত্র জন্মগ্রহণ করলে, সেই পুত্রকে উৎসর্গ করে বরুণের উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পাদন করবেন বলে রাজা প্রতিশ্রুতি দিলেন। বরুণের অনুগ্রহে যথাসময়ে রাজার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল এবং রাজা তার নাম রাখলেন রোহিত। হরিশ্চন্দ্রের পুত্রলাভের বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বরুণদেব রাজার নিকটে এসে পুত্র উৎসর্গ করে তাঁর উদ্দেশে যাগ করবার কথা রাজাকে মনে করিয়ে দিলেন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র দশদিনে শিশুর অশৌচান্ত হওয়া পর্যন্ত বরুণকে অপেক্ষা করতে বললেন। দশদিন পর বরুণ পুনরায় আগমন করলে হরিশ্চন্দ্র প্রথমে শিশুর দন্তোদ্‌গম হওয়া পর্যন্ত, তারপর অস্থায়ী দাতঁগুলো পড়ে গিয়ে স্থায়ী দাঁত ওঠা পর্যন্ত এবং তারপর তাঁর পুত্রের ক্ষত্রিয়জাত্যুচিত অস্ত্রবিদ্যাদিশিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বরুণদেবকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেন। পরিশেষে পূর্ণতাপ্রাপ্ত রোহিতকে যাগে উৎসর্গ করবার কথা বরুণ যখন হরিশ্চন্দ্রকে বললেন তখন হরিশ্চন্দ্র তাঁর কথা স্বীকার করে নিলেন এবং পুত্রকে ডেকে বললেন যে, বরুণের বরে তুমি জন্মলাভ করেছো। তাই ঋণমুক্ত হওয়ার জন্য বরুণের উদ্দেশে তোমাকে উৎসর্গ করে যাগ সম্পাদন করতে হবে। পিতার কথায় অসম্মত রোহিত আত্মরক্ষার জন্য ধনুর্বাণ গ্রহণ করে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে অরণ্যে প্রস্থান করলেন এবং সেখানেই তিনি এক বৎসর ধরে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। এদিকে রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের নিকটে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় বরুণের অভিশাপে পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হলেন। বৎসরান্তে রোহিত এই সংবাদ শুনে রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের জন্য অরণ্য থেকে গ্রামে এলেন। তখন ইন্দ্র ব্রাহ্মণরূপী মানুষের বেশ ধারণ করে তাঁর নিকটে বললেন যে, পর্যটনের দ্বারাই মানুষ সকল সম্পদ লাভ করে, আবার মনুষ্য সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি একস্থানে অবস্থানের দ্বারা নানা ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পর্যটনই শ্রেয়। স্বয়ং ইন্দ্র পর্যটকগণের সখা। ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রের বাক্য পালনীয় মনে করে রোহিত পুনরায় অরণ্যে ফিরে গেলেন এবং এক বৎসর সেখানে বিচরণ করলেন। তৃতীয় সংবৎসরে রোহিত যখন অরণ্য থেকে প্রত্যাগমন করেছিলেন তখনও ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র এসে তাঁকে পুনরায় বিচরণ করতে বললেন। কারণ পর্যটনে যে শ্রম হয় তার দ্বারা পর্যটকের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করে। সুতরাং তৃতীয় সংবৎসরও রোহিত বনে অতিবাহিত করলেন। পরে চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ

সংবৎসরেও রোহিত যখন অরণ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, ব্রাহ্মণের বেশে ইন্দ্র এসে প্রত্যেকবারই তাঁকে পুনরায় পর্যটন করতে বললেন, কারণ পর্যটনেই মানুষের ভাগ্যোদয় হয়। পর্যটনশীল মানুষ সত্যযুগের তুল্য পুণ্যবান এবং নিয়ত বিচরণশীল সূর্যের মতোই তিনিও মহিমা অর্জন করেন। এভাবে ব্রাহ্মণের বাক্য পালন করে ষষ্ঠ সংবৎসরে রোহিত যখন অরণ্যে বিচরণ করছিলেন তখন তিনি সেখানে সূর্যবংশের পুত্র অজীগর্ত ঋষিকে ক্ষুধাতুর ও উপবাসক্লিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। তাঁর শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ এবং শুনোলাঙ্গুল নামে তিনপুত্র ছিল। রাজপুত্র রোহিত পিতৃদায় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অজীগর্ত ঋষিকে একশত গাভী মূল্যস্বরূপ দিয়ে তাঁর একটি পুত্রকে ক্রয় করতে চাইলেন। অজীগর্ত জ্যেষ্ঠপুত্রকে দিতে রাজী হলেন না এবং তাঁর পত্নী কনিষ্ঠপুত্র দানে সম্মত হলেন না। অগত্যা মধ্যমপুত্র শুনঃশেপকে একশত গাভীর বিনিময়ে গ্রহণ করে রোহিত তাকে নিয়ে পিতার নিকটে এলেন এবং তাঁকেই উৎসর্গ করে বরুণের উদ্দেশে যাগ করতে বললেন। বরুণ এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন কারণ মেধ্যরূপে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণই যোগ্যতম। এভাবে রাজসূয় নামক সোমযাগের অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো এবং সেই যাগের অভিষেক অনুষ্ঠানে শুনঃশেপকে পুরুষপশুরূপে নির্দিষ্ট করা হলো। সেই যাগে বিশ্বামিত্রকে হোতৃপদে, জমদগ্নিকে অধ্বর্যুপদে, বশিষ্ঠকে ব্রহ্মাপদে এবং অয়াস্যকে উদগাতৃপদে বরণ করা হয়। শুনঃশেপকে যজ্ঞস্থলে আনা হলো, কিন্তু তাঁকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করার জন্য যজ্ঞস্থলে কেউ ছিল না। তখন তাঁর পিতা অজীগর্ত বললেন যে, তাঁকে আর একশত গাভী দিলে তিনি শুনঃশেপকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করে দিতে পারেন। সেইমতো একশত গাভীর বিনিময়ে শুনঃশেপ পিতাকর্তৃক যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হলেন। অনুষ্ঠানের অন্যান্য কর্ম ঠিকমতো সম্পন্ন হলেও শুনঃশেপকে বধ করার জন্য কেউই সম্মত হলেন না। তখন অজীগর্তই পুনরায় একশত গাভীর বিনিময়ে শুনঃশেপকে বধ করতে রাজী হলেন। পিতাকে শাণিত অসি হস্তে উপস্থিত দেখে শুনঃশেপ নিরুপায় হয়ে দেবতার আশ্রয় খুঁজলেন। তিনি এক এক করে প্রজাপতি, অগ্নি, সবিতা, বরুণ, বিশ্বদেবগণ, ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয় এবং সবশেষে ঊষার স্তব করলেন। ঊষাদেবীর উদ্দেশে তিনটি ঋক্ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে শুনঃশেপের বন্ধন শিথিল হতে আরম্ভ করল এবং শেষ ঋক্‌টি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। হরিশ্চন্দ্রেরও উদরপীড়ার উপশম হলো। অনন্তর বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋত্বিকগণ দেবতার কৃপাধন্য শুনঃশেপকেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে বললেন। তখন

শুনঃশেপ সরল উপায়ে সোমাভিষবের ব্যবস্থা করে যাগ সমাপ্ত করলেন। অতঃপর তিনি বিশ্বামিত্রের নিকটে গিয়ে তাঁর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হলেন। তখন অজীগর্ত বিশ্বামিত্রের নিকট তাঁর পুত্রকে ফেরত চাইলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্র বললেন যে দেবতারা শুনঃশেপকে তাঁর কাছে অর্পণ করেছেন, অতএব শুনঃশেপ দেবতারই পুত্র। অজীগর্ত শুনঃশেপকে তাঁর পিতৃবংশ ত্যাগ না করতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু যে পিতা তাঁকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন শুনঃশেপ আর তাঁর কাছে ফিরে যেতে রাজী হলেন না। তিনি বিশ্বামিত্রেরই পুত্রত্ব গ্রহণে আগ্রহী হলেন। বিশ্বামিত্রের নিজের একশ পুত্র ছিল। তিনি তাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে শুনঃশেপকে গ্রহণ করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু পুত্রদের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশজন পিতার আদেশ অসমীচীন মনে করে পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত হলেন। মধুচ্ছন্দাসহ পরবর্তী পঞ্চাশজন পিতার আজ্ঞা আনুযায়ী শুনঃশেপের জ্যেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়ে পিতার আশীর্বাদভাজন হলেন। শুনঃশেপ ও বিশ্বামিত্রের পুত্ররূপে ঋষি দেবতার নামে পরিচিত হলেন এবং মধুচ্ছন্দা প্রভৃতির সঙ্গে বিশ্বামিত্রের সকল জ্ঞান ও সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব অর্জন করলেন।[৭]

উপনিষদে অধ্যাত্মতত্ত্ব, নৈতিক উপদেশ ও মহৎ জীবনদর্শন সম্পর্কে নানা গল্প বর্ণিত আছে। *কেন উপনিষদ*-এর তৃতীয় খণ্ডে 'ব্রহ্ম-দেবতা-অসুর' সম্পর্কে চমৎকার গল্প পরিবেশিত হয়েছে।

একদিন দেবতা ও অসুরদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে দেবতাদের পরাজয় নিশ্চত হয়ে উঠেছিল। তখন ব্রহ্মের সহায়তায় অসুরদের পরাজয় হয়। দেবতারা বিজয়ী হলেন। এই বিজয়ে তাঁরা মহিমান্বিত হলেন, মনে মনে গর্ববোধ করলেন। সর্বোপরি তাঁরা মনে করলেন এই বিজয়, এই মহিমা তাঁদেরই। ব্রহ্ম দেবতাদের এই মিথ্যা অভিমান জানতে পেরে তাঁদের মঙ্গলার্থে ছদ্মবেস ধারণ করে তাঁদের নিকট আবির্ভূত হলেন। কিন্তু দেবতারা তাঁকে চিনতে পারলেন না। দেবতাদের পক্ষ থেকে অগ্নিদেবকে বলা হলো – হে জাতবেদা অগ্নিদেব, সম্মুখস্থ এই যক্ষ অর্থাৎ পূজনীয় মূর্তিটি কে তা বিশেষভাবে জেনে আসুন। অগ্নিদেব যক্ষের নিকটে গেলেন। যক্ষ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন – তুমি কে? অগ্নিদের বললেন – আমি প্রসিদ্ধ অগ্নি, আমি জাতবেদা। ব্রহ্ম বললেন – এমন

প্রসিদ্ধ নাম তোমার, তোমার কি শক্তি আছে? অগ্নিদেব বললেন – এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সমস্তই আমি দগ্ধ করতে পারি। ব্রহ্ম অগ্নিদেবের সামনে একটি তৃণখণ্ড রেখে বললেন, এটি দগ্ধ করো। অগ্নিদেব সম্পূর্ণ শক্তি দিয়েও সেটি দগ্ধ করতে পারলেন না। তিনি ব্যর্থ মনে দেবগণের নিকট ফিরে গেলেন।

দেবতারা বায়ুদেবকে যক্ষের নিকট পাঠালেন। যক্ষ বায়ুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন – তুমি কে? বায়ুদেব বললেন – আমি প্রসিদ্ধ বায়ু, আমি প্রসিদ্ধ মাতরিশ্বা। ব্রহ্ম বললেন – এমন প্রসিদ্ধ নাম তোমার, তোমার কি শক্তি আছে? বায়ুদেব বললেন – এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা সমস্তই আমি উড়িয়ে নিতে পারি। ব্রহ্ম বায়ুদেবের সামনে একটি তৃণখণ্ড রেখে বললেন, এটি উড়াও দেখি। বায়ুদেব সম্পূর্ণ শক্তি দিয়েও তা উড়াতে পারলেন না। তিনিও ব্যর্থ মনে দেবগণের নিকট ফিরে এলেন।

তারপর দেবগণ ইন্দ্রদেবকে বললেন – হে ইন্দ্রদেব, সম্মুখস্থ এই যক্ষ অর্থাৎ পূজনীয় মূর্তিটি কে তা বিশেষভাবে অবগত হও। ইন্দ্রদেব বললেন – ঠিক আছে। এই কথা বলে ইন্দ্রদেব যক্ষের নিকট গেলেন, কিন্তু যক্ষ সাথে সাথে অন্তর্হিত হলেন। ইন্দ্রদেব তখন আকাশে স্ত্রীরূপিণী বিচিত্রবর্ণে শোভিতা হৈমবতী উমাকে দেখতে পেয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন – কে এই যক্ষ? উমা ইন্দ্রদেবকে বললেন – ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মেরই বিজয়ে তোমরা এই প্রকার মহিমান্বিত বোধ করছ। তাঁর কথা থেকে ইন্দ্রদেব জানতে পারলেন যে, তিনি ব্রহ্ম। *উপনিষদ*-এর এই গল্পের উপকরণ গল্পসাহিত্য সৃষ্টিতে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ-এর প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডে 'ইন্দুররাজ ও কুক্কুরপ্রধান' ইত্যাদি জীবজন্তুর গল্প বর্ণিত হয়েছে।

একদিন দলভপুত্র গ্লাব মৈত্রেয় বেদ পাঠের জন্য নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন। তার নিকট প্রথমে সাদা রঙের এক কুকুর উপস্থিত হলো। তারপর আরও কতগুলো কুকুর উপস্থিত

হয়ে বলল, আমরা খুব ক্ষুধার্ত। আমরা যেভাবে খাদ্য পেতে পারি তার জন্য সাম গান করুন। শ্বেত কুকুর তাদের বলল – তোমরা প্রভাতে এখানে আমার নিকট এসো। গ্লাব মৈত্রেয় কুকুরের কথানুসারে সেখানেই অপেক্ষা করে রইল। বহিস্পবমান স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করার সময়ে উদ্গাতা যেমন পরস্পর সংলগ্ন হয়ে চলতে থাকে, এ কুকুরেরাও সেইরকম করতে লাগল। তারপর বসে তারা 'হিং' শব্দটি উচ্চারণ করল। এর অর্থ হলো – 'ওম্' – ভোজন করব। 'ওম্' – পান করব । 'ওম্' – অন্ন আহরণ করব। হে অন্নদাতা সূর্য, এই স্থানে অন্ন আহরণ করুন।

এমনি বিবিধ গল্প *উপনিষদে* রয়েছে।

এর পরে যেখানে গল্পের বিচিত্র সমাহার রয়েছে সেটি হলো, *রামায়ণ*। এখানে আদি কাণ্ডে বিশ্বামিত্র মুণি রাম-লক্ষ্মণের প্রশ্নের উত্তরে গঙ্গার উপাখ্যানটি বললেন – হিমালয়ের পত্নী সুমেরু, তাঁর কন্যা মেনার গর্ভে গঙ্গার জন্ম। দেবগণের কার্য সাধনের জন্য পিতা হিমালয় গঙ্গাকে সর্গলোকে প্রেরণ করেন। পরে আবার দেবতারা গঙ্গাকে বললেন, হে দেবী তুমি গর্ভধারণ করে দেবতাদের প্রিয়কার্য সাধন করো। গঙ্গা শিবতেজ ধারণ করতে গেলে তা সহ্য করতে পারলেন না। তখন অগ্নির উপদেশে গঙ্গা হিমালয়ের পার্শ্বে তেজ পরিত্যাগ করলেন। তা থেকে কুমার স্কন্দ বা কার্তিকেয়ের জন্ম হলো।

এভাবে গঙ্গার উপাখ্যানের পরে বিশ্বামিত্র সগর রাজার উপাখ্যানটি বললেন – প্রাচীনকালে সগর নামে এক ধর্মপ্রাণ রাজা ছিলেন। তাঁর দুই পত্নী থাকা সত্ত্বেও তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাই তিনি পুত্রসন্তান কামনায় তপস্যা শুরু করেন। তপস্যার প্রভাবে এক পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র এবং অপর পত্নীর গর্ভে ষাট হাজার কীর্তিমান পুত্রের জন্ম হয়। কিছুদিন পরে সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। অংশুমান নামে এক পৌত্র যজ্ঞের অশ্বের অনুগমনে নিযুক্ত হন। কিন্তু ইন্দ্র রাক্ষসের রূপ ধারণ করে যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করেন। রাজপুত্রগণ কোথাও অশ্বের অনুসন্ধান পেলেন না। অনন্যোপায় হয়ে সগর পুত্রগণ পৃথিবী খনন করতে লাগলেন তাতে বহু প্রাণির মৃত্যু হলো। এতে ভগবান

বাসুদেব, যিনি কপিলরূপ ধারণ করে আছেন, তিনি ক্ষুব্ধ হন। এ পাপে তারা ধ্বংস হবে বলে ব্রহ্মা মন্তব্য করেন। আবার সগরের নির্দেশে পুত্রগণ ধরাতল খনন করতে করতে ভগবান কপিলের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। তখন ভগবান কপিল ক্রোধাবিষ্ট হয়ে হুংকার করলেন, সাথে সাথে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। এরপর সগর পৌত্র অংশুমানকে পাঠালেন। তিনি পিতৃব্যদের ভস্মীকৃত দেহ দেখে কপিল দেবকে সন্তুষ্ট করে যজ্ঞাশ্ব নিয়ে ফিরে এলেন। সগর যথাবিধি যজ্ঞ সম্পাদন করলেন। এছাড়াও *রামায়ণ*-এর ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যান, মুনিকুমারবধের গল্প, বাতাপির গল্প, কাঠবিড়ালির গল্প, মন্দোদরী এবং সীতার গল্প, সূর্পনখার গল্প, কুম্ভকর্ণের নিদ্রার গল্প, রামচন্দ্রের যুদ্ধ জয়ের গল্প প্রভৃতি গল্প সংস্কৃত গল্পসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

*মাহাভারতে*ও বিচিত্র গল্পের সমাহার রয়েছে। এখানে আদি পর্বে প্রথমেই দেখা যায়, 'গরুড় ও গজকচ্ছপে'র গল্প। গল্পটি হলো – কশ্যপ ঋষির দুই পত্নী কদ্রু ও বিনতা। কদ্রুর গর্ভে এক হাজার নাগ পুত্র হলো আর বিনতার গর্ভে মহাপরাক্রমশালী গরুড়ের জন্ম হলো। গরুড় তার মায়ের দাসত্ব মোচনের জন্য নাগদের নির্দেশে অমৃত আনতে গমন করে। পথে ক্ষুধা নিবারণের জন্য পিতা কশ্যপের কথানুসারে মহাগিরিতুল্য গজ এবং মহামেঘতুল্য কচ্ছপ ভোজন করে শক্তি অর্জন করে। পরে গরুড় স্বর্গের দেবতাদের পরাস্ত করে ভগবান বিষ্ণুদেবকে সন্তুষ্ট করে অমৃত এনে মায়ের দাসত্ব মোচন করে।

এ প্রসঙ্গে মহর্ষি কশ্যপ গজকচ্ছপের জন্মের কাহিনিটি গড়ুরকে বলে। সেটি হলো – বিভাবসু ও সুপ্রতীক নামে দুই ভাই ছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতীক জ্যেষ্ঠ বিভাবসুকে ধনবিভাগের জন্য বারবার বলে আসছে। কিন্তু বিভাবসু ভাইকে বোঝালো, 'যে ভ্রাতারা গুরু ও শাস্ত্র মানে না তারাই পরস্পরকে শত্রু ভেবে শঙ্কিত হয় ; সাধু লোকে ধন বিভাগের প্রশংসা করেন না।'[৬] এ উপদেশ শুনেও তার মন নরম হলো না বরং সে তার পূর্ব সিদ্ধান্তেই অটল থাকলো। এতে বিভাবসু বিরক্ত হয়ে কনিষ্ঠকে অভিশাপ দিল, তুমি গজ হয়ে থাকো। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতীকও জ্যেষ্ঠ বিভাবসুকে অভিশাপ দিল, তুমি কচ্ছপ

হও। তখন ঐ দুই ভ্রাতা গজ-কচ্ছপ হয়ে সরোবরে অবস্থান করে একে অপরকে আক্রমণ করতে থাকে। গড়ুর তাদের ভক্ষণ করে অভিশাপ মোচন করে।

মহাভারত-এর বনপর্বে লোমশ মুনি ধর্মবল সম্পর্কে একটি গল্প বলেন। গল্পটি হলো – অগ্নি ও ইন্দ্র কপোত ও শ্যেনরূপে রাজা উশীনরের ধর্মবল পরীক্ষা করার জন্য উপস্থিত হলেন। অগ্নি আপন প্রাণ রক্ষার জন্য কপোতরূপে এবং ইন্দ্র তার মাংসভক্ষণের জন্য শ্যেনরূপে গিয়েছিলেন। তারপর কপোত গিয়ে রাজার ক্রোড়ে লুকালো। সে রাজাকে বলল – রাজা ! আমি প্রাণার্থী শ্যেন হতে ভীত হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য আপনার নিকটে এসেছি। শ্যেন রাজাকে বলল-রাজা ! আমি ক্ষুধার্ত এ কপোত আমার বিহিত খাদ্য। আমার খাদ্য আমাকে দিয়ে দিন। রাজা বললেন – এই শরণাগতকে আমি ত্যাগ করতে পারি না। তার বিনিময়ে যা চাও তাই দেব। শ্যেন বলল এর বিনিময়ে যদি আপনার নিজের শরীর হতে সমপরিমান মাংস কেটে দিতে পারেন তাহলে দিন। তখন রাজা তুলাদণ্ডে এক পাশে কপোতকে রেখে আরেক পাশে নিজের দেহ হতে মাংস কেটে দিতে লাগলেন। কিন্তু বারংবার মাংস কেটে দিলেও কপোতের সমান হলো না। অবশেষে রাজা নিজেই দাড়িপাল্লায় উঠলেন। তখন শ্যেনরূপী ইন্দ্র ও কপোতরূপী অগ্নি নিজ নিজ রূপ ধারণ করে ধর্মরাজকে বর দিয়ে প্রশংসা করে বললেন – জগতে তোমার এই মহান কীর্তি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তৎক্ষণাৎ রাজা পরম সুন্দর মূর্তি ধারণ করে পৃথিবী ও আকাশ আবৃত করে, অতি আশ্চর্য মণিময় দিব্য রথে উঠে স্বর্গে চলে গেলেন।

এছাড়া *মহাভারতে* হনুমানের কাহিনি, দীর্ঘায়ু বক ও ঋষির কাহিনি, রামের উপাখ্যান, সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান, কাক ও হংসের উপাখ্যান, মার্জার-মূষিক-সংবাদ. বিশ্বামিত্র-চণ্ডাল সংবাদ, কৃতঘ্ন গৌতমের উপাখ্যান প্রভৃতি গল্প সংস্কৃত গল্পসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

এরপর *পুরাণ*-এর গল্প নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, আঠেরটি পুরাণ এবং আঠেরটি উপপুরাণে গল্পের বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ অতি জনপ্রিয় 'মান্ধাতা ও ঋষি সৌভরির' উপাখ্যানটি উপস্থাপন করা হলো –

ইক্ষ্বাকু বংশের সুবিখ্যাত রাজা যুবনাশ্ব। তাঁর একশ রাজমহিষী–কত সুখেই থাকার কথা। কিন্তু সন্তান না থাকায় মনের দুঃখে রাজ্য ছেড়ে যুবনাশ্ব বনে চলে গেলেন। ইচ্ছা, বাকি জীবনটা তপস্যা করেই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু সঙ্গ ছাড়লেন না রানীরা। একশ রানীও বনে এলেন রাজার পিছে পিছে। বনের ঋষিরা সব শুনে মনে মনে খুবই কষ্ট পেলেন। এর একটা প্রতিকার করবেন। ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করলে জগতে এমন কি বস্তু আছে, যা পাওয়া যায় না! তাই শুভদিনে যজ্ঞের আয়োজন করলেন। যজ্ঞকুণ্ড নিভিয়ে মন্ত্রপূত জল কলসীতে ভরে যজ্ঞবেদীর ওপর রেখে ঋষিরা বিশ্রামে গেলেন। পরদিন সকালে রানীদের স্নান করিয়ে এই জল তাঁরা খেতে দেবেন। রাজা এই জলের ব্যাপারটা কিছুই জানতেন না। খুব ভোরে তিনি দারুণ তেষ্টায় ছুটে গিয়ে কলসীর সেই জলটাই খেয়ে ফেললেন। যেন প্রাণ বাঁচল। আবার এসে শুয়ে পড়লেন। খুব ভোরে রানীরা স্নান সেরে এসেছেন। পুত্র-কামনায় যজ্ঞের পবিত্র জল এবার তারা ঋষিদের হাত থেকে নিয়ে পান করবেন। যজ্ঞবেদী থেকে কলসী তুলতে গিয়ে ঋষিরা অবাক। কি হলো? কলসী খালি কেন? পরে শুনলেন যুবনাশ্বের কথা। করার কিছু নেই। যজ্ঞের মন্ত্রপূত জল। বৃথা হবার নয়। যুবনাশ্বের পেটেই জন্ম নিল সন্তান। কিন্তু জননী তো নেই, কার স্তনদুগ্ধ খেয়ে প্রাণ বাঁচবে। এমন সময় এলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি তার বুড়ো আঙ্গুলটি শিশুর মুখে পুরে দিলেন । শিশুটিও চুষতে লাগল, যেন অমৃত পান করছে। দেখতে দেখতে সকলের চোখের সামনেই হয়ে উঠল এক বলিষ্ঠ যুবক। ইনিই মান্ধাতা। তাঁর তিন পুত্র এবং সর্বগুণসম্পন্না পঞ্চাশটি কন্যা। সেই সময় সৌভরি নামে এক ঋষি তপোবন ছেড়ে তপস্যার জন্য জলের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জলে মাছের স্ত্রী, পুত্র, নাতি-পুতি নিয়ে বিরাট সংসার। এই দৃশ্য দেখে ইচ্ছে জাগল, বিয়ে করে সংসারী হবেন। নির্জনে বসে এই সাধনার চেয়ে কত সুখ, কত আনন্দ রয়েছে ঐ জীবনটায়! তাই তিনি জল থেকে

উঠে মান্ধাতার একটি মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে গেলেন। সৌভরির ইচ্ছা শুনে মান্ধাতার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। পৃথিবীতে তাদের যোগ্য স্বামী হবার মতো কোথাও কোন যুবরাজ আছে কিনা সন্দেহ। আর এই সৌভরি ! শরীরটা জরাজীর্ণ। রাজা কৌশলে প্রত্যাখ্যান করার জন্য মেয়েরা স্বয়ম্বরা, সে কথা বললেন। সৌভরি যোগ-সাধনায় সিদ্ধ। রাজার মনের কথা বুঝতে কি আর তাঁর বাকি থাকে? সঙ্গে সঙ্গে ঋষি বললেন–নিশ্চয়, নিশ্চয় রাজা। তখন তিনি সৌম্য সুদর্শন এক যুবকের রূপ ধারণ করে কন্যান্তপুরে ঢুকলেন। এখানে তাঁর আসার কারণ শুনে, তখন রীতিমত একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল মেয়েদের মধ্যে। কে আগে দেবে তাঁর গলায় মালা ! পঞ্চাশটি মেয়েই তাঁকে মাল্য পড়িয়ে দিলেন। রাজাও বিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। বিয়ে করে সৌভরি রাজকন্যাদের নিয়ে চলে গেলেন নিজের তপোবনে। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা প্রাসাদ তৈরি করলেন। দেখতে দেখতে সৌভরি হলেন একশ পঞ্চাশটি পুত্রের পিতা। নাতি-পুতির মুখ দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল সৌভরির মন। এক একটা বাসনা পূরণ হয়, জাগে আর এক নতুন বাসনা। এর যেন শেষ নেই। ভুল বুঝতে পারলেন সৌভরি। সংসারের যে এত মায়া-মোহ, তা তিনি আগে বুঝতে পারেননি। সাথে সাথে সঙ্কল্প করে সব ছেড়ে-ছুড়ে সাধনায় লিপ্ত হলেন। আবার তপোবনে এসে যাবতীয় আসক্তি শান্ত করে আকুলভাবে ভগবান বিষ্ণুর পায়ে নিজেদের ধ্যান-জ্ঞান, পাপ-তাপ সব অঞ্জলি দিয়ে হয়ে গেলেন সম্পূর্ণ সংসার বিরাগী। সহধর্মিণীরাও তাঁর পথে গেলেন।

অন্য একটি গল্পে বিখ্যাত রাজা পৃথুর কাহিনি জানতে পারা যায়। গল্পটির মূল বক্তব্য নিম্নরূপ –

মনু বংশের রাজা বৈরাজ। সেই বংশের রাজা অঙ্গের বহুদিন কোনো সন্তান হয়নি। মুনি-ঋষিদের পরামর্শে অঙ্গ এক বিশাল যজ্ঞ করলেন। শেষে একটি পুত্র হলো, পুত্রের নাম বেণ। কিন্তু পুত্রের আচরণ দেখে রীতিমত চিন্তায় পড়লেন অঙ্গ। ঈশ্বরের স্তব-স্তুতির ধার-ধারে না। শুধু শিকার আর শিকার। ইতোমধ্যে বনের কত নিরীহ পশুপাখি যে মারা পড়ল তার হাতে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রতিবেশী ছেলেপুলে থেকে গৃহস্থেরা পর্যন্ত সব সময়

শঙ্কিত। অনেক চেষ্টা করলেন পিতা অঙ্গ ছেলের মতি-গতি ফেরাবার, সৎ পথে আনবার কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হলো। আত্মগ্লানি আর ধিক্কারে ভরে গেল অঙ্গের মন। একদিন গভীর রাতে কাউকে কিছু না বলে কোথায় যে চলে গেলেন অঙ্গ, কেউ তাঁকে খুঁজে পেল না। রাজাবিহীন রাজ্যে নানা অনর্থ হতে শুরু করল। তাই মুনি-ঋষিরা সবাই মিলে বেণকে রাজা করলেন। বেণ রাজা হয়েই ঘোষণা করে দিল, তার রাজ্যে যাগ-যজ্ঞ চলবে না। এতে ঋষিরা ক্ষুব্ধ হয়ে তার দিকে কুশ ছুঁড়লেন তৎক্ষণাৎ আগুনের ফলা নিয়ে বর্শা যেন ছুটে এসে বেণের বুকটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণহীন দেহ নিয়ে লুটিয়ে পড়ল বেণ। বেণ নিহত হয়েছে, খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে নানা অশান্তি-অরাজকতা শুরু হলো। এরপর ঋষিরা আবার গেলেন সেখানে, যেখানে মা সুনীথা বেণের মৃতদেহ আগলে বসেছিলেন। সেখানে গিয়েই ঋষিরা শুরু করে দিলেন বেণের উরু মন্থন করতে। এতে করে বেরিয়ে এলেন সুন্দর এক পুরুষ। ইনিই হলেন বিখ্যাত রাজা পৃথু। মহাসমারোহে রাজসিংহাসনে সকলের সমর্থন নিয়ে পৃথুর রাজ্যাভিষেক হলো। এভাবে রাজা হয়েছিলেন বলেই পৃথুকে বলা হয় পৃথিবীর প্রথম রাজা। এবার শুরু হলো পৃথুর রাজ-কাজ। সঙ্কল্পে অটল তিনি। আগুনের মত তেজ নিয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট পৃথু। একদিন রাজসভায় হাজির হলো প্রজার দল। তাদের নানা দুঃখ-কষ্টের কথা জানাল। প্রজাদের কাতর আবেদন তাঁর বুকে বাজল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবতে লাগলেন, কেন পৃথিবী থেকে খাদ্যদ্রব্য, গাছ-পালা সব লোপ পেল? পৃথিবীর এত দুঃসাহস কোথা থেকে এল যে, তিনি রাজা হবার পরেও প্রজাদের এমন হাহাকার থাকে। পৃথিবীর ওপর দারুণ রাগ। পৃথু তখন ধনুক হাতে তুলে নিতেই পৃথিবী ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। তখন পৃথুর সম্মানে পৃথিবী আবার সব ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলো। ফুলে-ফলে-শস্যে পৃথিবী পরিপূর্ণ হলো। তাঁর স্ত্রী শুচি-সাধ্বী অর্চি। চারটি ছেলের জননী। এরপর ছেলেদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে পৃথু চলে গেলেন তপস্যায়। অর্চিও চলে গেলেন তাঁর সঙ্গে, ঠিক যেন রামের সঙ্গে সীতা! এভাবে পৃথিবীর আদি রাজা পৃথু অমর হয়ে রইলেন।

এছাড়া প্রত্যেক *পুরাণে* অসংখ্য গল্প বিধৃত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্পের শিরোনাম দেওয়া হলো, যেমন – *বিষ্ণুপুরাণে* – হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদের কাহিনি, ঋভু ও নিদাঘের কাহিনি, রাজা শতধনুর কাহিনি, কল্মষপাদের কাহিনি, নিমি থেকে নিমিখের কাহিনি, পুরুরবার উপাখ্যান, মহাতাপস ধ্রুবের কাহিনি, জড়ভরতের উপাখ্যান, বাসুদেবের আবির্ভাব কাহিনি প্রভৃতি।

ব্রহ্মপুরাণে দেখা যায় – ধুন্ধুমার কাহিনি, সত্যব্রতের কহিনি, সগর রাজার কাহিনি, ভগীরথের কাহিনি, কপোত-কপোতী ও ব্যাধ সংবাদ, নাগেশ্বর কাহিনি, দিতি-অদিতি সংবাদ, দধীচির আত্মত্যাগের কাহিনি, শুনঃশেফ কাহিনি, বিষ্ণুমূর্তির ভ্রমণ কাহিনি, মহাশনি নিধন কাহিনি প্রভৃতি।

ভাগবতপুরাণে দেখা যায় – নন্দালয়ে বালগোপালের অলৌকিক কাহিনি, রাখালরাজার অসুর বধের কাহিনি, কালীয় দমনের কাহিনি, দেবাসুর সংবাদ ও সমুদ্র মন্থনের কাহিনি প্রভৃতি।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেখা যায় – জৈমিনি ঋষির সঙ্গে আশ্চর্য পাখিদের গল্প, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান ও বিভিন্ন মনুদের কাহিনি প্রভৃতি।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দেখা যায় – বেদবতীর কাহিনি, সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনি, অষ্টাবক্র মুনির কাহিনি-সহ প্রভৃতি গল্প।

পদ্মপুরাণে দেখা যায় – রামচন্দ্র ও অগস্ত সংবাদ, বিদ্যুন্মালী বধের কাহিনি, বরুণের করুণ কাহিনি, বহ্নিমুখের কাহিনি, বিধুত রাজার কাহিনি, শৌন-কলার কাহিনি প্রভৃতি।

শিবপুরাণে দেখা যায় – পার্বতী ও শিবের পরিণয়ের কাহিনি, ত্রিপুর দহন কাহিনি, ভীম রাক্ষসের কাহিনি, সোমনন্দীর কাহিনি, চিত্ররথ রাজার কাহিনি প্রভৃতি।

বিষ্ণুশর্মার *পঞ্চতন্ত্র*-এর পরে খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতক থেকে খ্রিস্টীয় ১ম শতকে ধ্রুপদী গল্পসাহিত্যে প্রথম যুক্ত হয়েছে গুণাঢ্যের *বৃহৎকথা*। এই গ্রন্থকে অবলম্বন করে

পরবর্তীকালে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গ্রন্থগুলি হলো – ক্ষেমেন্দ্রের *বৃহৎকথামঞ্জরী*, বুদ্ধস্বামীর *বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ*, সোমদেবের *কথাসরিৎসাগর*। *কথাসরিৎসাগরে পঞ্চতন্ত্র*-এর কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এছাড়া এর কাহিনি অবলম্বন করে পরবর্তীতে অনেক কাব্য-নাটক রচিত হয়েছে। যেমন – দণ্ডীর *দশকুমারচরিত*, বাণের *কাদম্বরী*, ধনপালের *তিলকমঞ্জরী*, সুবন্ধুর *বাসবদত্তা*, সোমদেবের *যশস্তিলকচম্পূ*, ভাসের *স্বপ্নবাসবদত্তা* ও *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ*, শ্রীহর্ষের *নাগানন্দ* ও *রত্নাবলী* প্রভৃতি। গণিকা মদনমঞ্জুকার আখ্যান *বৃহৎকথা*-এর একটি প্রসিদ্ধ গল্প। ভাসের *চারুদত্ত* এবং শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* নাটকের বসন্তসেনার চরিত্র বর্ণনায় আলোচ্য গল্পের প্রভাব রয়েছে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতকে দণ্ডী *দশকুমারচরিত* রচনা করেন। এখানে কুমারদের অভিজ্ঞতা লব্ধ বিষয়সমূহ গল্পে স্থান পেয়েছে। খ্রিস্টীয় নবম শতকে রচিত হয় *হিতোপদেশ*। বিদদ্ধ পণ্ডিত নারায়ণ গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি *পঞ্চতন্ত্র*-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকে *বেতালপঞ্চবিংশতি* রচিত হয়। *শুকসপ্ততিকথা*ও একই সময়ে রচিত গ্রন্থ। *শুকসপ্ততিকথা*'য় *পঞ্চতন্ত্র*-এর বিভিন্ন গল্পে বর্ণিত নারীর কপট প্রেম, ধূর্তামি ও বিশ্বাস- ঘাতকতার মতো নানা বিষয়ের ভিত্তিতে গল্পগুলি রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা* ত্রয়োদশ শতকে রচিত বলে অনেকে মত দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ এটিকে মহাকবি কালিদাসের রচনা বলে উল্লেখ করেন। সে হিসেবে রচনাকাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক। একবিংশ শতকে অধ্যাপক দুলাল ভৌমিক *রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প* নামে নিজস্ব ভাষাশৈলী দিয়ে এর অত্যন্ত সুখপাঠ্য একখানা গ্রন্থ উপহার দিয়ে পাঠকদের আকৃষ্ট করেছেন। *পুরুষপরীক্ষা* গ্রন্থটি পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতির রচিত। এটি *পঞ্চতন্ত্র*-এর অনুকরণে মূল আখ্যানের পটভূমিকায় গল্পগুচ্ছকে কবি সুকৌশলে একই যোগসূত্রে গ্রথিত করেছেন। *ভোজপ্রবন্ধ* গ্রন্থটি ষোড়শ শতকে রচিত। এটি বল্লাল সেন রচিত *ভোজ-প্রবন্ধ* নামে খ্যাত। *ভরটকদ্বাত্রিংশিকা* গ্রন্থটি পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতকে রচিত। গ্রন্থটির লেখক অজ্ঞাত। উনিশ শতকে বঙ্গদেশের জনৈক জমিদারের উৎসাহে জগদ্বন্ধু নামে জনৈক পণ্ডিত *আরব্যরজনী* নামক প্রখ্যাত আরবি গল্প সংস্কৃতে অনুবাদ করেন।

উপর্যুক্ত ক্রমধারা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, গল্পসাহিত্য বৈদিক যুগ থেকে প্রবাহিত হয়ে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে। গল্পসাহিত্যের মাধ্যমে সমাজের রাজা-মুনি-ঋষি, পণ্ডিত-বিদ্বান থেকে আরম্ভ করে অতি সাধারণ মানুষের মন নানাভাবে আলোড়িত হয়েছে। সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের উপজীব্য বিষয়গুলো মূলত শিক্ষা ও জ্ঞানমূলক হলেও তাতে চিত্তবিনোদন- সহ সমাজ ও রাষ্ট্রের বহু প্রয়োজনীয় উপকরণ লুকায়িত রয়েছে। গল্পসাহিত্যের নানা যুগ ও পর্যায়ের বিকাশের মধ্য দিয়ে সে বিষয়গুলো আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা উক্ত গল্পগুলোর সহায়তায় জীবনমুখী বিভিন্ন বিষয়, প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নীতি আদর্শের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারি, নির্দেশনা পেতে পারি। তাছাড়া জীবনকে আনন্দদায়ক, সুখময় করতে এবং অবসর যাপনের ক্ষেত্রে গল্পসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই গল্পসাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডার।

তথ্যনির্দেশ :

১. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা – ২০১২, পৃ. ৪৫৯

২. রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত, *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, (দ্বিতীয় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ – ২০০০, পৃ. ৫৮০-৫৮১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯-৪৩০

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০০-৬০১

৬. শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *বৈদিক পাঠসংকলন*, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কোলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪১৫, পৃ. ২৪৯-২৫০

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪-২৬৫

৮. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত, *মহাভারত*, সারানুবাদ-রাজ শেখর বসু, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, ১৪২২, পৃ. ১৭

তৃতীয় অধ্যায়

গল্পসাহিত্য হিসেবে পঞ্চতন্ত্রের মূল্যায়ন

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে গল্পসাহিত্য হিসেবে *পঞ্চতন্ত্র*-এর মূল্যায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হবে। মানুষমাত্রই গল্পের অনুরাগী। তাই সাহিত্য জগতে গল্পের গুরুত্ব রয়েছে। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই শিশু-কিশোর-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই গল্পের জন্য প্রমত্ত হয়। বস্তুত মানুষ স্বভাবজাত প্রবৃত্তি থেকেই গল্প শুনতে পছন্দ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে তাই গল্প সর্বাপেক্ষা আদৃত ও সর্বজনগৃহীত। সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের জন্য গল্পের এক অমূল্য ভাণ্ডার সঞ্চয় করে রেখেছে। তাই গল্পসাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যে অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে –

> সংস্কৃত সাহিত্যে পশু-পাখি ও মানুষের গল্প একই সঙ্গে কখনো বা পৃথক পৃথকভাবে সঙ্কলিত। গল্পের রাজ্যে বাস্তব ও কল্পনার আশ্চর্য সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। অঘটন-ঘটনপটীয়সী কল্পনার রঙে রাঙানো সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদনের অমূল্য উপকরণরূপে চেতন ও জড় জগতের মনুষ্য ও মনুষ্যেতর সকলকে নিয়েই গল্পসাহিত্যের বিচিত্র সম্ভার। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের অন্তর্গত সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতে গল্পসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ সঞ্চিত আছে। তবে তুলনামূলকভাবে সংস্কৃত গল্পসাহিত্যই মৌলিক রচনা। আলোচ্য সাহিত্যের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করলে তার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়।[১]

গল্পসাহিত্যের মধ্যে *পঞ্চতন্ত্র*-এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুশর্মা রচিত এ গ্রন্থখানি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম গল্পগ্রন্থ এবং গল্প-সাহিত্যের সকল প্রশংসার মূল দাবিদার। কেননা, *পঞ্চতন্ত্র* সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের উৎস। প্রাচীন সঙ্কলনকারগণ সকলেই *পঞ্চতন্ত্রকে* মূল গ্রন্থরূপে উল্লেখ করে নিজেদের ঋণের কথা স্বীকার করেছেন। এখানে ধর্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির আদর্শ, গুরুগম্ভীর ও লঘুচপল বক্তব্য, ব্যঙ্গ-কৌতুক

প্রভৃতি সর্বজনবোধ্য ভাষার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা *পঞ্চতন্ত্র*-এর গল্প পাঠ করে উপভোগ করি তরল হাস্যরস, তীক্ষ্ণ-বিদ্রুপ, হার্দিক উপদেশ, সরস আখ্যান এবং বৈচিত্র্যময় অসংখ্য চরিত্র। আধুনিক কালের পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যিকগোষ্ঠী গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস ও লোকসাহিত্য সংস্কৃত *পঞ্চতন্ত্র*-এর গল্পের অনেক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁদের সাহিত্যভুবন বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করেছেন।[২] *পঞ্চতন্ত্র*-এর লেখক বিষ্ণুশর্মা তাই কথামুখে নিজেই প্রশংসা করে বলেছেন –

অধীতে য ইদং নিত্যং নীতিশাস্ত্রং শৃণোতি চ।
ন পরাভবমাপ্নোতি শক্রাদপি কদাচন॥১/কথা-৭

অর্থাৎ, এই নীতিশাস্ত্রখানি নিয়মিত যে অধ্যয়ন করে বা শোনে সে ইন্দ্রের কাছে কখনও হার মানে না।

গল্পসাহিত্য হিসেবে *পঞ্চতন্ত্র*-এর মূল্যায়নের জন্য কতগুলো বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন–

১. মনীষীদের গবেষণালব্ধ মন্তব্য
২. পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় *পঞ্চতন্ত্র*-এর সংস্করণ
৩. সবকিছুতে সমদর্শন
৪. মনস্তাত্ত্বিক বিষয়
৫. শিশুশিক্ষায় গুরুত্বারোপ
৬. হাস্যরস ও ব্যঙ্গ প্রকাশ
৭. সাহিত্যিক মূল্য
৮. পঞ্চতন্ত্র-এর প্রভাব

এই বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে *পঞ্চতন্ত্র*-এর মূল্যায়ন করা হবে।

মনীষীদের গবেষণালব্ধ মন্তব্য

দেশি-বিদেশী মনীষায় *পঞ্চতন্ত্র* অমূল্য গল্পগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মনীষীরা *পঞ্চতন্ত্র*-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং এ নিয়ে বিশদ গবেষণা করেছেন। তা থেকে *পঞ্চতন্ত্র*-এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য বিশারদ Franklin Edgerton নামক এক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন এবং বিশ্বসাহিত্যে তার প্রভাব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। Edgerton সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেন যে –

> *পঞ্চতন্ত্র* অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে গুণগতভাবে অনন্য। *পঞ্চতন্ত্র*-এর অন্যান্য সংস্করণ থেকে *তন্ত্রাখ্যায়িকা* ঠিক প্রকরণে নয় বরং গুণগতভাবে আলাদা; এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মৌলিক; সর্বোপরি, *তন্ত্রাখ্যায়িকা* স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল; আবার এ প্রসঙ্গে দক্ষিণী *পঞ্চতন্ত্র* আরও এগিয়ে, যার মৌলিকত্ব এমনকি *তন্ত্রাখ্যায়িকা'র* চেয়েও বেশী, যেখানে রয়েছে স্বকীয়তার ছাপ, যা অন্য কোনো ভাষ্যের তুলনায় অসাধারণ।[৩]

কতিপয় গবেষকের অনুমান – মূল *পঞ্চতন্ত্র* প্রাকৃতে রচিত হয়েছিল। Hertel বলেন –

> পশ্চিমা আলোচকদের কারও কারও মতে *পঞ্চতন্ত্র*-এর ওপর প্রাচীন গ্রিসের ঈশপের গল্পগুলির প্রভাব থাকতে পারে। এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয় কথাসাহিত্যের বিশাল আকৃতি এবং বিবিধ বৈচিত্র্য আলোচনা করলে বহিরাগত প্রভাব তুচ্ছ মনে হয়। অবশ্য দু-চারটি গল্পের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রভাব প্রতিফলিত হতেও পারে।[৪]

Arthur Macdonell *A History of Sanskrit Literature* গ্রন্থে *পঞ্চতন্ত্র* সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন – 'গল্প-সাহিত্যের এই উপকথা এবং রূপকথার সঙ্কলনে ন্যায়, নৈতিকতা, লোকায়ত দর্শনের অবতারণা এবং পশু-পাখির চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিশেষ কোনো মর্মবাণী তুলে ধরে এগুলোকে এক অসাধারণ বিশিষ্টতা প্রদান করেছে।'[৫]

Arthur Berridale Keith- এর মতে –

> উপকথার সঙ্গে আধুনিক গল্প বা সাহিত্যের লক্ষণীয় শুধু বিষয়বস্তুতে নয় বরং উপকথা নির্মিত হয় উপদেশ বা নীতি সমৃদ্ধ স্তবক দিয়ে যেখানে গল্প সাহিত্যে এগুলো অপ্রধান বিষয় (lesser constituent). চরিত্রগত এই কাঠিন্যের অনুপস্থিতি থেকে দুই ধরনের সৃষ্টিকর্মই উপকৃত হয় যা তাদেরকে উচ্চমানের উপাদান সম্বলিত হতে এবং বিস্তৃতভাবে বিকাশের সুযোগ করে দেয়। নারায়ণ-প্রণীত হিতোপদেশ থেকে আমরা দেখতে পাই কীভাবে পশু-পাখির উপকথা এবং বিভিন্ন রসে পূর্ণ মানব চরিত্রের কাহিনির মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে বৈচিত্রতা আনয়ন করেছে।[৬]

ত্রয়োদশ শতকে রাজা ধবলচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিত নারায়ণ *হিতোপদেশে পঞ্চতন্ত্র*-এর প্রশংসা করে বলেছেন – 'পঞ্চ তন্ত্রাত্তথান্যস্মাদাকৃষ্য লিখ্যতে।'[৭] অর্থাৎ, *পঞ্চতন্ত্র* থেকে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে *হিতোপদেশ* গ্রন্থখানি রচিত।

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

> গুণাঢ্যের *বৃহৎকথার* ন্যায় মূল *পঞ্চতন্ত্র* লুপ্ত হলেও অতি প্রাচীনকালেই তার যেসব রূপান্তর ঘটেছিল, তৎসম্পর্কে আমরা বিশদভাবে জানতে পেরেছি। এ গ্রন্থের বিশ্লেষণে তিনি আরও বলেছেন – *পঞ্চতন্ত্র*-এর শ্লোকগুলি প্রাচীন কালেই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং *মহাভারত, স্মৃতি, পুরাণ* প্রভৃতি গ্রন্থে এজাতীয় বহু শ্লোক উদ্ধৃত। *পঞ্চতন্ত্র*-এর ভাষা সহজ-সরল অনাড়ম্বর, গল্পের অঙ্গসৌষ্ঠব সন্নদ্ধ এবং নীতি-আদেশের ভাবনা শিল্পসম্মতভাবে বিন্যস্ত। গল্পগুলিতে শুধুমাত্র ন্যায়-নীতি, ত্যাগ, সততা প্রভৃতি ধর্মের আদর্শ প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; পশু-পাখির রূপকে মানুষের মহত্ত্ব, ভণ্ডামি, শঠতা, হৃদয়হীনতা প্রভৃতি গুণাগুণ পরোক্ষভাবে ব্যক্ত। এখানে গল্পকারের আদর্শ একদিকে যেমন নীতির স্মারক, অপরদিকে নীতিবাগীশের ছুঁৎমার্গ নেই, একদিকে ধার্মিকের ধর্মীয় আদর্শে পরিপূর্ণ তেমনি নীতিহীনের ধর্মভ্রষ্টতাও রয়েছে। গল্প কখনও গল্পমাত্র, কখনও বা প্রত্যক্ষ ন্যায়নীতি বা আদর্শ প্রচারের বাহন, কখনও সাহিত্যগুণ ও নীতিকথার সুচারু সমন্বয়।[৮]

করুণাসিন্ধু দাস বলেছেন –

> সংস্কৃত ভাষায় লিখিত *পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, শুকসপ্ততি* ইত্যাদি প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থে পশুপাখিকে গল্পের চরিত্র হিসাবে নিয়ে মানুষের সমাজ, চালচলন, শিক্ষা, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে মতামত ও সম্মতি-অসম্মতি প্রকাশের পথ ধরে লোকশিক্ষার যে-ধারা প্রচলিত ছিল, মধ্যযুগের বাংলার কবিকুল সে-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। প্রতিদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ বোধকে তা পুষ্ট করে থাকবে। মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ এক সঙ্গে এক পরিবেশে থাকার বিষয়টি তাঁরা মানতেন। মানুষের কথা প্রসঙ্গে উপমান হিসেবে পশুপাখি-সরীসৃপ যেমন সাহিত্যে এসেছে, তেমনি শ্বাপদ সরীসৃপের ভয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেবদেবীর অতিপ্রাকৃত উপস্থিতির কল্পনা উৎসাহিত হয়েছে।[৯]

দুলাল ভৌমিক *পঞ্চতন্ত্র* গ্রন্থে বলেছেন –

> *পঞ্চতন্ত্র* সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ। রচয়িতা বিষ্ণুশর্মা। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক কিংবা কিছু পরবর্তীকালে রচিত বলে অনুমিত। এর অনুকরণে পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ রচিত হয়, যেমন – *কথাসরিৎসাগর, হিতোপদেশ, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, বেতালপঞ্চবিংশতি, বৃহৎকথা, দশকুমারচরিত* ইত্যাদি।[১০]

গৌরী ধর্মপাল বলেছেন – 'আশ্চর্য লেখক। আশ্চর্য বই। বই নয়, যেন একখানি দর্পণ। হাতে ধরিয়ে দিয়ে সকৌতুকে বলেছেন, দেখো দেখো, মানুষ দেখো, সমাজ দেখো, দুনিয়ার হালচাল দেখো।[১১]

জার্মান আনুবাদক Wolff- এর মতে – প্রভাবের ব্যাপকতায় বাইবেলের পরেই *পঞ্চতন্ত্র*-এর স্থান।[১২]

বিপ্রদাশ বড়ুয়া *পঞ্চতন্ত্র গল্পসংগ্রহ পুনর্কথন* গ্রন্থে বলেছেন – *পঞ্চতন্ত্র* ও জাতকের সঙ্গে বহু মিল থাকার পরও *পঞ্চতন্ত্র* আজও তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকহিতকর

গল্প হিসেবে সমাদৃত। এর নীতিকথা, রহস্যময়তা ও হেঁয়ালি শতশত বছর ধরে মানুষ মুগ্ধ হয়ে শুনে আসছে, শোনার সেই আকর্ষণ ও প্রয়োজন আজও তার ফুরোয়নি।[১৩]

এমনিভাবে বিদগ্ধ মনীষীরা *পঞ্চতন্ত্র*-এর প্রশংসা করে নানা মন্তব্য করেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় *পঞ্চতন্ত্র*-এর সংস্করণ

গল্পসাহিত্য হিসেবে পৃথিবীর মানুষের কাছে *পঞ্চতন্ত্র*-এর গুরুত্ব ও পরিধি কত যে ব্যাপক তা নানা দেশের নানা সংস্করণ ও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা যায়। বিষ্ণুশর্মার রচিত মূল *পঞ্চতন্ত্র* লুপ্ত। তবে বর্তমানে এর কয়েকটি রূপ রয়েছে। এই রূপগুলোকে চারটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়েছে –

১) কাশ্মীরী তন্ত্রাখ্যায়িকা: ক) পূর্ণভদ্রকৃত জৈন সংস্করণ, খ) ক্ষুদ্রাকার জৈন সংস্করণ। আনুমানিক ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রচিত কাশ্মীরী তন্ত্রাখ্যায়িকা।

২) উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সংস্করণ (লুপ্ত): ক) গুণাঢ্যকৃত *বৃহৎকথা*, (লুপ্ত) খ) বুদ্ধস্বামীকৃত *শ্লোকসংগ্রহ*, গ) ক্ষেমেন্দ্রকৃত *বৃহৎকথামঞ্জরী*, ঘ) সোমদেবকৃত *কথাসরিৎসাগর*।

৩) দক্ষিণভারতীয় সংস্করণ (লুপ্ত): ক) নেপালী সংস্করণ, খ) হিতোপদেশ (বঙ্গীয় সংস্করণ)

৪) পহ্লবী সংস্করণ (লুপ্ত)। *পঞ্চতন্ত্র*-এর গল্পগুলি পারস্যের পহ্লবী ভাষায় অনুদিত হয়েছিল বহু শতাব্দী পূর্বে। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে এ অনুবাদ কার্য সম্পন্ন হয়।

এই রূপগুলি থেকে *পঞ্চতন্ত্র*-এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়, কেননা কোনো লুপ্ত জিনিস পুনরুজ্জীবিত হতে পারে তার আদর্শিক কারণে অর্থাৎ লেখক, গবেষক ও পাঠকহৃদয় আকর্ষণের কারণে।

পরবর্তীতে *পঞ্চতন্ত্র*-এর বিভিন্ন সংস্করণের প্রথমেই মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির কথা বলা হয়েছে। উক্ত ব্যাপার যদি সত্য হয়, তাহলে *পঞ্চতন্ত্রকে* দক্ষিণ ভারতের রচনা বলা যায়। তবে দক্ষিণী *পঞ্চতন্ত্রও* লুপ্ত ; কিন্তু সেটি অবলম্বন করে রচিত তিনটি সংস্করণ পাওয়া যায়–

১. দক্ষিণী *পঞ্চতন্ত্র*

২. নেপালী *পঞ্চতন্ত্র* ও

৩. বঙ্গীয় *হিতোপদেশ*

সবচেয়ে আশার কথা হলো দক্ষিণী *পঞ্চতন্ত্র* সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। বিখ্যাত লেখক এবং জৈনধর্মের প্রবক্তা মুনি মেঘবিজয় এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৬৫০-৬০ খ্রিস্টাব্দ। তিনি মূল গল্পের সাথে আরও কিছু নতুন গল্প সংযোজন করেন। এভাবে দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারত, উত্তর ভারতসহ পার্শ্ববর্তী দেশ-বিদেশে *পঞ্চতন্ত্র*-এর সংস্করণ হতে থাকে।

পাশ্চাত্য মনীষী হার্টেলের মতে মূল *পঞ্চতন্ত্র* এবং তার অনুকরণে রচিত *তন্ত্রাখ্যায়িকা* উভয়ই কাশ্মীরী কবির দ্বারা প্রণীত। উত্তর-পশ্চিমী সংস্করণটিও লুপ্ত, তবে উক্ত সংস্করণ অবলম্বনে বিখ্যাত চার খানা গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়েছে –

ক) গুণাঢ্যের *বৃহৎকথা* (খ্রি. ১ম শতক)

খ) বুদ্ধস্বামীর *শ্লোকসংগ্রহ* (খ্রি. ৮ম-৯ম শতক)

গ) ক্ষেমেন্দ্রের *বৃহৎকথামঞ্জরী* (খ্রি. ১১ শ শতক) এবং

ঘ) সোমদেবের *কথাসরিৎসাগর* (খ্রি. ১২ শ শতক)

নেপালী *পঞ্চতন্ত্র*-এর ১৪৮৪ সালে একখানা পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর নামকরণ করা হয়েছে *তন্ত্রাখ্যায়িকা*। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এ যাবৎ প্রাপ্য সংস্করণগুলির মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা মূল অনুসারে গ্রন্থিত। এটির সময়কাল খ্রিস্টীয় ৩য় – ৪র্থ শতক বলে অনুমান করা হয়।

বিশ্বসাহিত্যেও *পঞ্চতন্ত্র*-এর স্থান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মনীষীদের গবেষণায় *বাইবেলের* পর পৃথিবীতে এত বেশি জনপ্রিয় ও প্রচারিত গ্রন্থ দ্বিতীয়টি নেই। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাশ্মীরী *পঞ্চতন্ত্র* অর্থাৎ *তন্ত্রাখ্যায়িকা* থেকে ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন ফারসি বর্তমান পহ্লবি ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। উক্ত ফারসি অনুবাদ লুপ্ত হলেও তদবলম্বনে রচিত আরবি ও সিরীয় সংস্করণ থেকে পহ্লবি সংস্করণ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। এই সিরীয় ও আরবি সংস্করণ থেকে ইয়ুরোপীয় গল্পসাহিত্যে *পঞ্চতন্ত্র*-এর প্রভাব সরাসরি লক্ষ করা যায়। জার্মানী লেখক হার্টেলের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, এই *পঞ্চতন্ত্র*-এর ভারতের চার প্রান্তে এবং বহির্ভারতে জাভা থেকে আইসল্যান্ড পর্যন্ত পঞ্চাশটির অধিক ভাষায় দুইশতেরও অধিক সংস্করণে সম্পাদিত হয়। প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, ব্রজভাষা, পাঞ্জাবি, তেলেগু, তামিল, ওড়িয়া, বাংলা ইত্যাদি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত-পুনঃকথিত হয়ে শিশু-কিশোর-বয়ঃপ্রাপ্ত সকলের উপযোগী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলছে সুদীর্ঘকাল ধরে। মজার বিষয় হলো *পঞ্চতন্ত্র*-এর সংস্করণগুলোর মধ্যে তিনচতুর্থাংশই অভারতীয় ভাষায় নিবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন –

> ৫৩১-৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে পারস্য সম্রাট খশ্রু অনুশীরবান্–এর তত্ত্বাবধানে বার্জো নামক জনৈক আরবি হাকিম ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে *পঞ্চতন্ত্র*-এর পহ্লবি অনুবাদ করেন এবং নাম রাখেন *করটক-দমনক*। তারপর বুদ নামে জনৈক ফারসি খ্রীস্টান উক্ত পহ্লবি অনুবাদ থেকে প্রাচীন সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে এবং নামকরণ করেন *কলিলগ্ উঅ দম্নগ্*। আলোচ্য অনুবাদের সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় না। সিরীয় সংস্করণ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল্লা ইবনে-আল-মোকাফফা কর্তৃক *কলিল্হ্ উঅ দিম্নহ্* নামে আরবিতে অনূদিত হয়। আর এটি প্রস্তুত করা হয় খলিফা আবুল মনসুরের জন্য। সেখান থেকে স্পেনের শাসক আবদুর রহমানের হাত ধরে সেটি পৌঁছে যায় ইয়ুরোপে। তারপর ইয়ুরোপের সিরীয়, গ্রিক, হিব্রু, স্পেনীয়, ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসি, ইতালীয়, পর্তুগিজ সহ বিখ্যাত বহু ভাষায় *পঞ্চতন্ত্র*-এর অনুবাদ হতে থাকে। ১০ম-১১শ শতকে সিরীয় ভাষায়, ১০৮০ খ্রিস্টাব্দে গ্রিক ভাষায়, ১১শ শতকে Rabbi joel কর্তৃক আরবি

থেকে হিব্রুতে, ১২৫১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনীয় ভাষায়, ১২৬৩-৭৮ খ্রিস্টাব্দে *Directorium vitoe humanoe* নামে ল্যাটিনে এবং ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিনে ২য় সংস্করণ হয়, ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে Anthonious von pforr কর্তৃক জার্মান ভাষায় – *Das buch der byspel der alten wysen* অর্থাৎ *The book of gospel of old sages*। এই জার্মান ভাষার গ্রন্থ থেকে অনূদিত হয় ওলন্দাজ, দিনেমার ও আইসল্যান্ডিক ভাষায়। ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে A. F. Doni কর্তৃক দুখণ্ডে ল্যাটিন অনুবাদ এবং উক্ত ল্যাটিন অনুবাদ থেকে Thomas North রাণী এলিজাবেথের কালে প্রথম খণ্ডের ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং নাম দেন *The moral philosophy of Doni*। ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে Jiulio Nuti গ্রিক থেকে ইটালীতে অনুবাদ করেন। তারপর ডাচ, হাঙ্গেরীয়, মালয়ি প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হয়।[১৪]

আধুনিক কালে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে মুজতাবা মিনাভি তেহরান কর্তৃক *কালিলা ও দিমনা* নামে ফারসি ভাষায় তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *পঞ্চতন্ত্র*-এর সংশোধন ও ব্যাখ্যা হয়। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে লেবাননের বৈরুত থেকে *কালিলা ওয়া দিমনা* নামে আরবি ভাষায় দারু

ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এমনিভাবে আরও বৈদেশিক ভাষায় অনূদিত *পঞ্চতন্ত্র*-এর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো –

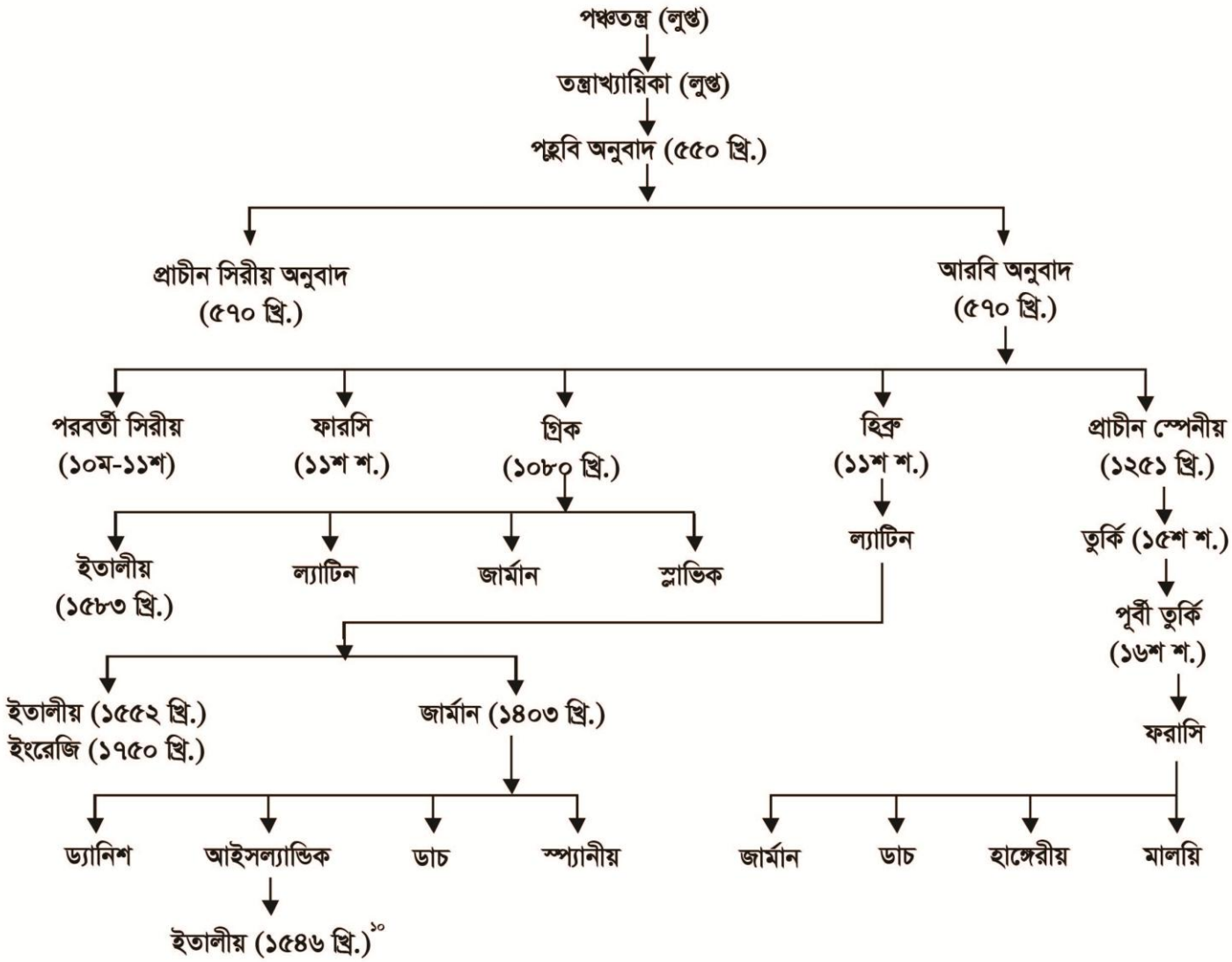

এই সমস্ত সংস্করণ ও বৈদেশিক ভাষায় অনুবাদের ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারি সেই খ্রিস্টপূর্ব যুগে *পঞ্চতন্ত্র* রচিত হয়ে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালেও পৃথিবীব্যাপী পাঠক সমাজে তার কতটা সমাদর রয়েছে।

সবকিছুতে সমদর্শন

সব কিছুতে সমদর্শনের দিক থেকে *পঞ্চতন্ত্র*-এর গুরুত্ব রয়েছে। *পঞ্চতন্ত্র*-এর পাতায়পাতায় সমদর্শনের বিপুল দৃষ্টান্ত ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে – 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ – সব কিছুই ব্রহ্ম। সে হিসেবে সর্বভূতাত্মা জগতে জীবজন্তু কোন কিছুই ফেলনা নয়। তার প্রমাণ হিন্দুদের দশ অবতারের তালিকাতেও রয়েছে। যেমন – মৎস্য, কূর্ম, বরাহ – এ তিন অবতারের পরে রয়েছে নৃসিংহ। এমনিভাবে *পঞ্চতন্ত্রে* মানুষ, পশু-পাখি, জীবজন্তুকে চরিত্র হিসেবে যুক্ত করায় সবকিছুতে সমদর্শন ঘটেছে। মিত্রভেদের প্রথমে দমনক নামে এক শেয়ালের অতি চাতুর্যে নিজস্ব স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তার ভোগ্য সঞ্জীবক নামে এক ষাঁড়কে পিঙ্গলক নামে এক হিংস্র সিংহের সাথে বন্ধুত্ব করিয়ে দিয়ে পরে আবার মিত্রতা ভেঙ্গে পিঙ্গলকে দিয়ে তাকে হত্যা করায়। এভাবে বিপরীত প্রকৃতির দুই প্রাণীর প্রথমে বন্ধুত্ব সমদর্শনের প্রতীক। এমনকি এখানে প্রকৃতির নানা অচেতন বস্তুকেও সুখ-দুঃখের সমান ভাগিদার করে তাদের দিয়ে বিষ্ণুশর্মা কথা বলিয়েছেন। যেমন – 'সমুদ্র ও টিট্টিভ' গল্পে সমুদ্রকে দিয়ে কথা বলিয়েছেন। টিট্টিভী যখন সমুদ্রের তীরে ডিম পাড়বে না বলে মনস্থির করল, কেননা পূর্ণিমার জোয়ারে ডিমগুলো ভেসে যেতে পারে, তখন টিট্টিভ হেসে বলল, 'সমুদ্রের এত স্পর্ধা যে, আমার বাচ্চাদের ক্ষতি করবে? তুমি এখানে নিশ্চিন্তে ডিম পাড়ো দিকি!' শুনে সমুদ্র ভাবল, বাব্বা পাখি পোকাটার আস্পর্দা দেখো। সাধে কি আর বলেছে –

স্বচিত্তকল্পিতো গর্বঃ কস্য নাম ন বিদ্যতে।
উৎক্ষিপ্য টিট্টিভঃ পাদাবাস্তে ভঙ্গভয়াদ্দিবঃ॥ (১/৩১৭)

অর্থাৎ – নিজের মনগড়া দেমাক কার আর না থাকে? টিট্টিভ ঠ্যাং দুটো উঁচু করে থাকে পাছে আকাশ ভেঙ্গে পড়ে, ভেঙ্গে পড়লে পা দিয়ে ঠেকাবে।

সমুদ্র আবার বলল – 'তন্ন্যায়াস্য প্রমাণং কুতূহলাদপি দ্রষ্টব্যম্। কিমণ্ডাপহারে কৃতে মমৈষ বিধাস্যতি। ইতি চিন্তয়িত্বা স্থিতঃ।'[১৬]

অর্থাৎ – যা হোক না কেন, অন্তত কৌতূহলের বশেও দেখতে হচ্ছে এর দৌড়টা, যদি ডিম চুরি করি তাহলে ও আমায় কেমন করে দেখে নেয়। এই ভেবে সমুদ্র সুযোগের অপেক্ষায় রইল।

এভাবে লেখক প্রকৃতি ও জীব-জন্তুকে ভেদাভেদ না করে মানুষের মতো কথা বলিয়ে একই মোহনায় মিলিত করেছেন।

লেখক বিষ্ণুশর্মা রাজকুমারদের মন ভুলাতে এভাবে চেতন-অচেতনেরও ভেদ করেননি। প্রকৃতি-জীব-জন্তুকে মানুষের মতো দেখেছেন। এখানে মানুষের পাশাপাশি তারা সমমর্যাদায় অবস্থান করে নিয়েছে। লব্ধপ্রণাশ নামক তন্ত্রে 'পুনর্মূষিকা' গল্পে বাজের উক্তিতে সমদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় –

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
সুহৃন্মিত্রে হ্যুদাসীনো মধ্যস্থো দ্বেষ্যবন্ধুষু॥
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।
সাধূনাং নিরবদ্যানাং সদাচারবিচারিণাম্॥ ৪/৫৯-৬০

অর্থাৎ, যাঁরা সদাচারে বিচরণ করেন, এমন নিষ্কলঙ্ক সাধুদের মধ্যেও তাঁরাই বিশিষ্ট, যাঁরা সাধু ও পাপীতে সমসত্ত্ব, শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমান, ঢেলা, পাথর এবং সোনাকে সমান দেখেন, সহৃদয় বন্ধুদের প্রতি উদাসীন এবং দ্বেষের পাত্র ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি নিস্পক্ষপাত।

মিত্রভেদে 'কাকী কেউটে সোনার হার' গল্পে (১/৬) কাক ও কাকীর শত্রু কেউটেকে পরাজিত করতে শেয়ালের বুদ্ধির আশ্রয় নিল। কাকী রাজকন্যার সোনার হার চুরি করে কেউটের গর্তে ফেলে দেয়। আর রাজার প্রহরীরা তা উদ্ধার করতে গিয়ে কেউটেকে শেষ করে দেয়। শেয়ালের বন্ধুত্ব লাভ করে কাক ও কাকী শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নিয়ে বিপদমুক্ত হয়ে শান্তিতে বসবাস করে। এভাবে মানুষ-পশু-পাখির গল্প সমন্বয়ের বিরাট দৃষ্টান্ত। অপরদিকে 'অপরীক্ষিতকারক' নামক তন্ত্রে 'ব্রাহ্মণী ও বেঁজি' গল্পে (৫/১)

সমদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। এক অধিষ্ঠানে দেবশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ থাকতেন। তার স্ত্রী এক পুত্র প্রসব করেন। একই দিনে পোষা বেঁজিটিও একটি বাচ্চা প্রসব করে। কিন্তু প্রসবের পরপরই বেঁজিটি মারা যায়। পুত্রবৎসলা ব্রাহ্মণী বেঁজিটিকে স্তন্য দিয়ে, তেল মালিশ করে, খাইয়ে-দাইয়ে ছেলের মতোই মানুষ করতে লাগলেন। কিন্তু তাকে বিশ্বাস করতেন না। কেননা, বলা তো যায় না, জাত-স্বভাবের দোষে তাঁর পুত্রের কোনো অনিষ্ট করে বসে কিনা? মনে মনে এই রকম ভাবতেন। একদিন ব্রাহ্মণী যাবেন নদীর ঘাটে জল আনতে। ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন, 'ছেলেটাকে দেখ, যেন বেঁজিটা কিছু না করে।' এই বলে তিনি নদীর ঘাটে চলে গেলেন। এমন সময় জমিদার বাড়ি থেকে ডাক এল। জমিদার গিন্নির ব্রতানুষ্ঠান। পৌরোহিত্য করতে হবে। লোভনীয় দক্ষিণা আছে। দেরি করলে অন্যের হাতে চলে যাবে। ব্রাহ্মণ ভাবলেন, ব্রাহ্মণীর এতো দেরি হচ্ছে কেন? অন্যদিন তো হয় না। আজ কি হলো? সময়মতো না গেলে সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ কেবলি ছটফট করছেন। তারপর ছেলেটাকে বেঁজির পাহারায় রেখে তিনি চলে গেলেন জমিদার বাড়ি। ঠিক সেই সময়ে দৈববশে এক কেউটে বেরোল গর্ত থেকে। বেঁজি তখন তাকে জাত-শত্রু বলে বুঝতে পেরে ভাইকে বাঁচাতে সাপটার সঙ্গে যুদ্ধ করে সাপটাকে টুকরো-টুকরো করে ফেলল। তারপর রক্তে মাখামাখি মুখ নিয়ে মার সামনে চলল বাহাদুরি দেখাতে। মা তো তার রক্তমাখা মুখ দেখেই ভয় পেয়ে ভাবল 'নিশ্চই শয়তানটা আমার ছেলেকে খেয়েছে' অমনি রাগের মাথায় জলের কলসীটা আছড়ে ফেললেন তার মাথায়। এইভাবে বেঁজিকে মেরে বিলাপ করতে-করতে ঘরে এসে দেখেন, ছেলে দিব্যি ঘুমিয়ে আছে, কাছেই টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে সাপটি। দেখে ব্রাহ্মণী পুত্র (বেঁজি) হত্যার শোকে বুক-মাথা চাপড়াতে লাগলেন। এমনিভাবে *পঞ্চতন্ত্রে* প্রকৃতি-মানুষ-পশু-জীব-জন্তু একাকার হয়ে গেছে।

মনস্তাত্ত্বিক বিষয়

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে *পঞ্চতন্ত্র*-এর গুরুত্ব রয়েছে। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-মানবতা, আদর্শ-জীবন, প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় কিশোর মনকে আকৃষ্ট করা খুবই কঠিন। দাক্ষিণাত্যের সর্বগুণে গুণান্বিত রাজার মনে সুখ নেই, কেননা তাঁর পুত্ররা ছিল বুদ্ধিহীন। তিনি একদিন মন্ত্রীদের ডেকে বললেন – 'কী হবে সে ছেলে দিয়ে যদি তার বিদ্যা-বুদ্ধি-ভক্তি না থাকে।'[১৭] তখন মন্ত্রীদের মধ্যে সুমতি নামে একজন মন্ত্রী বললেন – 'এ রাজ্যে বিষ্ণুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন। তিনি সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। তাঁর সাহচর্যে থাকলে নিশ্চয়ই তিনি রাজপুত্রদের অল্পদিনের মধ্যে সর্বশাস্ত্রে শিক্ষিত করে দিতে পারবেন।'[১৮] রাজার অনুরোধে এগিয়ে এলেন খ্যাতনামা পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা। নির্বোধ পুত্রদের শিক্ষিত করার বিনিময়ে রাজা তাঁকে একশত গ্রাম দানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিষ্ণুশর্মা বললেন – 'একশত গ্রামের বিনিময়ে আমি বিদ্যা বিক্রয় করি না। তবে যদি ছয় মাসের মধ্যে এদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারি তাহলে নিজের নামই ত্যাগ করব।'[১৯] তখন আশি বছরের পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা মনের জোরে কচি-কাঁচা-দুষ্ট রাজকুমাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে বশে আনার জন্য প্রকৃতি-পশু-পাখি-মানুষের সমন্বয়ে গল্প তৈরি করলেন। শিক্ষক বিষ্ণুশর্মা গল্পের মাধ্যমে শেখাতে লাগলেন, রাজকুমারেরা গভীর মনযোগের সাথে শিখতে লাগল। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিশেষত গল্পের মাধ্যমে পরিবেশন করলেই শিক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই মনস্তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে 'মিত্রভেদ' নামক তন্ত্রে বিষ্ণুশর্মা বলেছেন –

উদীরিতেঽর্থঃ পশুনাপি গৃহ্যতে হয়াশ্চ নাগাশ্চ বহন্তি চোদিতাঃ।
অনুক্তমপ্যূহতি পণ্ডিতো জনঃ পরেঙ্গিতজ্ঞানফলা হি বুদ্ধয়ঃ ॥১/৪৩
আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষণেন চ।
নেত্রবক্ত্রবিকারৈশ্চ লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ ॥ ১/৪৩-৪৪

অর্থাৎ, উচ্চারণ করে বললে সেকথা তো পশুতেও বুঝতে পারে। চল্ বললে হাতিঘোড়াও ভার বয়ে নিয়ে চলে। না বলা কথা যে আন্দাজ করতে পারে, সেই হলো পণ্ডিত। অন্যের আকার ইঙ্গিত দেখে মতলব বোঝা- এইখানেই তো বুদ্ধির সার্থকতা। মুখের ভাব,

ইসারা, চলন-বলন, নড়া-চড়া, মুখচোখের ভাববদল-এসব দেখে ভেতরের মনটাকে আঁচ করা যায়।

পরবর্তীতে 'মিত্রপ্রাপ্তি' নামক তন্ত্রে পঞ্চতন্ত্রকার বলেছেন –

সিদ্ধং বা যদি বাসিদ্ধং চিত্তোৎসাহো নিবেদয়েৎ।
প্রথমং সর্বজন্তুনাং তৎ প্রাজ্ঞো বেত্তি নেতরঃ॥ ২/১৯১

অর্থাৎ, মনই আগে বলে দেয় কাজটি হবে কি হবে না। মনস্তত্ত্ব এমন একটি বিষয় প্রাজ্ঞ আগে বুঝে নেন, বাকিরা বোঝে না ।

বিষ্ণুশর্মা মনস্তাত্ত্বিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন কীভাবে অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের শেখাতে হয়। তাই তিনি উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে গল্প রচনা করলেন এবং একটি দুঃসাধ্য কর্মে সফলও হলেন।

শিশু শিক্ষায় গুরুত্বারোপ

পঞ্চতন্ত্র-এর গল্পগুলো রচনার প্রেক্ষাপট মূলত শিশুশিক্ষা। তাই শিশুশিক্ষায় *পঞ্চতন্ত্র*-এর গুরুত্ব রয়েছে। শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্যে গল্পকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করে রচনা করা হয়েছে এই সুবিশাল গল্পগ্রন্থ। রাজা অমরশক্তি কোমলমতি রাজকুমারদের শিক্ষাদান অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞানী করে তোলার জন্য সুমতি নামে একজন মন্ত্রীর অনুরোধে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মাকে নিযুক্ত করলেন। গল্পের চরিত্ররূপে পশু ও পাখিদের নির্বাচিত করে শিশুশিক্ষার পুরোধা ব্যক্তিত্ব বিষ্ণুশর্মা রাজকুমারগণকে জীবন ও প্রকৃতির বৃহত্তম পরিবেশের সাথে পরিচিত করার চেষ্টা করলেন। তিনি দীর্ঘ আশি বছরের বিদ্যা উজাড় করে লিখলেন পাঁচটি বড় গল্প। রাজকুমারদের সুকুমারচিত্তে অর্থ ও নীতিশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বসমূহ যাতে অতি সহজে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার জন্য গল্পকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করলেন। গল্পের আখ্যানভাগকে শিশুদের বোধগম্য করবার জন্য সহজ ও অনাড়ম্বর ভাষার ব্যবহার করলেন এবং সমগ্র গল্পটি পড়ে শিশুরা যাতে তার নীতিকথাটি সহজে মনে রাখতে পারে সেজন্য গল্পে বহু নীতিশ্লোক সন্নিবেশিত করলেন।

বিষ্ণুশর্মা রাজকুমারগণকে গল্প বলে-বলে বোঝাতে লাগলেন দেশ, মানুষ, লোকাচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পশু-পাখি ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার কী হওয়া উচিত এবং কী অনুচিত। তাঁর ছাত্ররাও মজে গেল, পড়াশুনায় ডুবে গেল। খেলা, দুষ্টুমি, আড্ডা ভুলে গেল। বিষ্ণুশর্মা যেমনটি চেয়েছিলেন তিন রাজকুমার ছয় মাসের মধ্যে তেমনটি হয়ে উঠল। সব শাস্ত্র তাদের আয়ত্তে এসে গেল। তারপর কথামতো ঠিক সময়ে তাদের নিয়ে রাজদরবারে গিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন। রাজা অমরশক্তি নম্র, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, বিদ্যায় পারদর্শী কুমারদের দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি দেখেই বুঝতে পারলেন কুমারেরা আর আগের কুমার নেই, তিনি তাদের বুকে টেনে নিলেন। সেই থেকে বিদ্যার সারগ্রন্থ হিসেবে *পঞ্চতন্ত্র* পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে আছে। রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য রচিত প্রাচীন গ্রন্থ হলেও শিশুশিক্ষায় বর্তমান যুগে *পঞ্চতন্ত্র*-এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাইতো শিশুদের শিক্ষার জন্য বিষ্ণুশর্মা বলেছেন –

অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ॥(কথা ১/৬)

অর্থাৎ, শব্দশাস্ত্র অকূল অপার, আয়ু যতটুকু তা আবার বাঁধায় ভরা। তাই অসার বস্তু ত্যাগ করে আসল বস্তু গ্রহণ করা উচিত। যেমন রাজহাঁস জল দুধের মিশ্রণ থেকে দুধটুকু গ্রহণ করে।

এই শ্লোকের মাধ্যমে বিষ্ণুশর্মা বিদ্যা-শিক্ষার ব্যাপক পরিসরের কথা বিশেষভাবে ইঙ্গিত করেছেন। আমাদের সংক্ষিপ্ত জীবনে শিশুকাল থেকেই প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

হাস্যরস ও ব্যঙ্গ প্রকাশ

হাস্যরস ও ব্যঙ্গ প্রকাশে *পঞ্চতন্ত্র*-এর গুরুত্ব রয়েছে। জীবজন্তুর চরিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে মনুষ্য চরিত্র উদ্‌ঘাটন করার পরিকল্পনাই মূলত হাস্যরস তথা ব্যঙ্গ প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে বিষ্ণুশর্মা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছোট ছোট গল্পের মধ্যে কত হাসি, কত চমক, কত কৌতুক, মানুষ তো বটেই পশু-পাখি পর্যন্ত কৌতুকের পাত্র। যেমন – মিত্রভেদে 'বক ও কাঁকড়া' গল্পে (১/৭) এক প্রকাণ্ড সরোবরে মাছ আরো নানা প্রজাতির জলচর প্রাণীরা বসবাস করত। সেখানে বৃক্ষে বসবাস করত এক বক। এখানে বক ও কাঁকড়ার উভয়ের উক্তিতে হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। কাঁকড়া সাদরে বককে বলল,' কি মামা, আজ যে বড়ো খাওয়া-দাওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন নেই ; চোখের জলে বসে-বসে খালি নিঃশ্বাস ফেলছ ?' বক বলল – 'বৎস, ধরেছ ঠিক। ব্যাপরটা হচ্ছে, মৎস্য ভোজনে আমার পরম বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। এখন প্রায়োপবেশন করছি ; তাই মাছেরা কাছে এলেও খাই না।'[২০] সেই বকই এক-এক করে জলাশয়ের সমস্ত মাছ সাবাড় করে শেষে অতিলোভে কাঁকড়ার হাতে প্রাণ দেয়। চমৎকার হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায় লব্ধপ্রণাশ নামক তন্ত্রে 'বৃদ্ধবণিক ও চোর' গল্পে (৪/১০)। এক অধিষ্ঠানে বাস করত এক বণিক। তার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর কামনা-পরবশ হয়ে অনেক টাকা দিয়ে এক বণিকের মেয়েকে বিয়ে করে। মেয়েটি বড় কষ্টে থাকত, বুড়ো বণিকের মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারত না। হাস্যচ্ছলে পঞ্চতন্ত্রকার বলেছেন – 'মাথার চুলের জায়গাটি সাদা হলে ওটিই চরম পুরুষের পরাজয়। হাড়ের টুকরো ওপরেতে রাখা চাঁড়ালের কুয়ো হেন মেয়েরা এড়িয়ে তাকে দূরে চলে যায়।' একদিন মেয়েটি তার সঙ্গে একই শয্যায় মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে, এমন সময় ঘরে চোর ঢুকেছে। মেয়েটিতো চোরকে দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে বুড়োকেই জড়িয়ে ধরল। বুড়ো তো অশ্চর্য। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখে, চোর ঢুকে ঘরের এক কোণায় লুকিয়ে আছে। তখন বুড়ো ভাবল নিশ্চয় চোরের ভয়েই আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। এটি বুঝতে পেরে সে চোরকে বলল –

যা মমোদ্বিজতে নিত্যং সাদ্য মামবগূহতে।
প্রিয়কারক ভদ্রং তে যন্মমাস্তি হরস্ব তৎ॥ ৪/৭৬

অর্থাৎ, যে স্ত্রী দেখামাত্র দূরে সরে যায়, পেছন ফিরে ঘুমিয়ে থাকে আজ সেই বক্ষ জড়িয়ে ধরল। কারণ ঘরে চোর এসেছে। চোরকে গৃহকর্তা শুভেচ্ছা জানাল। কেননা চোরই স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার ভাগ্য নিয়ন্তা তথা প্রিয়কারক। তারপর চোর যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন বলল – 'ওহে চোর, তুমি রোজ রাত্রে এসো। আমার ধনসম্পত্তি সব তোমার।

প্রণয় আকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চোরকে পর্যন্ত চুরি করতে গৃহে আহ্বান করল তা সত্যিই হাস্যরসের উদ্রেক করে। একই তন্ত্রের পরবর্তীতে 'তাঁতি-বৌ ও শেয়ালনী' গল্পে (৪/১১) এমনি একটি কাহিনি যা কৌতুক রসে সিক্ত। এক স্থানে তাঁতি আর তাঁতি বৌ বাস করত। স্বামী বুড়ো হওয়ায় তাঁতি বৌটি সর্বদাই আনমনা, বাড়িতে কিছুতেই থাকত না। শুধু অন্য পুরুষের খোঁজে ঘুরে বেড়াত। একদিন পরের ধন হাতাতে ওস্তাদ এক জোচ্চোর তাকে লক্ষ্য করে নির্জনে ডেকে নিয়ে বলল, ওগো সুন্দরী আমি বিপত্নীক, তোমার রূপলাবণ্য দেখে পুষ্পশরাহত হয়েছি। আমাকে প্রেম-দক্ষিণা দাও। সে বলল ঠিক আছে, তাহলে শোনো। আমার স্বামীর অনেক টাকা সুতরাং টাকাগুলো নিয়ে আসি। তারপর তোমার সঙ্গে অন্যত্র গিয়ে ইচ্ছেমত প্রেমসুখ ভোগ করব। সেও বলল – আচ্ছা। তাঁতি বৌউয়ের মুখে হাসি আর ধরে না। বাড়ি ফিরে রাত্রে স্বামী ঘুমোলে সমস্ত টাকা নিয়ে খুবভোরে দৌড়ে গেল, সে যেখানে বলেছিল ঠিক সেখানে। জোচ্চোরও তাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা দিল। দুজনে চলছে। যেতে যেতে কিছু দূরে পড়ল এক নদী। তাই দেখে যোচ্চোর ভাবল, যৌবনপ্রান্তে উপস্থিত একে নিয়ে করব কী? তাছাড়া ওর পেছনে-পেছনে কেউ এসেও পড়তে পারে। তখন তো বিপদে পড়ব। সুতরাং খালি টাকাটা নিয়ে সরে পড়াই ভাল। তাই তাকে বলল, প্রিয়ে, এ নদী পাড়

হওয়া বড়ই কঠিন। এক কাজ করি টাকা ও অন্যান্য বোঝা ওপারে রেখে আসি। তারপর একলা তোমাকে পিঠে করে নিয়ে পার হতে পারব। সে বলল, প্রিয়, তাই কর। এই বলে সমস্ত কিছুই দিয়ে দিল। তখন সে বলল তোমার পরনের আর গায়ের কাপড়টাও দাও। তাহলে নির্ভাবনায় জলের মধ্যে যেতে পারবে। তখন জোচ্চোর টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় সবকিছু নিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে চম্পট দিল। তাঁতি-বৌ গালে দুহাত দিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে। প্রিয় তো ফিরে আসছে না। অপেক্ষার পালা শেষ। সেই মুহূর্তে দেখে এক শেয়ালনী মুখে এক টুকরো মাংস নিয়ে সেখানে এসেছে। এমন সময় নদীর ধারে এক প্রকাণ্ড মাছ – জল থেকে বাইরে বেড়িয়ে এসেছে। মাছটা দেখে শেয়ালনী মাংশের টুকরো ফেলে দিয়ে দৌড়ে গেল মাছটা ধরতে। এমন সময় আকাশ থেকে এক শকুন নেমে মাংশের টুকরোটা নিয়ে আবার আকাশে উড়ে গেল। মাছটা শেয়ালনীকে দেখে নদীতে নেমে গেল। শেয়ালনীর সব পরিশ্রম পণ্ড – শকুনটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মুচকি-মুচকি হাসতে-হাসতে দিগম্বরী তাকে বলল -

গৃধ্রেণাপহৃতং মাংসং মৎস্যোঽপি সলিলং গতঃ।
মৎস্যমাংসপরিভ্রষ্টে কিং নিরীক্ষসি জম্বুকে ॥৪/৯০

অর্থাৎ, শকুন মাংস নিল, জলের মাছ জলে গেল। ও-শেয়ালের ঝি মাছ-মাংস দুই হারিয়ে তাকিয়ে কী দেখিস?

তাই শুনে, সেও স্বামী, টাকা ও প্রেমিক সব খুইয়ে বসে আছে দেখে শেয়ালনী ঠাট্টা করে বলল –

যাদৃশং মম পাণ্ডিত্যং তাদৃশং দ্বিগুণং তব।
নাভূজ্জারো ন ভর্তা চ কিং নিরীক্ষসি নগ্নিকে ॥৪/৯১

অর্থাৎ, তোর চেয়ে মোর দুনো বুদ্ধি ওলো দিগম্বরী, প্রেম হলোনা স্বামীও গেল, তাকিয়ে কী দেখিস্?

এ সমস্ত কাহিনি সত্যিই হাস্যরসে পরিপূর্ণ। গল্পের পাত্র-পাত্রী প্রধানত পশু ও পাখি, কিন্তু তাতে কী হবে? তাদের শিং দাঁত নখ থাবা পালক বাসা আকৃতি-প্রকৃতি হাস্যরস প্রকাশ করেছে গল্পকারের নানা কৌশলে। মানুষের এক-একটি প্রবৃত্তি প্রাণিশরীর

পেয়েছে তাঁর হাতে, যেন তত্ত্বকে একটু আড়ালে রেখে ছেলে-মেয়েদের এবং বড়োদেরও হাস্যরসের খোরাক যুগিয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের নামকরণেও হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, উকুনের নাম মন্দবিসর্পিণী – যে গুটি গুটি চলে (১/৯); শেয়ালের নাম চণ্ডরব – যার গলায় প্রচণ্ড আওয়াজ (১/১০) ; কচ্ছপের নাম কম্বুগ্রীব – শাঁখের মত গলা যার (১/১৩); ষাড়ের নাম তীক্ষ্ণবিষাণ – যার ছুঁচলো-শিং (২/৬) ; পেঁচার নাম অরিমর্দন – যে শত্রু বিনাশক (৩/কথামুখ) ; সিংহের নাম করালকেশর – যার কেশর ভয়ানক (৪/২) ; বৃদ্ধ বণিকের নাম কামাতুর – যিনি অতি বুড়ো বয়সে বিয়ে করেন (৪/১০)। এমনি রূপগত-বিশেষণগত বিশেষত্ব ধরে নাম, হাসির খোরাক যোগায়।

ব্যঙ্গ করেছেন *স্মৃতিশাস্ত্র* পরায়ণ ধর্মবেত্তাদের অহিংসার বারাবাড়ি নিয়ে। আমরা দেখতে পাই 'চড়ুই খরগোস ও বিড়াল' গল্পে। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র (বনবিড়াল) নামে ধর্মীয় চরিত্রটি নীতি ও ধর্মের দোহাই দিয়ে, ধর্মীয় বেশ ধারণ করে বলছেন –'অহো, অসার এ সংসার। প্রাণ এই আছে এই নেই। প্রিয়জনের সাথে মিলন যেন স্বপ্ন। এইসব আত্মীয়পরিজন যেন ইন্দ্রজাল। অতএব ধর্মছাড়া গতি নেই। শাস্ত্রে বলে অনিত্য এ কলেবর, ধন-সম্পদও চিরস্থায়ী নয়। মৃত্যু আছে ওঁৎ পেতে, পুণ্য তাই কর হে সঞ্চয়। পুণ্য হয় পরোপকারে আর পাপ হয় পরনিপীড়নে।'[২১] এই মুখোশধারী ধর্মীয় চরিত্রটি কপিঞ্জল (চড়ুই) ও শীঘ্রগ (খরগোশ) এর মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে দিবে বলে মিষ্টি কথায় তাদের নিকটে ডেকে মেরে খেয়ে ফেলল। এভাবে অতিবেশি ধর্মীয় চরিত্রটি কত খারাপ হতে পারে তা নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। যাজ্ঞিকদের হিংসার বাড়াবাড়ি নিয়েও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্র*-এর যুগে পশু বলি দিয়ে যজ্ঞ করা হতো। এই পশু বলিদান উদারভাবে দেখা হয়নি। ইহা মূর্খতার পরিচায়ক, অন্যায় কাজ। এ সম্পর্কে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রের উক্তিতে ব্যঙ্গাত্মক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় – 'যে সব যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞ করতে বসে পশু হত্যা করে, তারা তো মূর্খ, জানেনা বেদের সত্যিকার অর্থ। তাতে লেখা আছে অজ দিয়ে যজ্ঞ করবে। অজ মানে হলো সাত বছরের পুরোন ধান, একটি বিশেষ পশু নয়। এ প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকার বলেছেন – গাছ কেটে পশু মেরে রক্তে রঞ্জিত। স্বর্গ নাহি তাদের নরক নিশ্চত।[২২]

মৃত্যু ও শোক নিয়ে মিত্রভেদ তন্ত্রে 'চড়ুই, কাঠঠোকরা, মাছি, ব্যাঙ ও হাতি' গল্পে অতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বনের মাতাল হাতি চড়ুই দম্পতির বাসা ও ডিম ভেঙ্গে-চুরমার করে দিয়েছে, চড়ুইনী কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে গেল। ডিম ভেঙ্গে বাচ্চা নষ্ট হওয়ার শোকে বিলাপ করতে লাগল। বিলাপ শুনে বনের কাঠঠোকরা পাখি সান্ত্বনা সূচক বাক্যে ব্যঙ্গ করে বলছে – 'আত্মীয়রা যে শ্লেষ্মা-সমেত চোখের জলটি ফেলে, সেটি অসহায় প্রেতকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গলধঃকরণ করতে হয়, সুতরাং কাঁদতে নেই, সাধ্যমতো ক্রিয়াকর্ম করতে হয়।'[২৩] দেশের প্রতি মমত্ববোধের বিষয় সম্পর্কে ব্যঙ্গ করা হয়েছে 'হাতির দল ও খরগোসেরা' গল্পে। হাতির ভয়ে খরগোসেরা যখন তাদের বাসস্থনে অবস্থান করবে না, তখন একজন বলল – 'তত্রৈকঃ প্রোবাচ গম্যতাং দেশত্যাগেন। কিমন্যৎ। অর্থাৎ, দেশ ছেড়ে চলে যাই চলো। তা ছাড়া আর উপায় কী? মনু এবং ব্যাস বলেছেন –

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥
ক্ষেম্যাং সস্যপ্রদাং নিত্যং পশুবৃদ্ধিকরীমপি।
পরিত্যজেন্নৃপো ভূমিমাত্মার্থ্যমবিচারয়ন্॥ ৩/৮৩-৮৪

অর্থাৎ, ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করে বৃহত্তর পর্যায়ে ধাবিত হতে হবে। প্রয়োজনে বংশের জন্য একজনকে ছাড়তে হবে, গ্রামের জন্য বংশ ছাড়বে। দেশের জন্য গ্রাম ছাড়বে, অনুরূপভাবে নিজের জন্য জগৎ ছাড়তে হলে ছাড়বে। এছাড়া আরামদায়ক, ফসল ফলে, পশুও বেশ বাড়ে নিজের জন্যে ছাড়তে হয় তো ছাড়বে বিনা দ্বিধায় এমন রাজা এমন দেশ।

চোরের মুখে ধর্মের কাহিনি কত উপভোগ্য হতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'সন্ন্যাসী, ধূর্ত, শেয়াল ও দুই দুষ্টা' গল্পে আষাঢ়ভূতির চরিত্রে। শিষ্য সেজে দুষ্ট আষাঢ়ভূতি পরিব্রাজক দেবশর্মার তিল-তিল করে জমানো বহু কষ্টের সঞ্চিত অর্থ চুরি করার জন্য অত্যন্ত সুকৌশলে নানা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কথা বলে নানা ছলনা করে, যা ভণ্ড লোকের মুখ থেকে বিবৃত হওয়ায় হাস্যরস ও ব্যঙ্গাত্মক ভাবের প্রকাশ করে। প্রথমেই আষাঢ়ভূতি

দেবশর্মার কাছে গিয়ে 'ওঁ নমঃ শিবায়' বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। তারপর সবিনয়ে বললে –

> ঠাকুর অসার এ সংসার, যৌবন যেন পাহাড়ী নদীর বেগ, খুব খানিকটা বয়ে গেল আর হয়ে গেল। জীবন যেন খড়ের আগুন নিমেষেই জ্বলে-পুড়ে ছাই। ফুর্তি-মজা সব যেন শরৎ কালের মেঘের বাহার দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়। বন্ধু ছেলে বৌ চাকরদের সঙ্গে সম্পর্কটা যেন নিশার স্বপন। এ আমি বুঝে নিয়েছি। তো কি করলে ভবসমুদ্র পার হতে পারি বলুন গুরুদেব?[২৪]

এখানে সতর্ক চতুর মঠাধীশের চরিত্রটিও দেবশর্মার মধ্যে চমৎকার ফুটেছে। তিনি তাঁর জমানো অর্থগুলো সর্বদা বগলদাবা করে রাখতেন। কিছুতেই ছাড়তেন না। তদবধি তিনি আর কাউকে বিশ্বাসও করতেন না। রাতের বেলায় কাউকে মঠেও প্রবেশ করতে দিতেন না। তারপরেও তাঁর টাকাগুলো চুরি হয়ে যায় এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান, যা হাস্যরসের উদ্রেক করে।

সাহিত্যিক মূল্য

পঞ্চতন্ত্র শুধু গল্পরসে-কাব্যরসে পরিপূর্ণ নয়, সাহিত্যরসেও পরিপূর্ণ। প্রতিটি গল্পে চমৎকার সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্প ও গল্পের গঠনকৌশন অত্যন্ত সুন্দর এবং নির্মাণের দক্ষতাও বাস্তবতা মণ্ডিত। চরিত্রচিত্রণের নিপুনতা অতি তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষাশৈলীও খুব মধুর। গদ্য-পদ্য মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে গৌরী ধর্মপাল বলেছেন –

> *পঞ্চতন্ত্রে* গল্পের সঙ্গে গদ্যের কোনো আড়া-আড়ি নেই। গদ্যটা দেখতে দেখতে পদ্য হয়ে উঠেছে, পদ্যটা দেখতে দেখতে গদ্যের বুকে মিলিয়ে যাচ্ছে। কখনো ছাড়া কখনো জোড়া জোড়া, কখনও ঝাঁক বেঁধে আসছে পদ্য । গদ্যের মাটি খুঁড়ে দিচ্ছে সার, দিচ্ছে মালীর মতো, গল্পের আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে মালার মতো, গল্পের আগুনটাকে বা নিবু নিবু সলতেটাকে উসকে দিচ্ছে গৃহিণীর মতো, গল্পের হাত থেকে হাত তর্জনীর মতো

উঁচিয়ে আছে শিক্ষকের মতো, অভিভাবকের মতো বলছে, এই, কী কচ্ছিস? খবরদার...মরবি যে.... ভেবে দেখ...।[২৫]

গল্পের সাথে-সাথে গদ্য-পদ্যের যে মিশ্রণ লক্ষ করা যায় তার সাহিত্যিকমূল্য অপরিসীম। উদাহরণ হিসেবে। যেমন –

ন স্বল্পস্য কৃতে ভূরি নাসয়েন্ মতিমান্নরঃ।
এতদেব হি পাণ্ডিত্যং যৎ স্বল্পাদ্ ভূরিরক্ষণম্॥ ১/১৯

অথাসৌ তদবধার্য সঞ্জীবকস্য রক্ষাপুরুষান্নিরূপ্যাশেষসার্থে নীত্বা প্রস্থিতঃ। অথ রক্ষাপুরুষা অপি বহ্বপায়ং তদ্বনং বিদিত্বা সঞ্জীবকং পরিত্যজ্য পৃষ্ঠতো গত্বানোদ্যুস্তং সার্থবাহং মিথ্যাহুঃ – স্বামিন্ মৃতঽসৌ সঞ্জীবকঃ। অস্মাভিস্তু সার্থবাহস্যাভীষ্ট ইতি মত্বা বহ্নিনা সংস্কৃত ইতি। তচ্ছ্রুত্বা সার্থবাহঃ কৃতজ্ঞঃ স্নেহার্দ্রহৃদয়স্তস্যৌর্ধ্বদেহিকক্রিয়া বৃষোৎসর্গাদিকাঃ সর্বাশ্চকার। সঞ্জীবকোঽপ্যায়ুঃশেষতয়া যমুনাসলিলমিশ্রৈঃ শিশরতরবাতৈরাপ্যায়িতশরীরঃ কথশ্চিদপ্যুত্থায় যমুনাতটমুপপেদে। তত্র মরকতসদৃশানি বালতৃণাগ্রাণি ভক্ষয়ন্ কতিপয়ৈরহোভির্হরবৃশভ ইব পীনঃ কুকুস্মান্ বলবাংশ্চ সংবৃতঃ প্রত্যহং বাল্মীকশিখরাগ্রাণি শৃঙ্গাভ্যাং বিদারয়ন্ প্রগর্জংশ্চাস্তে। সাধু চেদমুচ্যতে –

অরক্ষিতং তিষ্ঠতি দৈবরক্ষিতং সুরক্ষিতং দৈবহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যানাথোঽপি বনে বিসর্জিতঃ কৃতপ্রযত্নোঽপি গৃহে ন জীবতি॥ (১/২০)[২৬]

অর্থাৎ, একটুখানি রক্ষার্থে অনেক যে হারায় সে বুদ্ধিমান নয়, একটুখানি হারিয়ে অনেক যে রক্ষা করেন তিনিই জগতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি। বর্ধমান চিন্তা করে দেখলেন কথাটি বাস্তব। তাই তিনি সঞ্জীবকের কাছে কয়েক জন পাহারাদার রেখে মথুরায় চলে গেলেন। পাহারাদারেরা ভাবল এই গভীর বনে বিপদের শেষ নেই। তাই তারা কয়েক দিন পর সঞ্জীবককে ফেলে বর্ধমানকে বলল প্রভু, সঞ্জীবক মারা গেছে। একথা শুনে কৃতজ্ঞ বণিক শ্রাদ্ধ-শান্তি সহ যাবতীয় ক্রিয়া-কর্ম করলেন। সঞ্জীবক কিন্তু মরেনি। বরং শরীরটা ঠাণ্ডা করে কোনো রকমে যমুনার তীরে গিয়ে সবুজ কচি ঘাষের ডগা খেয়ে শিবের ষাঁড়ের মতো অতিতেজস্বী হয়ে উঠল। তাই সে গায়ের জোরে শিং দুটো দিয়ে মাটির ঢিবি ভাঙ্গে আর গর্জন করে। প্রবাদে আছে রাখে কেষ্ট মারে কে আর মারে কেষ্ট রাখে কে? দৈব রক্ষা করলে অরক্ষিত থাকলেও বাঁচে আর দৈব রক্ষা না করলে সুরক্ষিত থাকলেও

মরে। মা নেই বাপ নেই, বনে ছেড়ে দিয়ে এল তবু বাঁচে। বাড়িতে রেখে কত আদর-যত্ন করে, তবু মরে।

মিত্রভেদ নামক তন্ত্রে 'দুই হাঁস ও কচ্ছপ' গল্পে সুললিত গদ্য সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় –

> অস্তি কস্মিংশ্চিজলাশয়ে কম্বুগ্রীব নাম কচ্ছপঃ। তস্য সঙ্কটবিকটনাম্নী মিত্রে হংসজাতীয়ে পরমস্নেহমাশ্রিতে। তৌ চ হংসৌ নিত্যমেব সরস্তীরমাসাদ্য তেন সহানেক দেবর্ষিমহর্ষীর্ণাং কথাঃ কৃত্বাস্তময়বেলায়ং স্বনীড়সংশ্রয়ং কুরুতঃ। অথ গচ্ছতি কালেনাবৃষ্টিবষাৎ। সরঃ শনৈঃ শনৈঃ শোষমগমৎ। ততস্তন্দুঃখদুঃখিতৌ তাবুচতুঃ – ভো মিত্র জম্বালশেষমেতং সরঃ সঞ্জাতং তৎ কথং ভবান্ ভবিষ্যতীতি ব্যাকুলত্বং নো হৃদি বর্ততে। তচ্ছ্রুত্বা কম্বুগ্রীব আহ-ভোঃ সাম্প্রতং নাস্ত্যস্মাকং জীবিতব্যং জলাভাবাৎ। তথাপ্যুপায়শ্চিন্ত্যতামিতি।[২৭]

অর্থাৎ, এক জলাশয়ে কম্বুগ্রীব নামে এক কচ্ছপ বাস করত। সেখানে আরও সঙ্কট-বিকট নামে দুটি হাঁস থাকত। প্রাণের বন্ধু হাঁস-কচ্ছপ প্রত্যহ এক সঙ্গে দেবর্ষি মহর্ষিদের বিষয়ে গল্প-টল্প করে। সূর্য পাটে বসলে নিজেদের বাসায় ফিরে যায়। এইভাবে তাদের দিন যায়। একবার শুরু হলো অনাবৃষ্টি। তাদের বাসস্থান শুকিয়ে যেতে লাগল। তখন তার দুঃখে দুঃখী হাঁসদ্বয় বলল – পুকুর তো শুকিয়ে কাদা হয়ে গেল, তোমার কথা ভেবে বড়ো দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে 'রাক্ষস ও ব্রাহ্মণ' গল্পে কুজো মন্থরকের উক্তিতে সাহিত্য-রসের পরিচয় পাওয়া যায় –

> লজ্জা স্নেহঃ স্বরবিশদতা বুদ্ধয়ঃ সৌমনস্যং
> প্রাণেঽনঙ্গঃ স্বজনমমতা দুঃখহানির্বিলাসাঃ ।
> ধর্মঃ শাস্ত্রং সুরগুরমতিঃ শৌচমাচারচিন্তা
> সস্যৈঃ পূর্ণে জঠরপিঠরে প্রাণিনাং সম্ভবন্তি ॥ ৫/৯১

অর্থাৎ, লজ্জা, স্নেহ, বিবেচনা, ভালো মন, কণ্ঠ জড়তাহীন, ভরা প্রাণ, প্রেম, স্বজনে মমতা, দুঃখকে বিদায়, শুধু ফুর্তি.....ফুর্তি.....বৃহস্পতির বুদ্ধি, আচার-চিন্তা, সাধুতা, শাস্ত্র, ধর্ম সম্ভব হয় তখনই, যখন পেট খাবারে পরিপূর্ণ থাকে।

এভাবে বাস্তবিক-চিরন্তন বিষয়টিকে সহজভাবে না বলে সুললিত কাব্য প্রয়োগ করে নির্মল সাহিত্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কিছু কিছু নাম যেমন হাস্যরস প্রকাশ করছে তেমনি কিছু কিছু নাম কোনো প্রাণীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছে। বিভিন্ন গল্পে চারিত্রিক নামগুলো, যেমন – শিয়ালের নাম চতুরক – যারা চালাক স্বভাবের প্রাণী (২/৬); ছারপোকার নাম অগ্নিমুখ - যার কামড়ে আগুন (১/৯); ব্যাঙের নাম মেঘনাদ – যার ডাক মেঘগর্জনের মতো, মাছির নাম বীণারব – যার ডাক বীণার সুরের মতো (১/১৫); অনাগতবিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি – মাছের চরিত্রে বুদ্ধিমান মানুষের প্রতিভূ (১/১৪); কচ্ছপের নাম মন্থরক – যার গতি ধীর (২/কথামুখ); কালকেউটের (সাপ) নাম অতিদর্প – যার অতি শক্তি (৩/৪); অপরপক্ষে শতবুদ্ধি, সহস্রবুদ্ধি – এরা হলো অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি (৫/৫); গাধার নাম উদ্ধত – যার স্বভাব উগ্র (৫/৬); উপভুক্তধন, জীর্ণধন, ধর্মবুদ্ধি, পাপবুদ্ধি – এ সবই হলো নামের ছদ্মবেশে বিশেষণ। গল্পকার কখনও কোনো পশুর গোটা জাতিকেই একটি চরিত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন, তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, যেমন – ক্রথনক বা উট। উট স্বভাবত শান্ত-শিষ্ট প্রাণী বলে গল্পের এমন একটি চরিত্রে গোটা উট জাতিকেই ব্যবহার করা হয়েছে (১/১১); তেমনি সাপের মুখে বিষ আছে বলে সাপের নাম দিয়েছেন – মন্দবিষ (৩/১২); কুমির ভয়ঙ্কর প্রাণী বলে নাম দিয়েছেন – করালমুখ (৪/কথামুখ)।

পঞ্চতন্ত্রে শব্দবিন্যাস, বাগ্‌বিন্যাস বড়ই মাধুর্যময়। যেমন– মজার মজার শব্দ –'প্রপলায়নম্', শুধু পলায়ন নয়, প্রপলায়ন (১/৩২২) ;' দন্তীবিনাং' শুধু দাঁত কাঁপুনি নয়, দন্তবীণা (১/১৮); 'অদ্রোহশপথম্' শুধু অহিংসা করা নয়, অহিংসার শপথ গ্রহণ

(২/৩৯);'আহারনিঃসরণমার্গম্' পায়ুপথ বা গুহ্যদেশ না বলে, আহার নিঃসরণের মার্গ (১/২০) ; 'ঘৃততৈলযবসাদিভিঃ' সুন্দর ঘাস না বলে, ঘি তেল ঘাস (৩/৮) প্রভৃতি শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য বৃদ্ধি করেছে। অতিপরিচিত বস্তুর সংস্কৃত নামগুলি বেশ চমৎকার। যেমন – মূল্যবিবর্জিতম্ – অমূল্য; সংক্রম্ – সাঁকো; বৃতি – বেড়া; রক্ষাপুরুষঃ – পাহারাদার; বরত্র – চামড়ার দড়ি; জানুচলন – হামাগুড়ি প্রভৃতি শব্দ অপূর্ব সাহিত্যরসের সৃষ্টি করছে।

অলংকার ব্যবহারেও বিষ্ণুশর্মার পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের মধ্য দিয়ে জটিল তত্ত্বগুলি যেমন আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে তেমনি উপমা, অনুপ্রাসাদির মাধ্যমে বক্তব্য মাধুর্যময় হয়ে উঠেছে। লেখক সমস্ত তন্ত্রেই এ সবের ব্যাপক প্রয়োগ করেছেন। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো। যেমন –

সুপূরা স্যাৎ কুনদিকা সুপূরো মুষিকাঞ্জলিঃ।
সুসন্তুষ্টঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনাপি তুষ্যতি॥
কিং তেন জাতু জাতেন মাতুর্যৌবনহারিণা।
আরোহতি ন যঃ স্বস্য বংশস্যাগ্রে ধ্বজো যথা॥ (১/২৫-২৬)

অর্থাৎ, ছোট নদী সহজেই ভরে যায়, মূষিকের অঞ্জলি পূর্ণ হয় অল্পতেই। কাপুরুষ খুশী হয় স্বল্পতেই। পতাকার মতো যে বংশের শীর্ষে আরোহণ করে না, সে মায়ের যৌবন কাড়তে আদৌ কেন জন্মায়?

উপর্যুক্ত প্রথম শ্লোকে উপমার মাধ্যমে আমাদের মানব জীবনকে ছোট নদীর মতো না ভেবে বড় নদী বা সাগরের সাথে তুলনার কথা বলা হয়েছে। মূষিকের অঞ্জলি না দিয়ে বৃহৎভাবে অঞ্জলি প্রদান করতে হবে অর্থাৎ কাপুরুষতা ত্যাগ করে উদার ধারণায় বিশ্বাসী হতে হবে। পতাকা যেমন মাথার উপরে অবস্থান করে তেমনি কর্মগুণে সবার উপরে অবস্থান করতে হবে।

মিত্রপ্রাপ্তিকম্ তন্ত্রে হিরণ্যকের উক্তিতে নানা উপমা-অলংকার পরিস্ফুট হয়েছে –

ব্যোমৈকান্তবিচারিণোঽপি বিহগাঃ সম্প্রাপ্নুবন্ত্যপদং
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলান্মীনাঃ সমুদ্রাদপি।
কিমিহাস্তি কিং চ সুকৃতং কঃ স্থানলাভে গুণঃ
কালঃ সর্বজনান্ প্রসারিতকরো গৃহ্নাতি দূরাদপি॥২/২১

অর্থাৎ, বিশাল আকাশের এককোণে পাখিরা ওড়ে-ঘোরে চলাচল করে, তবুও তাদের নিস্তার নেই। যতই মাছ সাগরের গভীর জলেতে থাক না কেন, দক্ষ জেলে ঠিক ধরে ফেলবেই। তাই এই দুনিয়ায় পাপ কী? বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়ে কী বা লাভ? যে যেখানে আছে সময় হলে সবাইকে হাত বাড়িয়ে মহাকাল দূর থেকেই ঠিক ধরে ফেলবে।

এমনি বাস্তবধর্মী উপমা আশ্রিত কাব্য সত্যিই সাহিত্যরসে পরিপুষ্ট।

আবার প্রকৃতি ও প্রাণী জগতের বর্ণনার মাধ্যমে সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় –

ছায়াসুপ্তমৃগঃ শকুন্তনিবহৈর্বিস্বগ্বিলুপ্তচ্ছদঃ
কীটৈরাবৃতকোটরঃ কপিকুলৈঃ স্কন্ধে কৃতপ্রশ্রয়ঃ।
বিস্রব্ধং মধুপৈনিপীতকুসুমঃ শ্লাঘ্যঃ স এব দ্রুমঃ
সর্বাঙ্গৈর্বহুজীবসন্ধসুখদো ভূভারভূতোঽপরঃ॥ (২/২)

অর্থাৎ, ছায়া-সুনিবিড় বৃক্ষের ছায়ায় পশু-পাখিরা এসে ঘুমায়, আবার কখনও ডাল-পালা-পাতা ছিঁড়ে নেয়। পোকামাকড়েরা আবৃত করে কোটর। বানরেরা জিরোয় কাঁধে হেলান দিয়ে, ভ্রমরেরা নিশ্চিন্তে ফুলের মধু খায়। এই বৃক্ষরাজিই ধন্য যাঁরা সারা শরীর দিয়ে সমস্ত প্রাণীকে আরাম দেয়, তারাই পৃথিবীর অলঙ্কার, অন্য আত্মকেন্দ্রিকেরা ভূভারস্বরূপ।

কাকোলূকীয় তন্ত্রে সঞ্জীবীর উক্তিতে উপমা অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায় –

চতুর্থোপায়সাধ্যে তু রিপৌ সান্ত্বমপক্রিয়া।
স্বেদ্যমামজ্বরং প্রাজ্ঞঃ কোঽম্ভস্য পরিষিঞ্চতি॥
সামবাদাঃ সকোপস্য শত্রোঃ প্রত্যুত দীপকাঃ।
প্রতপ্তস্যেব স সহসা সর্পিষস্তোয়বিন্দবঃ॥৩/২৭-২৮

অর্থাৎ, যে রিপুকে দণ্ড যুদ্ধ দিয়ে বাগ মানাতে হবে, তার ওপর সাম প্রয়োগ করা নিষ্ফল। যে কাচা জ্বর ঘাম দিয়ে সারাতে হবে, কোন বুদ্ধিমান তাতে জল ছিটোয়? রেগে থাকা শত্রুকে শান্তিবচন যেমন আরও রাগান্বিত করে। তপ্ত গরম ঘিয়ের ওপর হঠাৎ জলের ফোটা পড়লে যেমনটি হয়।

লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে 'ব্যাঙ ও কেউটে' গল্পে পঞ্চতন্ত্রকার উপমা হিসেবে নানা বিষয় উল্লেখ করেছেন, সংক্ষেপে, যেমন –

যোঽমিত্রং কুরুতে মিত্রং বীর্যাভ্যধিকমাত্মনঃ।
স করোতি ন সন্দেহঃ স্বয়ং হি বিষভক্ষণম্॥
সর্বস্বহরণে যুক্তং শত্রুং বুদ্ধিযুথা নরাঃ।
তোষয়ন্ত্যল্পদানেন বাড়বং সাগরো যথা॥ ৪/২৫-২৬

অর্থাৎ, যিনি অধিক বীর্যবান শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব করেন, তিনি নিজ হাতে বিষ ভক্ষণ করেন। অপরদিকে সর্বস্ব হরণ করার জন্য শত্রু যখন সমৃদ্ধত, বুদ্ধিমান তখন অল্প অল্প দান দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। যেভাবে সাগর অল্প জল দিয়ে বাড়ব-অনল তোষণ করে।

অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে 'ব্রাহ্মণ ও বেঁজি' গল্পে দেবশর্মার ভাবনায় উপমা অলংকার প্রকাশিত হয়েছে –

কুপুত্রোঽপি ভবেৎ পুংসাং হৃদয়ানন্দকারকঃ।
দুর্বিনীতঃ কুরূপোঽপি মুর্খোঽপি ব্যসনী খলঃ॥
এবং চ ভাষতে লোকশ্চন্দনং কিল শীতলম্।
পুত্রগাত্রস্য সংস্পর্শশ্চন্দনাদতিরিচ্যতে॥
বরং বনং ব্যাঘ্রগজাদিসেবিতং জলেন হীনং বহুকণ্টকাবৃতম্।
তৃণানি শয্যা পরিধানবল্কলং ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবিতম্॥ ৫/১৯-২০, ২৩

অর্থাৎ, উদ্ধত, কুৎসিত, মূর্খ নেশাখোর পুত্রও হয় হৃদয়-নন্দন, এভাবে চন্দন আর কি সুশীতল তার চেয়ে শীতল পুত্রের তনু স্পর্শ করা। ধনহীন হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বাঘ হাতি পরিবেষ্টিত জঙ্গলে, জল নেই, পদে পদে বিপদ ঘাসের বিছানা সেও অনেক ভালো।

একই তন্ত্রে রাজা চন্দ্র ও বানর দলপতি গল্পে অনুপ্রাস অলংকারের প্রয়োগ দেখতে পাই। যেমন –

জীর্যন্তে জীর্যন্তঃ কেশা দন্তা জীর্যন্তি জীর্যন্তঃ
জীর্যতশ্চক্ষুষী শ্রোত্রে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে॥৫/৭৯

অর্থাৎ, সাধারণত মানুষ বুড়ো হলে দাঁত, চুল, চোখ, কান বুড়োয় হয় কিন্তু যৌবন তৃষ্ণা কমে না।

এভাবে সুন্দর-সুন্দর শব্দের সাযুজ্যে নানা অলংকারের আলম্বনে প্রকৃতির নিটোল বর্ণনায় চমৎকার সাহিত্যতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব

পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যে *পঞ্চতন্ত্র*-এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে *পঞ্চতন্ত্র*-এর প্রভাব অপরিসীম। গল্পের আদিভূমি ভারতবর্ষ। এখান থেকেই গল্পের ধারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব কথাসরিৎসাগরে পরিণত হয়েছে। গল্পকারেরা *পঞ্চতন্ত্রকে* মূল গ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করে নানা ধরনের গল্প রচনা করেছেন। *হিতোপদেশ* গ্রন্থটি *পঞ্চতন্ত্র*-এর সরাসরি প্রভাব লক্ষ করা যায়। *হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র*-এর বঙ্গীয় রূপান্তর বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। ইহার রচয়িতা বাঙ্গালী পণ্ডিত নারায়ণ। যিনি ছিলেন রাজা ধবলচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক। এর অনুকরণে পরবর্তীকালে আরও কয়েকখানি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ রচিত হয়, যেমন – *কথাসরিৎসাগর, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, বেতালপঞ্চবিংশতি, বৃহৎকথা, দশকুমারচরিত* ইত্যাদি। এভাবে বিষ্ণুশর্মার *পঞ্চতন্ত্র*-এর হাত ধরেই গল্পসাহিত্যের নতুন দিক উন্মোচিত হয়ে গল্পসাহিত্য নানাভাবে প্রসারিত হয়েছে। বাংলাসাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে *পঞ্চতন্ত্র*-এর সরাসরি প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। বিশেষ করে প্রাচীন যুগে এবং মধ্য যুগের বাংলাসাহিত্যে *পঞ্চতন্ত্র*-এর গল্প নিয়ে নানা কাব্য রচিত হয়েছে। হেয়াতমামুদ *সর্বভেদবাণী* গ্রন্থে *পঞ্চতন্ত্র*-এর 'বক ও বেঁজি' 'মুনি-মুষিক' এবং 'ব্রাহ্মণী ও বেঁজি'র গল্প অনুকরণ করেছেন। যেমন –

প্রথম পর্বে –

পর্বত সম্পাতে এক বৃক্ষ উপ্তর।
তাতে এক সর্প থাকে খোঙ্গের ভিতর॥
বগাবগি সেই গাছে বিস্তর আছিল।
ডালে ডালে বাসা করি সবে ডিম্ব দিল॥
ডিম্ব হৈতে ছাও যদি হইল সভার।
ভাবিতে লাগিল বক মনের মাঝার॥
এ বৃক্ষ সর্পের স্থান যম দরশন।
না জানি আমার ছাও খায় বা কখন॥
সকলে করহ ভাই ইহার উপায়।
যেমন প্রকারে ভাই সর্প মারা যায়॥
সেহি কর্ম বগগণ করিল তখনি।
ভূমি হৈতে সারি করি রাখে মৎস্য আনি॥
ঘ্রাণ পায়া নেউলে আইল বৃক্ষতলে।
মৎস্য দেখি খাইতে লাগিল কুতূহলে ॥
খাইতে খাইতে মৎস্য গাছে গিয়া চড়ে।
সর্পের উপর দৃষ্ট আচম্বিতে পড়ে ॥
যুঝিতে লাগিল দোহে বিবিধ বিধানে।
নেউলে খাইল সর্প মারিয়া নিদানে ॥

দ্বিতীয় পর্বে – একদিন সেই মূষ দেখিয়া বিড়াল।
ছোও পাতি ধরিবার করিল আস্ফাল॥
তাহা দেখি মুনিবর ভাবিল হৃদয়।
ইহাকে বিড়াল ধরি খাইবে নিশ্চয়॥
ভক্ত সহায় প্রভু পরম দয়াল।

মুনির বচনে মূষ করিল বিড়াল॥
পুনরপি মুনিবর ভাবিল হৃদয়।
ইহাকে বিড়াল ধরি মারিবে নিশ্চয়॥
যদ্যপি কুকুর হয় এ মায়া বিড়াল।
সর্বত্র ইহার মনে তবে হয় ভাল॥
আরাধন করি মুনি কহে পুনর্বার।
বিড়াল কুকুর কর নাথ নৈরাকার॥
পুনরপি একদিন ভাবে মুনিবর।
এ কুকুর ব্যাঘ্র হইলে বড়ই সুন্দর॥
ভূমে শির দিয়া তবে আরাধিল মুনি।
কুকুর হইতে ব্যাঘ্র হইল তখনি॥

তৃতীয় পর্বে – পুনরপি কহে দ্বিজ আপনার মনে।
পুষিনু বেজির ছাও অনেক যতনে॥
তাহার নিকট আজি ছাইলাক রাখিয়া।
যাইব রায়ের বাড়ী দক্ষিণা লাগিয়া॥
খাটের সহিতে তারে বান্ধিয়া তখন।
ছাওয়াল সোয়ায়া খাটে করিল গমন॥
দৈবের নির্বন্ধে কতক্ষণে সর্পকাল।
খাটের উপরে আসি দংশিল ছাওয়াল॥
নেউলে দেখিয়া তারে দিল এক টান।
দড়ি ছিড়ি সর্প মারি কৈল খানখান॥

(*সর্বভেদবাণী,* হেয়াতমামুদ, পৃ. ৮৬, ৮৮, ৯২)

এখানে প্রথম পর্বে মূষিক (ইদুর), বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি পশুর চরিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে *পঞ্চতন্ত্র*-এর গল্প অনুকরণে কাব্য রচনার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় পর্বে সর্প, বগাবগি, নেউল(বেজি), মৎস্য প্রভৃতি চরিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে *পঞ্চতন্ত্র*-এর গল্প অনুকরণে কাব্য রচনার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয় পর্বে এখানে মূষিক, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি পশুর চরিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে *পঞ্চতন্ত্র*-এর গল্প অনুকরণে কাব্য রচনার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

পরবর্তীতে এভাবে আরও বাংলাসাহিত্যে *পঞ্চতন্ত্র*-এর অনুকরণে পশু-পাখি-জীব-জন্তুর চরিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে নানা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন – ভবানীশঙ্কর দাসের *মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা* গ্রন্থে –

কোনখানে খেলে রঙ্গে হরি করী এক সঙ্গে।
খগেন্দ্রের উত্তমাঙ্গে ফণা ধর‍্যাছে ভুজঙ্গে।
মইষে শার্দূল সহিতে খেলে দেখে হরষিতে।
দেখ দেখ পারাবতে খেলএ সাইচান সাতে।
(*মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা*, ভবানীশঙ্কর দাস পৃ. ১৩৩)

এখানে হরি(সিংহ), করি(হস্তী), খগেন্দ্র(গরুড়), ভুজঙ্গ(সর্প), শার্দূল(বাঘ), পারাবাত(কপোত) ও সাইচান্(বাজপাখি) প্রভৃতি পশু-পাখির চরিত্র *পঞ্চতন্ত্র*-এর মতোই রূপায়িত করা হয়েছে।

সারদামঙ্গল কাব্যে পশু-পাখিকে নিয়ে নানা কাব্য রচিত হয়েছে –

কোনখানে ব্যাঘ্র সনে মৈষে করে কেলি।
ফণী সঙ্গে ভেক রঙ্গে রহে এক মেলিন॥
ব্যাঘ্র ঠাই মৃগে জাই পুছ এ কুশল।

তথাপিয় কারে খেহ নহি করে বল॥

(*সারদামঙ্গল*, মুক্তারাম সেন পৃ. ৪৯)

এখানে ব্যাঘ্র, মৈষ, ফণী(সাপ), ভেক(ব্যাঙ), মৃগ *পঞ্চতন্ত্র*-এর মতোই চারিত্রিক রূপায়ণ।

রামদাস আদকের *অনাদিমঙ্গল* কাব্যে *পঞ্চতন্ত্র*-এর মতোই পশু-পাখির চরিত্র প্রত্যক্ষ করা যায় –

মণ্ডল হইয়ে বাদ ভূপতির সনে।
পতঙ্গ পতন যেন যজ্ঞের আগুনে॥
ভুজঙ্গ হইয়ে নাকি জিনিবে গরুড়ে।
জিনিবে পতঙ্গ হয়ে মাতঙ্গ প্রচুরে॥
কর্কট হইয়া কোথা জিনিছে শৃগাল।
ইন্দুর হইয়া কোথা জিনিছে বিড়াল॥
সালূর কি হরে লয় ফণিমাথার মণি।
অসম্ভব কথা কেন বল নারায়ণি॥

(*অনাদিমঙ্গল*, রামদাস আদক, পৃ. ১৬)

এখানে ভুজঙ্গ, গরুড়, ইন্দুর, বিড়াল, সালূর (ব্যাঙ) *পঞ্চতন্ত্র*-এর মতোই চারিত্রিক রূপায়ণ।

বিখ্যাত কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর *শ্রীধর্মমঙ্গল* কাব্যে *পঞ্চতন্ত্র*-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় –

মূষিক শিবা শশক শার্দূল।
গলাগলি ভাসে বান বিপত্তে ব্যাকুল॥
ফনির ফণায় চেপে চলিছে মণ্ডূক।
বিপাকে কাকের হাসি দেখিতে কৌতুক॥

(*ধর্মমঙ্গল* পৃ. ৫৬০)

এখানে মার্জার, মূষিক, শশক, শার্দূল, মণ্ডূক প্রভৃতি *পঞ্চতন্ত্র*-এর মতোই চারিত্রিক রূপায়ণ।

রাধামাধব দত্ত প্রণীত *মনসাপাঁচালি* আধুনিক কালে খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের বাংলাকাব্যে *পঞ্চতন্ত্র*-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় (কাব্যটির সম্পাদক অমলেন্দু ভট্টাচার্য) –

ভয়াতুর পসুপতি দেখি হাশি সতি
না জাইয় সব্দ করে।
তবো ধর্য্য নহে হর দশ দীগে দেএ লড়
জেন মৃগ শিংহিনি গোচরে॥

(*মনসাপাঁচালি,* রাধামাধব দত্ত, পৃ. ১৩৪)

এখানে মৃগ, শিংহিনি (সিংহ) প্রভৃতি *পঞ্চতন্ত্র*-এর মতোই চারিত্রিক রূপায়ণ।

এভাবে সিংহ, হস্তী, ষাঁড়, গরুড়, সর্প, মৃগ, মহিষ, কপোত, বাজপাখি প্রভৃতি পশু-পাখি-জীব-জন্তুকে নিয়ে কাব্য রচনা কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার উপযোগী বিভিন্ন চরিত্র হিসেবে পঞ্চতন্ত্রকারই প্রথম উপস্থাপন করেছেন। তিনি পশুপাখির মুখের কথায় আচার-আচরণে মনুষ্য চরিত্র চিত্রণ করেছেন। সমসাময়িককালে কোমলমতি শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে, টেলিভিশনে শিশুদের বিনোদনের জন্য কার্টুনের মাধ্যমে এমনিভাবে পশুপাখি-জীব-জন্তুকে নিয়ে মানুষের চরিত্র আরোপের মাধ্যমে নানা কাহিনি রূপকল্প হিসেবে দাঁড় করিয়ে অতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে, যা *পঞ্চতন্ত্র*-এর দ্বারা প্রভাবিত বলে উল্লেখ করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা – ২০১২, পৃ. ৪৬০

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০

৩. In short, the difference between the *Tantrakhyayika* and the other versions, in their relations to the original is a difference of degree and not a difference of kind. All are to a considerable extent original. All are to a considerable extent unoriginal.On the whole, the *Tantrakhyayika* contains more of the original than of any other. In these respect it is surpassed by the southern *Panchatantra*, which has much less unoriginal material than the *Tantrakhyayika*, and probably less than any other version, expect the greatly abbreviated and versified Somadeva."

Franklin Edgerton, *The Provit Underlying Buddhistic Hybrid Sanskrit*, Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London, Vol- 8, p. 502

৪. Johannes Hartel, *The Panchatantra-text Purnabhadra*, Har vard University Press, Cambridge, 1912, p. 262

৫. In these fables and fairy tales, the abundant introduction of the ethical reflection and popular philosophy is characteristic;the apologue with its moral is peculiarly subject to this method of treatment." Macdonell: Sanskrit Literature, Arthur Macdonell,

A History of Sanskrit Literature, D Appleton and company, voll-1.3 – 1900, p. 164

৬. It differs from the tales in that fable element with its didactive stanzas decidedly prevails over other elements while the tale includes the fable merely as a lesser constituent. Both profit by this absence of rigitidy, which permits either a richer content and more elaborate development. Even so late a work as the Hitopadesh know how to seek variety by blending the beast fable with marchen and spicy narratives of the human life."

Arthur Berridale Keith, *A History of Sanskrit Literature*, Oxford University Press, 1920, p. 23

৭. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, *নারায়ণ-প্রণীতঃ হিতোপদেশঃ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮, শ্লোক নং ৯, পৃ. ৫

৮. প্রাগুক্ত, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৪৬০-৪৬১

৯. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, *পুরোনো বাংলাকাব্য : চিরশত্রুযুগলপ্রসঙ্গ*, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ৫০, সংখ্যা ২-৩, জুন ২০১৩, পৃ. ৩৯

১০. দুলাল ভৌমিক অনূদিত, *পঞ্চতন্ত্র,* সাহিত্য বিলাস, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ৯

১১. প্রসূন বসু সম্পাদিত, বিষ্ণুশর্মা, *পঞ্চতন্ত্রম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১৫দশ খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, পৃ. ৫

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

১৩. বিপ্রদাশ বড়ুয়া, *পঞ্চতন্ত্র গল্পসংগ্রহ পুনর্কথন*, সাহিত্য প্রকাশ, বাংলা বাজার, ঢাকা ২০০২ পৃ. ১৭৫

১৪. প্রাগুক্ত, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৪৬১-৪৬২

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

১৭. কেঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ভক্তিমান্।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, কথামুখম্, শ্লোক নং ৫, পৃ. ২৩৫

১৮. তদত্রাস্তি বিষ্ণুশর্মা নাম ব্রাহ্মণঃ সকলশাস্ত্রপারংগমশ্ছাত্রসংসদি লব্ধকীর্তিঃ। তস্মৈ সমর্পয়তু এতান্। সনূনং দ্রাক্ প্রবুদ্ধান্ করিষ্যতি ইতি।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৩৬

১৯. 'নাহং বিদ্যাবিক্রয়ং শাসনশতেনাপি করোমি। পুনরেতাংস্তব পুত্রান্ মাসষট্কেন যদি নীতিশাস্ত্রজ্ঞান্ ন করোমি ততঃ স্বনামত্যাগং করোমি'।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৩৬

২০. ময়া হি মৎস্যাদনং প্রতি পরমবৈরাগ্যতয়া সাম্প্রতং প্রায়োপবেশনং কৃতং তেনাহং সমীপগতানপি মৎস্যান্ন ভক্ষয়ামি।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৬১

২১. অহো অসারোঽয়ং সংসারঃ। ক্ষণভঙ্গুরাঃ প্রাণাঃ। স্বপ্নসদৃশঃ প্রিয়সমাগমঃ। ইন্দ্রজালবৎ কুটুম্বপরিগ্রহোঽয়ম্। তদ্ধর্মং মুক্ত্বা নান্যা গতিরস্তি। উক্তং চ –

অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিতং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্তব্যো ধর্মসংগ্রহঃ॥৩/৯৫
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥ ৩/১০২

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ৩২৭

২২. যে যাজ্ঞিকা যজ্ঞকর্মণি পশূন্ ব্যাপাদয়ন্তি তে মূর্খাঃ পরমার্থং শ্রুতের্ন জানন্তি। তত্র কিলৈতদূক্তমজৈর্যষ্টব্যম্। অজা ব্রীহয়স্তাবৎ সপ্তবার্ষিকাঃ কথ্যন্তে। ন পুনঃ পশুবিশেষাঃ। উক্তং চ

বৃক্ষাংশ্ছিত্ত্বা পশূন্ হত্যা রুধিরকর্দমম।
যদ্যেবং গম্যতে স্বর্গে নরকং কেন গম্যতে॥৩/১০৬

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩২৮

২৩. শ্লেষ্মাশ্রু বান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্‌তে যতোঽবশঃ।

তস্মান্ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়াঃ কার্যাঃ স্বশক্তিতঃ॥২/৩৩৮

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৭৮

২৪. ওঁং নমঃ শিবায় ইতি প্রোচ্চার্য সাষ্টাঙ্গং প্রণম্য চ সপ্রশ্রয়মুবাচ ভগবন্ অসারঃ সংসারোঽয়ং গিরিনদীবেগোপমং যৌবনং তৃণাগ্নিসমং জীবিতং শরদভ্রচ্ছায়াসদৃশা ভোগাঃ স্বপ্নসদৃশো মিত্রপুত্রকলত্র ভৃত্যবর্গসম্বন্ধঃ। এবং ময়া সম্যক্ পরিজ্ঞাতম্। তৎ কিং কুর্বতো মে সংসারসমুদ্রোত্তরণং ভবিষ্যতি।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৫২

২৫. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৫

২৬. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৩৮

২৭. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৭৬

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চতন্ত্রে সমাজনীতি

তৃতীয় অধ্যায়ে গল্প সাহিত্য হিসেবে *পঞ্চতন্ত্র*-এর মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে *পঞ্চতন্ত্রে* সমাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। গল্পসাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের একটি প্রাচীনতম ধারা। এ সাহিত্য মানুষের কথা বলেছে, সমাজের কথা বলেছে, জীবনের কথা বলেছে, নীতির কথা বলেছে। এই আলোকে *পঞ্চতন্ত্রে* গল্পকার বিষ্ণুশর্মা গল্পের মাধ্যমে তৎকালীন সামাজের বিভিন্ন বিষয় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি তৎকালীন সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, নারীদের অবস্থা, ধর্ম, কৃষি, খাদ্য, জ্যোতিষশাস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, কুসংস্কার, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি এবং প্রাকৃতিক ও মানবিক নানা বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সুতরাং এই বিষয়গুলোর আঙ্গিকে আলোচ্য অধ্যায়ে পঞ্চতান্ত্রিক যুগের সমাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থা

সাধারণ অর্থে জ্ঞান লাভের উপায়ই হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানব জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলে। এজন্য শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। এমন একদিন ছিল যেদিন মানুষ পাহাড়ের গুহায় বনে-জঙ্গলে বসবাস করত। সে যুগ পেরিয়ে আস্তে আস্তে শিক্ষার মাধ্যমে সভ্য জগতের দ্বার প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। বিশ্ব বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের মতে –'শিক্ষা হল মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ'। শিক্ষা ব্যতীত সমগ্র জাতি অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। শিক্ষা অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তি শিক্ষা সম্পর্কে এ সমস্ত বিষয়

অনুধাবন করেছিলেন। তাই তিনি নির্বোধ পুত্রদের শিক্ষিত করতে অতি আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন এবং অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মন্ত্রীদের ডেকে বলেছেন – 'আপনারা তো জানেনই, আমার এই তিনটি পুত্রই পড়াশোনার প্রতি একেবারেই বিমুখ, বুদ্ধিশুদ্ধিও কিছুই নেই। এদের কথা ভেবে আমারতো এতোবড়ো সাম্রাজ্যেও সুখ নেই।'[১] তখন প্রজ্ঞাবান মন্ত্রীর পরামর্শে একজন মহান পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মাকে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। সে রাজ্যের রাজা হিসেবে অমরশক্তি ছিলেন বিদুষী, শিক্ষাণুরাগী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। অপরদিকে বিষ্ণুশর্মার পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এ থেকে তৎকালীন সমাজে রাজপরিবার থেকে আরম্ভ করে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষিত লোকের অবস্থা ও শিক্ষার আগ্রহ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, *পঞ্চতন্ত্রে* মোট ৭৪টি গল্প রয়েছে, যার সবগুলোই রাজ-কুমারগণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুশর্মা রচনা করেন। সেহিসেবে এ গ্রন্থে শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতি-দর্শন, বৈদিক গ্রন্থ, পৌরাণিক গ্রন্থ এবং ব্যাকরণ শিক্ষার নানা বিষয় সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়। *পঞ্চতন্ত্র*-এর কথামুখে অমরশক্তি মূর্খ পুত্রদের সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তাতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায় –

অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্।
যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ॥ (১/কথা-৩)

অর্থাৎ, বিবেক বুদ্ধিহীন ছেলের চেয়ে, জন্ম না হওয়া, কিম্বা মৃত্যু হওয়া, সেই বরং ভালো। কারণ ও-দুটির জ্বালা অল্প, এটি তো যাবজ্জীবন জ্বালাতন করে।

অমরশক্তি দাক্ষিণাত্যের নৃপতি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য খুব তাগিদ বোধ করেছিলেন। তাই তিনি মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য শিক্ষানুরাগী মনসিকতায় নিম্নোক্তভাবে আরও বলেছেন –

বরং গর্ভস্রাবো বরমৃতুষু নৈবাভিগমনং
বরং জাতঃ প্রেতো বরমপি চ কন্যৈব জনিতা।
বরং বন্ধ্যা ভার্যা বরমপি চ গর্ভেষু বসতি-
র্ন চাবিদ্বান্ রূপদ্রবিণগুণযুক্তোঽপি তনয়ঃ॥

কিং তয়া ক্রিয়তে ধেন্বা যা ন সূতে ন দুগ্ধদা।

কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ভক্তিমান্॥ (১/ কথা ৪-৫)

অর্থাৎ, ঔরসজাত অবিদ্বান ছেলের চেয়ে বন্ধ্যাত্ব স্ত্রী সেও খুব ভালো, গর্ভপাত, উদরে বসতি, মৃত ছেলে-মেয়েও ভালো, তাছাড়া না থাক রূপ বা ধন তবুও অশিক্ষিত ছেলের দরকার নেই। কারণ এর দুঃখ একবার আর মূর্খ পুত্র দুঃখ দেয় সারাজীবন। যেমন, যে গরু না দেয় দুধ, না দেয় বাচ্চা সে গরুর কি দরকার? তেমনি কি হবে সে ছেলে দিয়ে, যদি না হয় বিদ্বান, না হয় ভক্তিমান?

এভাবে রাজা অমরশক্তি বিদ্যা-শিক্ষার গুরুত্বের কথা মন্ত্রীদের বলেছেন। সাথে সাথে দৃঢ় ভাষায় ছেলেদের শিক্ষিত করার জন্য মন্ত্রীদের উপায় বের করতে বলেছেন। তখন সভাস্থলে সুমতি নামে একজন মন্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে নানা কথা বললেন, তাঁর কথায় তৎকালীন সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়। সেসময়ে শুধুমাত্র সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা নয়, অতি উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল কেননা *পঞ্চতন্ত্র*-এর যুগে মানুষ কতিপয় শাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন করত তা নয় *ব্যাকরণ, মনুসংহিতা, ধর্মশাস্ত্র,* চাণক্য প্রমুখের *অর্থশাস্ত্র,* বাৎস্যায়নের *কামশাস্ত্র* এভাবে *ধর্ম-অর্থ-কামশাস্ত্রসহ* প্রভৃতি উন্নত গ্রন্থ অধ্যয়নের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। যেমন –

'দ্বাদশভির্বর্ষৈর্ব্যাকরণং শ্রুয়তে। ততো ধর্মশাস্ত্রাণি মন্বাদীনি অর্থশাস্ত্রাণি চাণক্যাদিনী কামশাস্ত্রাণি বাৎস্যায়নাদীনি। এবং চ ততো ধর্মার্থকামশাস্ত্রাণি জ্ঞায়তে।'[২]

অর্থাৎ, ব্যাকরণ শুনতে লাগে বারো বছর। তারপর মনু প্রভৃতি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি প্রভৃতি শাস্ত্র আয়ত্ত হলে তবে গিয়ে জ্ঞানের বিকাশ হয়। এ প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকার বলেছেন –

অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।

সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ॥ ১/ কথা ৬

অর্থাৎ, শব্দশাস্ত্র অকূল অপার, আয়ু যতটুকু তা আবার বাঁধায় ভরা। তাই অসার বস্তু ত্যাগ করে আসল বস্তু গ্রহণ করা উচিত। যেমন রাজহাঁস জল দুধের মিশ্রণ থেকে দুধটুকু গ্রহণ করে।

রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য বিষ্ণুশর্মাকে ডাকা হলে রাজা অমরশক্তি তাঁকে খুশি করার জন্য একশটি রাজদান দানপত্র আর্থাৎ একশটি গ্রাম দান করতে চাইলেন। বিষ্ণুশর্মা তখন বিদ্যা-শিক্ষাকে মহান পেশা মনে করে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন –

'নাহং বিদ্যাবিক্রয়ং শাসনশতেনাপি করোমি। পুনরেতাংস্তব পুত্রান্ মাসষট্কেন যদি নীতিশাস্ত্রজ্ঞান্ ন করোমি ততঃ স্বনামত্যাগং করোমি।'[৩]

অর্থাৎ, আমি বিদ্যা বিক্রি করি না। একশ গ্রামের বিনিময়েও না। তবে কথা দিচ্ছি আপনার এই পুত্রদের যদি ছয় মাসের মধ্যে শিক্ষিত করে তুলতে না পারি তাহলে আমার নামই ত্যাগ করব।

পঞ্চতন্ত্রিক যুগে যুগে উচ্চকুলজাত ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈদিক ও সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন তন্ত্রে দেখা যায় – *বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বেদান্ত, প্রমাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, নীতিশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ব্যাকরণ, তর্ক-মীমাংসা*-সহ প্রভৃতি শাস্ত্র পণ্ডিত-ব্যক্তিগণ অধ্যয়ন করতেন। এছাড়া কথামুখ ছড়াও বিভিন্ন তন্ত্রে *মনুসংহিতা* অন্যান্য *ধর্মশাস্ত্র,* চাণক্য প্রমুখের *অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নাদি কামশাস্ত্র*-সহ নানা গ্রন্থের নানা উপমা-দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এ থেকে সেসময়ে বিদ্যা-শিক্ষার যে ব্যাপক চর্চা হতো সে বিষয়ে বিস্তৃত ধারণা পাওয়া যায়। যেমন –

বেদ সম্পর্কে দৃষ্টান্ত –

অগ্নিহোত্রফলা বেদাঃ শীলবিত্তফলং শ্রুতম্।
রতিপুত্রফলা দারা দত্তভুক্তফলং ধনম্॥২/১৫০

অর্থাৎ, *বেদ* পাঠের ফল অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ সাধন। পড়াশুনার ফল – ধনলাভ ও চরিত্রবান হওয়া। স্ত্রী প্রণয়ের ফল – প্রেম ও সন্তান। টাকা উপার্জনের ফল – ভোগ আর দান করা।

রামায়ণ সম্পর্কে দৃষ্টান্ত –

পৌলস্ত্যঃ কথমন্যদারহরণে দোষং ন বিজ্ঞাতবান্
রামেণাপি কথং ন হেমহরিণস্যাসম্ভবো লক্ষিতঃ।
অক্ষৈশ্চাপি যুধিষ্ঠিরেণ সহসা প্রাপ্তো হ্যনর্থঃ কথং
প্রত্যাসন্নবিপত্তিমূঢ়মনসাং প্রায়ো মতিঃ ক্ষীয়তে॥২/৪

অর্থাৎ, পরস্ত্রীহরণে যে দোষ রাবণ জানত না, তা হয় না। অপরপক্ষে সোনার হরিণ পাওয়া অসম্ভব রাম তা বোঝেননি, তা তো নয়। যুধিষ্ঠির পাশা খেলে পরিবারের বিরাট সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। বিপদ ঘনিয়ে এলে মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে মানুষের বুদ্ধিনাশ ঘটে।

দুর্গং ত্রিকূটঃ পরিখা সমুদ্রো রক্ষাংসি যোধা ধনদাশ্চ বিত্তম্।
শাস্ত্রং চ যস্যোশনসা প্রণীতং স রাবণো দৈববশাদ্বিপন্নঃ॥৫/৮৫

অর্থাৎ, দুর্গের নিরাপত্তায় ছিল তাঁর ত্রিকুট পাহাড়, পরিখা ছিল তাঁর সাগর, ধনদাতা ছিল তাঁর কুবের, শত সহস্র ছিল তাঁর বীর যোদ্ধা। স্বয়ং শুক্র লিখেছিল তাঁর জন্যে নীতির বই – মরতে হলো সে রাবণকেও ! তাই দৈব শক্তিই বলবান।

মহাভারত সম্পর্কে দৃষ্টান্ত –

শপথৈঃ সন্ধিতস্যাপি ন বিশ্বাসং ব্রজেদ্ রিপোঃ।
অদ্রোহশপথং কৃত্বা বৃত্রঃ শক্রেণ সূদিতঃ॥২/৩৯

অর্থাৎ, শপথ করে সন্ধিবন্ধন করলেও শত্রুকে বিশ্বাস করা যায় না। অদ্রোহ-শপথ অর্থাৎ শত্রুতা বর্জন চুক্তি করে ইন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করেছিলেন।

ন বিশ্বাসং বিনা শক্রর্দেবানামপি সিধ্যতি।
বিশ্বাসাৎ ত্রিদশেন্দ্রেণ দিতের্গর্ভো বিদারিতঃ॥২/৪০

অর্থাৎ, শত্রুর বিশ্বাস অর্জন ছাড়া দেবতারাও শত্রুজয় করতে পারেন না। দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বাস অর্জন করে তবেই দিতির উদর বিদীর্ণ করতে পেরেছিলেন।

শক্তেনাপি সতা জনেন বিদূষা কালান্তরাপেক্ষিণা
বস্তব্যং খলু বাক্যবজ্রবিষমে ক্ষুদ্রেঽপি পাপে জনে।
দর্বীব্যগ্রকরেণ ধূমমলিনেনায়াসযুক্তেন চ
ভীমেনাতিবলেন মৎস্যভবনে কিং নোষিতং সূদবৎ॥ ৩/২০৩

অর্থাৎ, ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে সজ্জন হয়েও অনর থাকবে বজ্রবাক্যে কঠিন ক্ষুদ্র পাপী লোকের সাথে। ধোঁয়ায় কালো-গা, খেটে খেটে সারা, হাতায় ব্যস্ত হাত-রাঁধুনী সেজে মহাবলশালী ভীম অবস্থান করেন মৎস্য ভবনে।

সিদ্ধিং প্রার্থয়তা জনেন বিদুষা তেজো নিগৃহ্য স্বকং
সত্ত্বোৎসাহবতাপি দৈববিধিষু স্থৈর্যং প্রকার্য ক্রমাৎ।
দেবেন্দ্রদ্রবিণেশ্বরান্তকসমৈরপ্যন্বিতো ভ্রাতৃভিঃ
কিং ক্লিষ্টঃ রুচিরং বিরাটভবনে শ্রীমান্ন ধর্মাত্মজঃ॥৩/২০৫

অর্থাৎ, বলবান, তেজবান, উৎসাহী হলেও তবু সিদ্ধিকামনায় ক্রমিক দৈববিধানে বুদ্ধিমান সর্বদা ধৈর্য রাখবে। অপরদিকে শ্রীমান ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ইন্দ্র-কুবের-যম-সমতুল্য ভাই থাকা সত্ত্বেও বিরাটনগরে কষ্ট করেন দীর্ঘকাল।

রূপাভিজনসম্পন্নৌ মাদ্রীপুত্রৌ বলান্বিতৌ।
গোকর্মরক্ষাব্যাপারে বিরাট-প্রেষ্যতাং গতৌ॥৩/২০৬

অর্থাৎ, রূপবান অভিজাত বলবান-মাদ্রীর ছেলে দুটি। বিরাট রাজার ভৃত্য হয়ে গরু-ঘোড়া সামলালো।

বসোর্বীর্যোৎপন্নামভজত মুনির্মৎস্যতনয়াং
তথা জাতো ব্যাসঃ শতগুণনিবাসঃ কিমপরম্।
স্বয়ং বেদান্ ব্যস্যঞ্ছমিতকুরুবংশপ্রসবিতা
স এবাভূচ্ছ্রীমানহহ বিষমাঃ কর্মগতয়ঃ॥৪/৫০

অর্থাৎ, বসুর বীর্যোৎপন্না মৎস্যকন্যাকে বধূরূপে বরণ করেছিল মুনি পরাশর। তাঁর থেকেই ব্যাসদেবের জন্ম। তাঁর গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। বেদ ভাগ করেছিল যে মুনি স্বয়ং সে-ই কুরুবংশ হলে যায়-যায়, দিয়েছিলো পুনর্জন্ম, শ্রীমান। কর্মের গতি কী বিষম বিচিত্র হায় হায় !

রামায়ণ-মহাভারত-এর সমন্বয়ে দৃষ্টান্ত –

রামস্য ব্রজনং বলের্নিয়মনং পাণ্ডোঃ সুতানাং বনং
বৃষ্ণীনাং নিধনং নলস্য নৃপতে রাজ্যাৎ পরিভ্রংশনম্।
সৌদাসং তদবস্থমর্জুনবধং সঞ্চিন্ত্য লঙ্কেশ্বরং
দৃষ্ট্বা রাজ্যকৃতে বিড়ম্বনগতং তস্মান্ন তদ্ বাঞ্ছয়েৎ॥ ৫/৬৬

অর্থাৎ, রামের বনবাস, বন্দীদশা বলির, পাণ্ডবদের বনগমন, সমূলে ধ্বংস বৃষ্ণিবংশের, রাজ্যভ্রংশ নলরাজার, সৌদাসের সেই দশাটা, কার্তবির্যার্জুনের বধ, দশাননের বিড়াম্বনা। কারণ তো রাজ্যই! এ কেউ চায়!

পুরাণ সম্পর্কে দৃষ্টান্ত –

বৃহস্পতেরপি প্রাজ্ঞস্তস্মান্নৈবাত্র বিশ্বসেৎ।
য ইচ্ছেদাত্মনো বৃদ্ধিমায়ুষ্যং চ সুখানি চ॥
যস্য ন জ্ঞায়তে বীর্যং ন কুলং ন বিচেষ্টিতম্।
ন তেন সঙ্গতিং কুর্যাদিত্যুবাচ বৃহস্পতিঃ॥২/৪১, ৬১

অর্থাৎ, যে বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজের সুখ সমৃদ্ধি ও আয়ু চায়, সে বৃহস্পতিকেও বিশ্বাস করবে না।

অপরপক্ষে, যার ধরন-ধারণ, কুল বা পরাক্রম জানা নেই তার সঙ্গে ভাব করা ঠিক না, এ কথা বলেন বৃহস্পতি।

মনুসংহিতা সম্পর্কে দৃষ্টান্ত –

মিত্রার্থে বান্ধবার্থে চ বুদ্ধিমান্ যততে সদা।
জাতাস্বাপৎসু যত্নেন জগাদেদং বচো মনুঃ॥১/৩২০

অর্থাৎ, মনু বলেছেন বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজন বিপদে পড়লে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাদের রক্ষার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে।

উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে বর্তমান সময়ে আমরা যেমন বিদেশে যাই তেমনি অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে 'চার পণ্ডিতমূর্খ' গল্পে চার ব্রাহ্মণ যুবক শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশ গিয়েছিলেন – 'ভো দেশান্তরং গত্বা বিদ্যায়া উপার্জনং ক্রীয়তে' অর্থাৎ বিদ্যালাভ করতে হয় বিদেশ গিয়ে। এভাবে বিষ্ণুশর্মা শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে বিদেশ গমনের কথা ব্যক্ত করেছেন।

এছাড়া তিনি বিদ্যা-শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন –

বরং বুদ্ধির্ন সা বিদ্যা বিদ্যায়া বুদ্ধিরুত্তমা ।
বুদ্ধিহীনা বিনশ্যন্তি যথা তে সিংহকারকাঃ॥৫/৩৬
অপি শাস্ত্রেষু কুশলা লোকাচারবিবর্জিতাঃ।
সর্বে তে হাস্যতাং যান্তি যথা তে মূর্খপণ্ডিতাঃ॥৫/৩৯

অর্থাৎ, বুদ্ধিই ভালো, বিদ্যা নয়। বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধিই সেরা। বুদ্ধি থাকে না যার, সে মরবে যেমন মরেছিল ঐ যে সিংহ কারেরা। যাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই, অথচ শাস্ত্রে উত্তীর্ণ, মূর্খ পণ্ডিতের মতো তারা উপহাসের যোগ্য।

এছাড়া পঞ্চতন্ত্রকার বিদ্যা-শিক্ষার বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থের কথা বলেছেন। যেমন – বরাহ মিহিরের এনসাইক্লোপিডিয়া, বৃহৎ-সংহিতা, কামন্দকীশাস্ত্র(পৃ ১১০) এবং মিত্রপ্রাপ্তি তন্ত্রে প্রাপ্তব্যমর্থম্ গল্পে সাগরদত্তের একশত টাকা দিয়ে বই কেনা তৎকালীন সময়ে যা খুবই ব্যয়বহুল বিষয়।

পঞ্চতন্ত্রকার 'বানররা ও সূচীমুখ' গল্পে বুঝিয়েছেন অশিক্ষিত-মূর্খদের চেয়ে পণ্ডিত শত্রুও বরং ভালো। যারা শিক্ষিত তাঁদের উপদেশ দিলে ফল হয় কিন্তু অশিক্ষিত-মূর্খদের হিতের জন্য উপদেশ দিলে শোনেতো না'ই বরং উল্টো উপদেশ দাতাকে দুঃখ দেয়, কখনও চরম ক্ষতিসাধনও করে। যেমন –

উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্॥ ১/৩৯৩

অর্থাৎ, সৎ উপদেশ মূর্খদের কখনও শান্ত করে না বরং ক্রোধই বাড়িয়ে দেয়। দুধ খেয়ে যেমন সাপের বিষই শুধু বৃদ্ধি পায়।

এমনিভাবে শিক্ষার গুরুত্ব প্রকাশ করতে 'বানর ও চড়ুউনী' গল্পে করটক বলেছে – 'ন তে দোষোঽস্তি যতঃ সাধোঃ শিক্ষা গুণায় সম্পদ্যতে নাসাধোঃ।' অর্থাৎ, – সুজনকে শিক্ষা দিলে তবেই ফল হয় দুর্জনকে নয়। এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে –

কিং করোত্যেব পাণ্ডিত্যমস্থানে বিনিয়োজিতম্।
অন্ধকারপ্রতিচ্ছন্নে ঘটে দীপ ইবাহিতঃ॥১/৩৯৮

অর্থাৎ, অন্ধকার ঘটে প্রদীপ রাখলে যেমন কোনো কাজ দেয় না। তেমনি অস্থানে পাণ্ডিত্য ঢাললেও ফল হয় না।

শিক্ষিত ব্যক্তি বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে আদর্শ মানুষে পরিণত হয়। শিক্ষা ছাড়া জাতির অগ্রযাত্রার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সমগ্র মানুষ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। রাজা হওয়া আর বিদ্বান হওয়া এক নয়। বিদ্বান ব্যক্তির কাছে সমস্ত বিশ্বই একটি পরিবার। রাজা শুধুমাত্র নিজদেশে সম্মানিত হন কিন্তু বিদ্বান সর্বত্র পূজিত। পঞ্চতন্ত্রকারের মতে –

বিদ্বত্ত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে॥২/৫৭

অর্থাৎ, বিদ্বান এবং রাজার তুলনা এক নয়। রাজা আপন দেশে সম্মানিত হন আর বিদ্বান সর্বত্র সম্মানিত হন।

অর্থব্যবস্থা

বর্তমান সময়ের মতো তৎকালীন সময়েও অর্থের গুরুত্ব ছিল। *পঞ্চতন্ত্র*-এর প্রতিটি তন্ত্রেই তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গল্পের অন্তরালে অর্থ উপার্জনের উপায়, অর্থশালী ব্যক্তির চরিত্র, অর্থের সংরক্ষণ, অর্থ ব্যয়ের নীতিমালা প্রভৃতি নানা অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে পঞ্চতন্ত্রকার

বর্ণনা করেছেন। প্রথম তন্ত্র মিত্রভেদের শুরুতেই অর্থ উপার্জনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন – টাকা পেতে হলে মানুষের ছয়টি পথ আছে। ভিক্ষে, রাজসেবা (সরকারি চাকরি), কৃষিকাজ, লেখাপড়া, মহাজনী আর ব্যবসা-বাণিজ্য।[৪]

এই পৃথিবীতে যার অর্থ আছে সকল লোকই তাকে ভালোবাসে। প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য না তবু লোকে তাকে প্রশংসা করে। কোনো গুণ না থাকলেও লোকে তাকে গুণী বলে সমাদর করে। মোট কথা অর্থ থাকলে দুনিয়ার কোনো কিছুই অসাধ্য থাকে না। মিত্রভেদ তন্ত্রে বর্ধমান নামে এক ব্যবসায়ীর অনেক টাকা আছে, কিভাবে আরো টাকা উপার্জন করা যায়, তাই তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছেন। যেমন –

যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যর্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ॥
ন সা বিদ্যা ন তদ্ দানং ন তচ্ছিল্পং ন সা কলা।
ন তৎ স্থৈর্যং হি ধনিনাং যাচকৈর্যন্ন গীয়তে॥
ইহ লোকে হি ধনিনাং পরোঽপি স্বজনায়তে।
স্বজনোঽপি দরিদ্রাণাং সর্বদা দুর্জনায়তে॥
অর্থেভ্যোঽপি হি বৃদ্ধেভ্যঃ সংবৃত্তেভ্যস্ততঃস্ততঃ।
প্রবর্তন্তে ক্রিয়াঃ সর্বাঃ পর্বতেভ্য ইবাপগাঃ॥
পূজ্যতে যদপূজ্যোঽপি যদগম্যোঽপি গম্যতে।
বন্দ্যতে যদবন্দ্যোঽপি সপ্রভাবো ধনস্য চ॥
অশনাদিন্দ্রিয়াণীব স্যুঃ কার্যাণ্যখিলান্যপি।
এতস্মাৎ কারণাদ্ বিত্তং সর্বসাধনমুচ্যতে॥
গতবয়সামপি পুংসাং যেষামর্থা ভবন্তি তে তরুণাঃ।
অর্থেন তু যে হীনা বৃদ্ধাস্তে যৌবনেঽপি স্যুঃ॥১/৩–৮,১০

অর্থাৎ, এ জগতে যার টাকা আছে তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষীর কোনো অভাব নেই। তার বন্ধু এ-ও-সে-ও, তারই মামা-মামী-মেসো-পিসিতে পৃথিবী ভরা। এই দুনিয়ায় সেই তো পুরুষ, সেই তো সবজান্তা। হেন কলা নেই, হেন শিল্প নেই, হেন বিদ্যা নেই, না হেন দান, না হেন ধৈর্য, যেটি ধনীর নেই।

অর্থ প্রার্থীদের এসব বিষয় নিয়ে প্রশংসার ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। টাকা থাকে যার, দুনিয়ায় তার পরও আপনজন। আর টাকা যার নেই, সে ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বজনও হয়ে যায় দুর্জন। বিরাট পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যেমন এমনিতেই ঝরনা নামে তেমনি টাকা থাকলে অনায়াসে সমস্ত কাজ হয়ে যায়। মোটেও যার মান-সম্মান নেই তবুও মান পায়। কাছে যাওয়ার মতো না, তবু লোকে যায়। অতি অখাদ্যে, তবু লোকে বা! বা! করে। আহা টাকার কী জাদুকরী শক্তি। পেটে কিছু খাবার গেলে যেমন ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয়, তেমনি কিছুই আটকায় টাকা থাকলে। তখন সব দিকই খোলা থাকে। তাই মহাজন টাকাকে বলছেন সর্বসাধন। বয়সে বৃদ্ধ হলেও যদি টাকা থাকে লোকে তাকে জোয়ান বলে। টাকা না থাকলে যৌবনেও বুড়ো বলে কটাক্ষ করে।

টাকার জন্য মানুষ কি না করতে পারে? বর্তমান সময়ের মত তৎকালীন সময়ে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। *পঞ্চতন্ত্রে* উল্লেখ আছে যে, টাকার আশায় মানুষ যে কোনো কঠিন কাজও করতে পারেন। কখনও শ্মশানে-মশানে পড়ে থাকেন, নিজের জন্মদাতা বাবা-মাকে পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারেন। যেমন –

অর্থার্থী জীবলোকোঽয়ং শ্মশানমপি সেবতে।
ত্যক্ত্বা জনয়িতারং স্বং নিঃস্বং গচ্ছতি দূরতঃ॥ ১/৯

অর্থাৎ, টাকার আশায় মানুষ শ্মশানেও পড়ে থাকেন। নিজের নিঃস্ব বাবাকে পর্যন্ত একা ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারেন দূর-দূরান্তে।

মূলত টাকার জন্য মানুষ সব করতে পারেন। অতি আপনজনকেও ত্যাগ করতে পারেন।

এই গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়গুলো হলো – অর্থ উপার্জনের জন্য কী ধরনের ব্যবসা করতে হয়, অর্থবান ব্যক্তির চরিত্র কেমন হয়, অর্থাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অবস্থা, অর্থ ভোগী ভৃত্যের অবস্থা, কোন ভৃত্যদের কখন কীভাবে অর্থ দিতে হবে, অর্থ আয় করা কেমন কষ্টকর, অর্থ কীভাবে ব্যয় করতে হবে, অর্থ ব্যয় করা কষ্টকর কিনা, অপরপক্ষে

অর্থের চেয়ে জীবন বড় কি না, এছাড়া অর্থের গতি-প্রকৃতি ও ধরন-ধারণ প্রভৃতি সম্পর্কে নানা অর্থনৈতিক তত্ত্ব পঞ্চতন্ত্রকার উপস্থাপন করেছেন। যেমন –

উপায়ানাং চ সর্বেষামুপায়ঃ পণ্যসংগ্রহঃ।
ধনার্থে শস্যতে হ্যেকস্তদন্যঃ সংশয়াত্মকঃ॥ ১/১২

অসমৈঃ সমীয়মানঃ সমৈশ্চ পরিহীয়মাণসৎকারঃ।
ধুরি যো ন যুজ্যমানস্ত্রিভিরর্থপতিং ত্যজতি ভৃত্যঃ॥ ১/৭৪

অপি সম্মানসংযুক্তাঃ কুলীনা ভক্তিতৎপরাঃ।
বৃত্তিভঙ্গান্নৃহীপালং ত্যজন্ত্যেব হি সেবকাঃ॥ ১/১৫৪

কালাতিক্রমণং বৃত্তের্যো ন কুর্বীত ভূপতিঃ।
কদাচিত্তং ন মুঞ্চন্তি ভর্ৎসিতা অপি সেবকাঃ॥ ১/১৫৫

অর্থানামর্জনং দুঃখমর্জিতানাং চ রক্ষণে।
আয়ে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থাঃ কষ্টসংশ্রায়াঃ॥ ১/১৬৪

অর্থাৎ, অর্থ উপার্জনের সব উপায়ের মধ্যে সেরা বলে যেটি বিবেচিত করা হয়, সেটি হলো পণ্য-সংগ্রহ অর্থাৎ মাল জড়ো করা। (বর্তমান সময়ে যাকে বলে মজুতদারি ব্যবসা।) এ ব্যবসায় লাভ নিশ্চিত। এছাড়া আর সব উপায়ই হলো অনিশ্চিত। তিনটি কারণে ভৃত্য ত্যাগ করে অর্থশালীকে। কারণ তিনটি হলো – যারা যোগ্য নয় তাদের সঙ্গে সমান করলে, সমানদের সঙ্গে সমান সম্মান দেখানো ক্রমশ কমিয়ে দিলে এবং যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও দায়িত্বপূর্ণ পদ না দিলে। উচ্চপদস্থ কুলীন এবং অনুরক্ত সেবকরাও যদি ঠিকমতো বেতন না পায়, তাহলে তারাও রাজাকে ছেড়ে চলে যাবে। যে রাজা ঠিক সময়ে বেতন দেন (বেতন দেওয়ার সময়টি অতিক্রম করেন না), সেবকরা বকুনি খেয়েও তাঁকে কখনো ত্যাগ করেন না। টাকা উপার্জন করতে কষ্ট, উপার্জন করা টাকা সামলে রাখতে আরও কষ্ট, আয়ে কষ্ট, ব্যয়ে কষ্ট, খালি কষ্ট আর কষ্ট। এজন্য টাকাকে ধিক্।

পঞ্চতন্ত্রে নারীদের অর্থলোলুপতার চিত্র স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। নারীরা অর্থের লোভে অনেক কিছু করতে পারে। এখানে পঞ্চতন্ত্রকার বুঝিয়েছেন যে, তৎকালীন সময়ে নারীরা অর্থের মোহে মোহিত ছিল। যেমন –

সমুদ্রবীচীব চলস্বভাবাঃ সন্ধ্যাভ্ররেখেব মুহূর্তরাগাঃ।
স্ত্রিয়ঃ কৃতার্থাঃ পুরুষং নিরর্থং নিষ্পীড়িতালক্তকবৎ ত্যজন্তি॥১/১৯৫

অর্থাৎ, স্ত্রীলোকের স্বভাব সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চঞ্চল, সন্ধ্যার মেঘের রেখার মতো ক্ষণস্থায়ী, স্বার্থ উদ্ধার হলেই টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। অপরদিকে অর্থহীন পুরুষকে নেঙড়ানো আলতার মতোই তাচ্ছিল্য করে চলে যায়।

অর্থের প্রতি মায়া বা ভালোবাসা সকল মানুষেরই রয়েছে। কিন্তু প্রাণ যখন বিপন্ন হয় তখন অর্থের জন্য মায়া করা ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে করটকের উক্তিতে পঞ্চতন্ত্রকার বলেছেন –

যো মায়াং কুরুতে মূঢ়ঃ প্রাণত্যাগে ধনাদিষু।
তস্য প্রাণাঃ প্রণশ্যন্তি তৈর্নষ্টৈর্নষ্টমেব চ॥ ১/৩৬৩

অর্থাৎ, প্রাণ যখন বিপন্ন হয় তখন পয়সার মায়া করা মূর্খতা, সে ক্ষেত্রে তার প্রাণও যায় আর প্রাণ গেলে টাকা-কড়ি দিয়েই বা কি হয়?

অর্থ সম্পর্কে স্পর্শকাতর বিষয় হলো – এক জায়গায় বেশি অর্থ দেখলে মানুষের মন অন্য রকম হয়ে যায়। সে যত বড় উচ্চ মাপের মানুষ অথবা ধার্মিক মানুষ হন না কেন? বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিকভাবে পুরোপুরি সত্য। এ সম্পর্কে পঞ্চতন্ত্রকার বলেছেন –

ন বিত্তং দর্শয়েৎ প্রাজ্ঞঃ কস্যচিৎ স্বল্পমপ্যহো।
মুনেরপি যতস্তস্য দর্শনাচ্চলতে মনঃ॥ ১/৪০৪

অর্থাৎ, প্রাজ্ঞ কারো সামনে টাকা কম হলেও খুলে রাখবে না কেননা ওটি দেখলে সন্ন্যাসীর মনও টলে যায়।

এক ব্যাধের উক্তিতে তৎকালীন সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার এক বিপজ্জনক চিত্র পাওয়া যায়। ব্যাধ অর্থকে ভয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন –

পরাঙ্মুখে বিধৌ চেৎ স্যাৎ কথঞ্চিদ্ দ্রবিণোদয়ঃ।
তৎ সোঽন্যদপি সংগৃহ্য যাতি শঙ্খনিধির্যথা ॥২/১১

অর্থাৎ, টাকা এমন একটি জিনিস কোনোমতে যদি সেটি আসে আর যদি বিধি বাম হয়, সে টাকা তো যায়ই, সাথে আরো কিছু নিয়ে যায় অর্থাৎ এ যেন শঙ্খনিধি। তাই টাকার কারণেই অনেক বিপদের আশংকা থাকে।

মিত্রপ্রাপ্তিকম্ তন্ত্রে 'হিরণ্যকের আত্মকথা' শীর্ষক গল্পে অর্থের নানা প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের শ্রীমহাদেবের মন্দিরে হিরণ্যক নামে এক ইঁদুর তাম্রচুর নামক এক পরিব্রাজকের নাগদন্তে রাখা খাবার রোজ রোজ খেয়ে ফেলে। পরিব্রাজক সাধ্যমতো পাহারা দিয়েও তা রক্ষা করতে পারেন না। বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে শব্দ করেও কোনো কাজ হয় না। ইঁদুর নিয়মিতভাবে খাবার খেয়েই যাচ্ছে। তাম্রচুর এ ব্যাপারে একেবারে হতাশ। একদিন তাঁর বন্ধু বৃহৎস্ফিক্ নামক এক পরিব্রাজক তীর্থযাত্রার জন্য বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর মঠে এলেন। তারপর রাতে দুজন বিছানায় শুয়ে ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করছেন। এমন সময় ইঁদুরটা লাফ দিয়ে চড়ে পাত্রের খাবার খেতে থাকে । বাঁশ দিয়ে অনবরত পেটাতে থাকলেও ইঁদুরটিকে দমানো গেল না। তখন বৃহৎস্ফিক্ বললেন – ' নূনং নিধানস্যোপরি তস্য বিলম্। নিধানোষ্মণা প্রকূর্দতে।'[৫] অর্থাৎ, ওর গর্তটা নিশ্চই টাকার ওপরে। টাকার গরমেই ও এত লম্ফ-ঝম্প করছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় এ জগতে যার যত বেশি টাকা তার দর্প-অহংকারও তত বেশি। তখন কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করতেও দ্বিধাবোধ করে না। তৎকালীন সময়ে এ বিষয়টি যেমন ছিল, বর্তমান সময়ে এ বিষয়টি আরও প্রবল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকার অর্থবানদের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে অর্থ মহৎ উদ্দেশ্যে দান করতে পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন –

উষ্মাপি বিত্তজো বৃদ্ধিং তেজো নয়তি দেহিনাম্।
কিং পুনস্তস্য সম্ভোগস্ত্যাগকর্মসমন্বিতঃ॥
গ্রাসাদপি তদর্ধং চ কস্মান্নো দয়ীতেহর্থিষু।
ইচ্ছানুরূপো বিভবঃ কদা কস্য ভবিষ্যতি॥
অকৃতত্যাগমহিম্নো মিথ্যা কিং রাজরাজশব্দেন।
গোপ্তারং ন নিধীনাং কথয়ন্তি মহেশ্বরং বিবুধাঃ॥২/৬৯,৭১,৭৪

অর্থাৎ, শুধুমাত্র টাকার গরমেই মানুষের তেজ বেড়ে যায়। সে টাকা দান-ধ্যান করে ভোগ করলে তেজ আরো বাড়ে। ইচ্ছেমতো এ জগতে কারোর টাকা-পয়সা হয়নি, তাই যেটুকু সামর্থ্য সে অনুসারে বাঞ্ছিতদের সামান্য হলেও দেওয়া উচিত। কেননা যিনি ত্যাগ করতে জানেন তিনিই এ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ, তিনি রাজারও রাজা। আর যিনি ধন উপার্জন করে সঞ্চয় করে সর্বসময় পাহারা দেন, মহেশ্বর তাকে অবিদ্বান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের শ্রীমহাদেবের মন্দিরে পরিব্রাজক হিসেবে আগত বৃহৎস্ফিকের উক্তিতে অর্থের কুপ্রভাবের পরিচয় মেলে। যেমন –

যদ্যুৎসাহী সদা মর্ত্যঃ পরাভবতি যজ্জনাৎ।
যদুদ্ধতং বদেদ্বাক্যং তৎ সর্বং বিত্তজং বলম্॥
অর্থেন বলবান্ সর্বো অর্থযুক্তঃ স পণ্ডিতঃ।
পশ্যৈনং মূষিকং ব্যর্থং স্বজাতেঃ সমতাং গতম্॥২/৮৬-৮৭

অর্থাৎ, এই জগতে যার টাকা আছে, তার শক্তিই অন্য রকম। সেসব লোক সর্বদাই উৎসাহে টগবগ করে, অন্যকে দূর ছাই করে দিয়ে দম্ভ করে বেড়ায়। মূলত এসবই করে টাকার জোরে। টাকা থাকলেই লোকে বলবান, টাকা থাকলেই পণ্ডিত। যেমন ইঁদুরটা টাকা হারানো মাত্র জাত ভাইদের সঙ্গে সমান হয়ে গেল।

বৃহৎস্ফিকের উক্তিতে অর্থহীন ব্যক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে আরও ধারণা পাওয়া যায়। যেমন –

দংষ্ট্রাবিরহিতঃ সর্পো মদহীনো যথা গজঃ।
তথার্থেন বিহীনোঽত্র পুরুষো নামধারকঃ॥২/৮৮

অর্থাৎ, দাঁত বিহীন সাপ আর মদ (লালা) বিহীন হাতি যেমন মূল্যহীন, তেমনি অর্থবিহীন পুরুষ শুধু নামেই। বাস্তবে অন্তঃসারশূন্য।

একই গল্পে অর্থ না থাকলে কি অবস্থা হয় হিরণ্যকের উক্তিতে ভগ্ন হৃদয়ের বিলাপ পঞ্চতন্ত্রকার অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন –

অর্থেন চ বিহীনস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ।
উচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা॥
যথা কাকযবাঃ প্রোক্তা যথারণ্যভবাস্তিলাঃ।
নামমাত্রা ন সিদ্ধৌ হি ধনহীনাস্তথা নরাঃ॥
সন্তোঽপি ন হি রাজন্তে দরিদ্রস্যেতরে গুণাঃ।
আদিত্য ইব ভূতানাং শ্রীর্গুণানাং প্রকাশিনী॥
ন তথা বাধ্যতে লোকে প্রকৃত্যা নির্ধনো জনঃ।
যথা দ্রব্যাণি সম্প্রাপ্য তৈর্বিহীনঃ সুখে স্থিতঃ॥
শুষ্কস্য কীটখাতস্য বহ্নিদগ্ধস্য সর্বতঃ।
তরোরপ্যুষরস্থস্য বরং জন্ম ন চার্থিনঃ॥
শঙ্কনীয়া হি সর্বত্র নিষ্প্রতাপা দরিদ্রতা।
উপকর্তুমপি প্রাপ্তং নিঃস্বং সন্ত্যজ্য গচ্ছতি॥
উন্নম্যোন্নম্য তত্রৈব নির্ধনানাং মনোরথাঃ।
হৃদয়েষ্বেব লীয়ন্তে বিধবাস্ত্রস্তিনাবিব॥
ব্যক্তেঽপি বাসরে নিত্যং দৌর্গত্যতমসাবৃতঃ।
অগ্রতোঽপি স্থিতো যত্নান্ন কেনাপীহ দৃশ্যতে॥২/৮৯-৯৬

অর্থাৎ, অর্থহীন অল্পবুদ্ধি পুরুষের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। যেমন গরমকালে ছোটো নদীগুলো শুকিয়ে যায়, অর্থহীন ব্যক্তির অবস্থা তেমনি হয়। অপরদিকে যেমন কাকযব আর বুনো তিল শুধু নামেই আছে, কোনো কাজে লাগে না, তেমনি ধনহীন মানুষও। দরিদ্রের অন্য গুণ থাকলেও নিষ্প্রভ। সূর্য যেমন সৃষ্টিকে ফুটিয়ে তোলে, তেমনি টাকা গুণকে প্রকাশিত করে। গরিব হয়েই যে জন্মেছে, এ দুনিয়ায় তার তত কষ্ট নেই। কিন্তু

যে একসময় ধনসম্পত্তি নিয়ে সুখে থেকেছে, তার যদি সেসব চলে যায় তাহলে তারমতো হতভাগা আর কেউ নেই। আগাগোড়া আগুনে পোড়া, পোকায় খাওয়া, শুকনো একটা উষর জমির গাছ হয়ে জন্মানোও ভালো, কিন্তু অর্থপ্রার্থী হয়ে নয়। গরিবের কোনো দাপট নেই, সে সকলের সন্দেহের পাত্র। গরিব মানুষ যদি উপকারও করতে আসে, তাও লোকে তাকে গুরুত্ব না দিয়ে উঠে চলে যায়। বিধবা নারীর কুচযুগের মতো গরিবের সাধও বারংবার বুকে ওঠে আর বুকেই মিলে যায়। দারিদ্র্যের অন্ধকারে যে আচ্ছন্ন, সে পরিপূর্ণ দিবালোকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও অনেক চেষ্টা করেও কেউ তাকে দেখতে পায় না।

অর্থহীন ব্যক্তির সাথে মানুষ কেমন ব্যবহার করে হিরণ্যকের ভৃত্যদের কথায় তা আরো ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন –

যৎসকাশান্ন লাভঃ স্যাৎ কেবলাঃ স্যুর্বিপত্তয়ঃ।
স স্বামী দূরতস্ত্যাজ্যো বিশেষানুজীবিভিঃ॥২/৯৭

অর্থাৎ, যার কাছ থেকে কোনো ধন-সম্পদ জুটবে না কেবল বিপদই বাড়বে, বিশেষত ভৃত্যরা সে প্রভুকে ত্যাগ করে দূরে থাকবে এটাই স্বভাবিক।

পরর্তীতে টাকা-পয়সা হারিয়ে হিরণ্যকের বেদানার্ত হৃদয়ের আকুতি পঞ্চতন্ত্রকার নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করেছেন –

মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং মৈথুনমপ্রজম্।
মৃতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং মৃতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ॥২/৯৮

অর্থাৎ, যে শ্রাদ্ধে কোনো বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আসেনি, সে শ্রাদ্ধে প্রাণ মেলে না। আবার যে মিলনে সন্তান হয় না, সেটিও অর্থহীন মিলনে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে দানহীন যজ্ঞও ফলহীন হয়ে থাকে। আর যার অর্থ নেই, সে মৃত ব্যক্তির সামিল।

হিরণ্যকের টাকা অপহৃত হওয়ার পর তার ভৃত্যরা তার শত্রুর সেবক হয়ে গেল। তাকে দেখে নানা ধরনের কটাক্ষ করতে থাকলো। তখন সে একা-একা নিবিষ্ট মনে নানা

ধরনের চিন্তা করে এবং হৃত টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য কৌশল আটে। কেননা টাকার মায়া বড়ই কঠিন। তাই টাকার শোকে দারুণ মর্মপীড়ায় সে বলে ওঠে –

ব্যথয়ন্তি পরং চেতো মনোরথশতৈর্জনাঃ।
নানুষ্ঠানৈর্ধনৈর্হীনাঃ কুলজা বিধবা ইব॥
দৌর্গত্যং দেহিনাং দুঃখমপমানকরং পরম্।
যেন স্বৈরপি মন্যন্তে জীবন্তোঽপি মৃতা ইব॥
দৈন্যস্য পাত্রতামেতি পরাভূতেঃ পরং পদম্।
বিপদামাশ্রয়ঃ শশ্বদ্দৌর্গত্যকলুষীকৃতঃ॥
লজ্জন্তে বান্ধবাস্তেন সম্বন্ধং গোপয়ন্তি চ।
মিত্রাণ্যমিত্রতাং যান্তি যস্য ন স্যুঃ কপর্দকাঃ॥
মূর্তং লাঘবমেবৈতদপায়ানামিদং গৃহম্।
পর্যায়ো মরণস্যায়ং নির্ধনত্বং শরীরিণাম্॥
অজাধুলিরিব ত্রস্তৈর্মার্জনীরেণুবজ্জনৈঃ।
দীপখট্টোত্থচ্ছায়েব ত্যজ্যতে নির্ধনো জনৈঃ॥
শৌচাবষ্টিয়াপ্যস্তি কিঞ্চিৎ কার্যং ক্বচিন্মৃদা।
নির্ধনেন জনেনৈব ন তু কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্॥
অধনো দাতুকামোঽপি সম্প্রাপ্তো ধনিনাং গৃহম্।
মন্যতে যাচকোঽয়ং ধিগ্দারিদ্র্যং খলু দেহিনাম্॥২/৯৯-১০৬

অর্থাৎ, সৎকুলজাতা বিধবার মতো ধনহীনের সাধের কোনোটাই কাজে পরিণত হয় না। শুধু জন্মায় দারুণ কষ্ট। আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত ধরে নেয় সে জীয়ন্তে মরা। অপমান দুঃখ তার পিছু ছাড়েনা। দারিদ্র-কুলষিত ব্যক্তি সর্বদাই দৈন্যের পাত্র হয়ে চরম লাঞ্ছনা পায়, যত বিপদ সব এসে জোটে তার ভাগ্যে। মূর্ত অগৌরব এই যে, বিপদ তাকে ঘিরে ধরে, মৃত্যুই যেন তার একমাত্র প্রাপ্য। যার নেই কপর্দক বা অর্থ, তার বন্ধু শত্রু হয়ে যায়। লজ্জা পেয়ে আত্মীয়দের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে। ছাগলীদের ওড়ানো বা ঝাঁটায় ওড়া ধুলো বা প্রদীপের আলোয় পড়া খাটের ছায়া দেখে লোকে যেমন শশব্যস্ত হয়ে সরে যায়, তেমনি করে ধনহীনকে সকলে এড়িয়ে চলে। শৌচাবিশিষ্ট মৃত্তিকা দিয়েও হয়তো কখনো কিছু কাজ হয়, কিন্তু নির্ধন মানুষের যেন কোনো প্রয়োজনই নেই। নির্ধন লোক ধনীর

বাড়িতে যদি কিছু দিতেও যায়, তাহলে তারা মনে করে, নিশ্চয় কিছু চাইতে এসেছে। মানুষের দারিদ্র্যকে সত্যিই ধিক্।

পূর্বে বলা হয়েছে অর্থ থাকলে সবই করা সম্ভব, অপরপক্ষে অর্থই অনর্থের মূল কেননা, অর্থ না থাকলে যেমন কষ্টের শেষ নেই, তেমনি অর্থ থাকলেও নানা বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। কারণ অর্থ বা ধনসম্পত্তি এত নিষ্ঠুর যার কারণে মানুষ যমের বাড়ি পর্যন্ত চলে যায়। বর্তমান সময়ের প্রচলিত অতি বাস্তব বিষয়টির কথা তৎকালীন সময়েও বিষ্ণুশর্মা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি অর্থকে ভয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যেমনটি মন্থরকের উক্তিতে ফুটে উঠেছে –

যথামিষং জলে মৎস্যৈর্ভক্ষ্যতে শ্বাপদৈর্ভুবি।
আকাশে পক্ষিভিশ্চৈব তথা সর্বত্র বিত্তবান্॥
নির্দোষমপি বিত্তাঢ্যং দোষৈর্যোজয়তে নৃপঃ।
নির্ধনঃ প্রাপ্তদোষেঽপি সর্বত্র নিরুপদ্রবঃ॥
অর্থানামর্জনে দুঃখমর্জিতানাং চ রক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ কষ্টসংশ্রয়ান্॥
অর্থার্থী যানি কষ্টানি মূঢ়েঽয়ং সহতে জনঃ।
শতাংশেনাপি মোক্ষার্থী তানি চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥২/১১৯-১২২
কৃপণেঽপ্যকুলীনেঽসি সজ্জনৈর্বর্জিতঃ সদা।
সেব্যতে স নরো লোকে যস্য স্যাদ্ বিত্তসঞ্চয়ঃ॥২/১৩৯

অর্থাৎ, মাংস যেমন জলের মাছেও খায়, আবার ডাঙ্গায় পশু-পাখি-জীব-জন্তু সব প্রাণিই খায়, তেমনি করে ধনবানকে সর্বত্র সবাই ছিড়ে খায়। ধনী যদি নির্দোষও হয়, তবু রাজা দোষারোপ করে। নির্ধন দোষ করলেও কোথাও তার সাজা নেই। অর্থ উপার্জনে কষ্ট, অপরদিকে উপার্জিত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে আরো কষ্ট। তাই অর্থ আয়ে কষ্ট, ব্যয়ে কষ্ট, নষ্ট হলে কষ্ট, ধিক্- অর্থ যেন কষ্টের নিকেতন। নির্বোধ লোকেরা টাকার জন্য সবসময় কষ্ট সহ্য করে। কষ্ট করে টাকা জমা করে, কঞ্জুষে পরিণত হয়। সে নিকট

আত্মীয়দেরকেও পাত্তা দেয় না। অতি সাধারণ পর্যায়ের লোক হয়েও সে অর্থহীন সকলকে হেয় প্রতিপন্ন করে, যা সে টাকা না থাকলে করতে পারত না।

পরবর্তীতে সোমিলক হিরণ্যককে অর্থের জন্য শোক না করে সান্তনা বাক্যে অর্থ দান ও ভোগ করাসহ নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। আর এতেই জীবনে শান্তি মেলে। নিম্নে সে বিষয়টি উল্লেখ করা হলো –

অগ্নিহোত্রফলা বেদাঃ শীলবিত্তফলং শ্রুতম্।
রতিপুত্রফলা দারা দত্তভুক্তফলং ধনম্॥
গৃহমধ্যনিখাতেন ধনেন ধনিনো যদি।
ভবামঃ কিং ন তেনৈব ধনেন ধনিনো বয়ম্॥
উপার্জিতানামর্থানাং ত্যাগ এব হি রক্ষণম্।
তড়াগোদরসংস্থানাং পরীবাহ ইবাম্ভসাম্॥
দাতব্যং ভোক্তব্যং ধনবিষয়ে সঞ্চয়ো ন কর্তব্যঃ।
পশ্যেহ মধুকরীণাং সঞ্চিতমর্থং হরন্ত্যন্যে॥
দানং ভোগো নাশস্তিস্রো গতয়ো ভবন্তি বিত্তস্য।
যো ন দদাতি ন ভুঙ্‌ক্তে তস্য তৃতীয়া গতির্ভবতি॥২/১৫০-১৫৪

অর্থাৎ, বেদের ফল অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ। পড়াশুনার ফল ধন-চরিত্র। পত্নীর ফল প্রেম ও সন্তান লাভ তেমনি টাকার ফল ভোগ আর দান। বাড়িতে টাকা গচ্ছিত রেখে যদি ধনী লোক হওয়া যায়, তবে সে টাকাতে সকলেই ধনাঢ্য হতে পারতো। উপার্জিত অর্থ দান করাই হলো মূল পরিরক্ষণ। জলাশয়ের মধ্যেকার জল নালা দিয়ে বের করে দিলে তবেই বিশুদ্ধ থাকে। তেমনি টাকা ভোগ করলে, দান করলেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। সঞ্চয়ে কোনো পরম প্রাপ্তি নেই। যেমন মধুমক্ষীকাদের সঞ্চিত মধু অন্যেরা চুরি করে নিয়ে যায়। দান, ভোগ আর নাশ – এই হলো তিনটি গতি টাকার। যে দান করে না, ভোগও করে না, বিনাশই তার একমাত্র গতি।

'প্রাপ্তব্যমর্থম্' গল্পে লঘুপতনকের উক্তিতে অর্থলোভী ব্যক্তির মানসিক অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে –

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥২/১৫৬

অর্থাৎ, ধনের লোভে যারা ছোটে, তাদের কোথায়ও শান্তি মেলে না। সন্তোষই শান্তির মূল, চিত্তের আরাম, মননের বিকাশ।

একই তন্ত্রে 'সোমিলক গুপ্তধন ও উপভুক্তধন' গল্পে অর্থ হারানো যে খুবই কষ্টকর মন্থরকের উক্তিতে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে –

দয়িতজনবিপ্রয়োগো বিত্তবিয়োগশ্চ কেন সহ্যাঃ স্যুঃ।
যদি সুমহৌষধকল্পো বয়স্যজনসঙ্গমো ন স্যাৎ॥২/১৭৯

অর্থাৎ, প্রিয়জনের বিরহ ও অর্থনাশ কে সহ্য করতে পারে? তবে সহ্য করা যায় যদি ভালো বন্ধু থাকে।

কাকোলূকীয় তন্ত্রে 'হাতির দল ও খরগোসেরা' গল্পে পাখিদের উক্তিতে অর্থের ব্যয়ের বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে – নিজেকে এবং পত্নীকে বাঁচানোর জন্য টাকা ব্যয়ের দিকে তাকানো যাবে না। তবে কখনও কখনও পত্নীকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজেকে সর্বদা প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন –

আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্ দারান্ রক্ষেদ্ ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি॥৩/৮৫

অর্থাৎ, বিপদের জন্য টাকা সঞ্চয় কর। পত্নীকে বাঁচাবে তাতে টাকা যায় যাক। পত্নী যাক টাকা যাক, নিজেকে সর্বদা বাঁচবে।

অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে মণিভদ্রের উক্তিতে অর্থহীন ব্যক্তির কি অবস্থা হয় সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে –

শীলং শৌচং ক্ষান্তির্দাক্ষিণ্যং মধুরতা কুলে জন্মে।

ন বিরাজন্তি হি সর্বে বিত্তবিহীনস্য পুরুষস্য॥
মানো বা দর্পো বা বিজ্ঞানং বিভ্রমঃ সুবুদ্ধির্বা।
সর্বং প্রণশ্যতি সমং বিত্তবিহীনো যদা পুরুষঃ॥
প্রতিদিবসং যাতি লয়ং বসন্তবাতাহতেব শিশিরশ্রীঃ।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামপি কুটুম্বভরচিন্তয়া সততম্॥
নশ্যতি বিপুলমতেরপি বুদ্ধিঃ পুরুষস্য মন্দবিভবস্য।
ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রেন্ধনচিন্তয়া সততম্॥
গগনমিব নষ্টতারম্ শুষ্কং সরঃ শ্মশানমিব রৌদ্রম্।
প্রিয়দর্শনমপি রুক্ষং ভবতি গৃহং ধনবিহীনস্য ॥
ন বিভাব্যন্তে লঘবো বিত্তবিহীনাঃ পুরেঽপি নিবসন্তঃ।
সততং জাতবিনষ্টাঃ পয়সামিব বুদ্বুদাঃ পয়সি॥৫/২-৭
বরং বনং ব্যাঘ্রগজাদিসেবিতং জলেন হীনং বহুকণ্টকাবৃতম্।
তৃণানি শয্যা পরিধানবল্কলং ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবিতম্॥
স্বামী দ্বেষ্টি সুসেবিতেঽপি সহসা প্রোজ্ঝন্তি সদ্বান্ধবা
রাজন্তে ন গুণাস্ত্যজন্তি তনুজাঃ স্ফারীভবন্ত্যাপদঃ।
ভার্যা সাধুসুবংশজাপি ভজতে নো যান্তি মিত্রাণি চ
ন্যায়ারোপিতবিক্রমাণ্যপি নৃণাং যেষাং ন হি স্যাদ্ ধনম্॥
শূরঃ সুরূপঃ সুভগশ্চ বাগ্মী শস্ত্রাণি শাস্ত্রাণি বিদাঙ্করোতু।
অর্থং বিনা নৈব যশশ্চ মানং প্রাপ্নোতি মর্ত্যেঽত্র মনুষ্যলোকে॥
তানীন্দ্রিয়াণ্যবিকলানি তদেব নাম স বুদ্ধিরপ্রতিহতা বচনং তদেব।
অর্থোষ্মণা বিরহিতঃ পুরুষঃ স এব বাহ্যঃ ক্ষণেন ভবতীতি বিচিত্রমেতৎ॥৫/২৩-২৬

অর্থাৎ, যার টাকা নেই সে মানুষের চরিত্রে সাধুতা, ক্ষমা, ভদ্রতা, মাধুর্য, আভিজাত্য- এসব কিছুই আর যেন দেখা যায় না। মানুষের টাকা যখন যায়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মসম্মান গর্ব জ্ঞান বিভ্রম এবং সুবুদ্ধি সব চলে যায়। অনবরত পরিবার প্রতিপালনের চিন্তায় বুদ্ধিমানেরও বসন্তবাতাহত শীত-শ্রীর মতো বুদ্ধি দিন দিন লোপ পেতে থাকে। আর্থিক দুরবস্থা হলে দিনরাত ঘি, তেল, নুন, চাল, কাপড়, জ্বালানি প্রভৃতির চিন্তা করতে করতে অতি বড়ো প্রতিভাবানেরও প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়। ধন চলে গেলে সুন্দর সুন্দর

বাড়ি-ঘরও শোভাহীন হয়ে পড়ে, যেমন তারাহীন আকাশ, শুষ্ক পুকুর, ভয়ঙ্কর শ্মশান। সামনে থেকেও তবু ধনহীন তুচ্ছ, চোখে পড়ে না, তারা জীয়ন্তে মরা, যেমন – বুদ্বুদ জলে উঠে জলেই মিশে যায়। বাঘ-হাতি পরিবেষ্টিত গভীর জঙ্গল, প্রতি পদে পদে কাঁটা, ঘাসের বিছানা, পরনেতে বল্কল সেও বরং ভালো তবু ভালো নয় ধনহীন হয়ে আত্মীয়দের মাঝে বেঁচে থাকা। ভালো কাজ, গুণাবলী প্রভুর কাছে কোনো চমক দেয়না, ভালো আত্মীয় উধাউ হয়ে যায় বিপদের দিনে, নীতিবান বন্ধু, আপন পুত্র, ভার্যাও ছেড়ে যায় যদি টাকা না থাকে। বীর সুপুরুষ, শান্ত, বাগ্মী, শস্ত্র-শাস্ত্র জানা গুণীজন যেই হোক না কেন টাকা না থাকলে মান যশ কিছুই মেলে না এই পৃথিবীতে। বিচিত্র ব্যাপার হলো এই যে, অপ্রতিহত বুদ্ধিমান লোক, সক্রিয় ইন্দ্রিয়যান টাকার অভাবে বিকল হয়ে যায়। তাকে একঘরে করা হয়।

একই তন্ত্রে মণিভদ্রের উক্তিতে অর্থশালী ব্যক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

যেমন –

সুকুলং কুশলং সুজনং বিহায় কুলকুশলশীলবিকল্পেঽপি।
আঢ্যে কল্পতরাবিব নিত্যং রজ্যন্তি জননিবহাঃ॥
বিফলমিহ পূর্বসুকৃতং বিদ্যাবন্তোঽপি কুলসমুদ্ভূতাঃ।
যস্য যদা বিভবঃ স্যাৎ তস্য তদা দাসতাং যান্তি॥
লঘুরয়মাহ ন লোকঃ কামং গর্জন্তমপি পতিং পয়সাম্ ।
সর্বমলজ্জাকরমিহ যৎ কুর্বন্তীহ পরিপূর্ণাঃ॥৫/৮-১০
তৃষ্ণে দেবি নমস্তুভ্যং যয়া বিত্তান্বিতা অপি।
অকৃত্যেষু নিয়োজ্যন্তে ভ্রাম্যন্তে দুর্গমেষ্বপি॥৫/৭৭

অর্থাৎ, লোকজন দিন-রাত্রি কুলীন–কুশল সুজনকে ছেড়ে কুলহীন–শীলহীন অপটু ধনীর খোসামুদি করে। যেন সে কল্পতরু। তুমি কী ভালো করেছো, তা দেখবে না জগৎ সংসার। যাঁরা বিদ্বান, কুলীন, তাঁরাও যখুনি যার টাকা হয়, তখুনি তাঁর খেতমত করতে লেগে যান। সমুদ্র যেমন ইচ্ছে মতো গর্জন করে যায়, তবুও লোকে তাকে হালকা বলে না। কেননা এজগতে যার ভাণ্ডার ভরা আছে, সে যাই করুক না কেন তার জন্য কোনো

কিছু বেমানান নয়, লজ্জার নয়। যাদের টাকা আছে তারাও লেগে পড়ে অকাজে, অর্থাৎ অর্থের আশায় দুর্গম ঘুরে বেড়ায়, হে দেবী তৃষ্ণা, নমস্কার করি তোমার পায়।

অর্থ উপার্জনের জন্য কি করতে হবে সে সম্পর্কেও পঞ্চতন্ত্রকার পরামর্শ দিয়েছেন –

দুষ্প্রাপ্যাণি বহুনি চ লভ্যন্তে বাঞ্ছিতানি দ্রবিণানি।
অবসরতুলিতাভিরলং তনুভিঃ সাহসিকপুরুষাণাম্॥৫/২৮

অর্থাৎ, দুঃসাহসী পুরুষেরা যখন যা প্রয়োজন সেভাবেই দেহকে খাটায়। পরিশ্রমেই অনেক দুষ্পাপ্য এবং বাঞ্ছিত ধন পেয়ে থাকেন।

অর্থ ছাড়া জগতে কিছুই হয় না সে কথা ঠিক আছে। কিন্তু অর্থ না থাকলে দরিদ্রতা পঞ্চতন্ত্রকার পরবর্তীতে সে কথা অস্বীকার করেছেন, তাঁর মতে আত্মসম্মানহীনভাবে বেঁচে থাকাটাই দরিদ্রতা। যেমন –

দরিদ্র্যস্য পরা মূর্তির্যন্মানদ্রবিণাল্পতা।
জরদ্গাবধনঃ শর্বস্তথাপি পরমেশ্বরঃ॥২/১৬৩

অর্থাৎ, যদি আত্মসম্মান রূপ ধন কম থাকে সেই হলো দারিদ্র্যের চরম অবস্থা। যেমন একটিমাত্র বুড়ো ষাঁড়কে সম্বল একমাত্র আত্মসম্মানবোধের কারণে শিব সব দেবতার সেরা।

এভাবে পঞ্চতন্ত্রকার তৎকালীন সময়ের অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন বর্তমান সময়েও তার বাস্তবতা রয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসা একটি ভদ্রোচিত পেশা। বর্তমান সময়ে ব্যবসার গুরুত্ব ও প্রচলন অনেকাংশে উল্লেখযোগ্য। এটি এখন বহু মানুষের জীবিকা অর্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। তৎকালীন সময়েও ব্যবসার গুরুত্ব ছিল। পঞ্চতন্ত্রকার তৎকালীন সময়ে ব্যবসার গুরুত্ব গ্রন্থের

শুরুতেই আলোচনা করেছেন। পৃথিবীতে ব্যবসায় চেয়ে ভালো পেশা আর কিছু নাই। ধন উপার্জনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ব্যবসা। ব্যবসায় নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা যায়। বিষ্ণুশর্মা মিত্রভেদে সাত রকমের ব্যবসার কথা বলেছেন। যেমন – 'গন্ধদ্রব্যের ব্যবসা, নিক্ষেপ-প্রবেশ, যৌথ ব্যবসা, পরিচিত ক্রেতার জন্য দোকান দেওয়া (দোকানদারী), মিথ্যে ক্রয়কথন, কূট দাড়িপাল্লায় ওজন, বিদেশ থেকে জিনিস নিয়ে আসা'।[৬] অপরদিকে কোন ব্যবসা ভালো, কোন ব্যবসা মন্দ, কোন ব্যবসায় বেশি উপার্জন করা যায়, কোন ব্যবসায় ক্রেতা ও বিক্রেতার চারিত্রিক অবস্থা কেমন হয়, সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। যেমন –

কৃতা ভিক্ষারেকৈর্বিতরতি নৃপো নোচিতমহো
কৃষিঃ ক্লিষ্টা বিদ্যা গুরুবিনয়বৃত্ত্যাতিবিষমা।
কুসীদাদ্ দারিদ্র্যং পরকরগতগ্রন্থিশমনা–
ন্ন মন্যে বাণিজ্যাৎ কিমপি পরমং বর্তনমিহ॥
উপায়ানাং চ সর্বেষামুপায়ঃ পণ্যসংগ্রহঃ।
ধনার্থে শস্যতে হ্যেকস্তদন্যঃ সংশয়াত্মকঃ॥
পণ্যানাং গান্ধিকং পণ্যং কিমন্যৈঃ কাঞ্চনাদিভিঃ।
যত্রৈকেন চ যৎ ক্রীতং তচ্ছতেন প্রদীয়তে॥
নিক্ষেপে পতিতে হর্ম্যে শ্রেষ্ঠী স্তৌতি স্বদেবতাম্।
নিক্ষেপী ম্রিয়তে তুভ্যং প্রদাস্যাম্যুপযাচিতম্॥
গোষ্ঠিককর্মনিযুক্তঃ শ্রেষ্ঠী চিন্তয়তি চেতসা হৃষ্টঃ।
বসুধা বসুসম্পূর্ণা ময়াদ্য লব্ধ কিমন্যেন॥
পরিচিতমাগচ্ছন্তং গ্রাহকমুৎকণ্ঠয়া বিলোক্যাসৌ।
হৃষ্যতি তদ্ধনলুব্ধো যদ্বৎ পুত্রেণ জাতেন॥
পূর্ণাপূর্ণে মানে পরিচিতজনবঞ্চনং তথা নিত্যম্।
মিথ্যাক্রয়স্য কথনং প্রকৃতিরিয়ং স্যাৎ কিরাতানাম্॥১/১১-১৭

অর্থাৎ, ভিক্ষে করে ছোট লোকে। রাজা ন্যায্য পারিশ্রমিক না দিয়ে পারলে দেন না। কৃষিকাজে খুবই কষ্ট। লেখাপড়া বড়োই কঠিন, কেননা এতে নিয়মের বাড়াবাড়ি, আবার শিক্ষকের কাছে নিচু হয়ে থাকতে হয়। সুদের ব্যবসায় দারিদ্রতা, কেননা টাকাটি যে

পরের হাতে চলে যায়। সুতরাং দুনিয়ায় ব্যবসায় চেয়ে ভালো পেশা আর কিছুই নাই। এজন্য বলা যায় যে, ধনার্জনের সব উপায়ের মধ্যে সেরা বলে যেটিকে অভিহিত করা হয়, সেটি হলো 'নিক্ষেপ প্রবেশ' অর্থাৎ ক্রয়ের মাধ্যমে পণ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করে মজুত করা বা গুদামজাত করা। আর সুযোগ বুঝে লাভজনক হলে ছেড়ে দেওয়া। এছাড়া আর সব উপায়ই হলো অনিশ্চিত। আর পণ্যের মধ্যে সেরা হলো গন্ধদ্রব্য। সোনা-টোনা তার কাছে কোনো কিছুই না। এক টাকায় কিনলে, একশ টাকায় বিক্রি করলে। বন্ধকী (গচ্ছিত ধন) ব্যবসায় শেঠজী বাড়িতে এসে গৃহদেবতার কাছে কাকুতি-মিনতি করেন, কখনও ভাবে খাতক (দেনাদার) মরলে তোমায় এই দেব মানত করছি। যৌথ ব্যবসায় নিযুক্ত শ্রেষ্ঠী সানন্দে মনে মনে ভাবেন, সু-পূর্ণা বসুন্ধরা আজ পেয়েছি হাতের মুঠোয়, আর কী চাই? কিন্তু তাঁর আনন্দ বেশিদিন টেকে না। দোকানি পরিচিত ক্রেতা আসছে দেখে গলাটি বাড়িয়ে ভাবে, কিভাবে বেশি টাকা নিব? ভেবে তার মন আনন্দে নেচে ওঠে, যেন পুত্রলাভ হয়েছে। পাল্লা ভর্তি হলো কি হলো না এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নাভেবে রোজ রোজ চেনা মানুষকে ঠকানো, মিথ্যা করে কেনা দাম বলা, এ তো কিরাতের বৃত্তি। এমতাবস্থায় বণিক বর্ধমান চিন্তা করছেন, সম্মানের সাথে কিভাবে বেশি লাভের ব্যবসা করা যায়? তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন বিদেশ গিয়ে ব্যবসা করবেন –

দ্বিগুণং ত্রিগুণং বিত্তং ভাণ্ডক্রয়বিচক্ষণাঃ।
প্রাপ্নুবন্ত্যদ্যমাল্লোকা দূরদেশান্তরে গতাঃ॥ ১/১৮

অর্থাৎ, বিদেশে গিয়ে পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করে দেখে শুনে মাল সওদা করে এনে দ্বিগুণ-তিনগুণ লাভ করা যায়।

এসমস্ত বিষয় আলোচনায় ধারণা করা যায়, বর্তমান সময়ে যেমন বৈদেশিক বাণিজ্য রয়েছে, তেমনি তৎকালীন সময়ে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলিত ছিল।

ভৃত্যবৃত্তি

বর্তমান সময়ের মতো তৎকালীন সমাজে ভৃত্যবৃত্তি প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমান সময়ে ভৃত্য না বলে কর্মচারী বলা হয়। *পঞ্চতন্ত্রে* ভৃত্যবৃত্তির নানা দিক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। প্রভু যেমন ভৃত্যকে নানা সুবিধাদি দিতেন তেমনি ভৃত্যও নানা সুবিধাদির উপড় ভিত্তি করে তার প্রতি আজ্ঞাবহ থাকত। এর ব্যত্যয় হলে ভৃত্য প্রভুকে ত্যাগ করত। তাই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক কেমন ছিল, কার প্রতি কি কি কর্তব্য-কর্ম করতে হতো সে সম্পর্কে পঞ্চতন্ত্রকার নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। যেমন –

কাচে মণির্মণৌ কাচো যেষাং বুদ্ধির্বিকল্পতে।
ন তেষাং সন্নিধৌ ভৃত্যো নামমাত্রেঽপি তিষ্ঠতি ॥
যত্র স্বামী নিবিশেষং সমং ভৃত্যেষু বর্ততে।
তত্রোদ্যমসমর্থানামুৎসাহঃ পরিহীয়তে॥
ন বিনা পার্থিবো ভৃত্যৈর্ন ভৃত্যাঃ পার্থিবং বিনা।
তেষাং চ ব্যবহারেঽয়ং পরস্পরনিবন্ধনঃ॥১/৭৭-৭৯
অরৈঃ সন্ধার্যতে নাভির্নাভৌ চারাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
স্বামিসেবকয়োরেবং বৃত্তিচক্রং প্রবর্ততে॥
শিরসা বিধৃতা নিত্যং স্নেহেন পরিপালিতাঃ।
কেশা অপি বিরজ্যন্তে নিঃস্নেহাঃ কিং ন সেবকাঃ॥১/৮১-৮২

অর্থাৎ, তাদের কাছে ভৃত্য কখনও থাকবে না, থাকার নামও করবে না যারা কাঁচকে মণি ভাবে, আর মণিকে কাঁচ ভাবে। আর যেখানে মালিক সব ভৃত্যের সঙ্গেই সমান ব্যবহার করেন, কোনো তারতম্য করেন না, সেখানে যারা উদ্যমী ও অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন তাদের উৎসাহ কমে যায়। রাজা যেমন ভৃত্য ছাড়া থাকতে পারেন না। তেমনি ভৃত্যও রাজা ছাড়া টিকতে পারে না। তাদের সম্পর্কটা পারস্পরিক নির্ভরশীল। রাজা লোকানুগ্রহকারী এবং তেজস্বী হয়েও ভৃত্য ছাড়া নিজে নিজে শোভিত হন না। যেমন সূর্য লোকানুগ্রহকারী ও তেজস্বী হয়েও কিরণ ছাড়া শোভা পায় না। চাকার নাভিকে কেন্দ্র করে যেমন শলাকারা ধরে থাকে। আবার শলাকাদের ধরে থাকে নাভি। তেমনি প্রভু

এবং ভৃত্যের সম্পর্কের চাকাটাও এভাবেই ঘোরে। মাথার চুলে যেমন রোজ রোজ তেল দিয়ে কত যত্ন করা হয়, একটু যত্ন না নিলেই চুলের রং পাল্টে যায়। এমনি যাদের মাথায় করে রেখে কতো স্নেহে পালন করা হয়েছিল, সেই ভৃত্যেরা স্নেহ-ভালোবাসা না পেলে দূরে সরে যাবে এটাই স্বাভাবিক।

পরবর্তীতে বিষ্ণুশর্মা ভৃত্যকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতি বাস্তব একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। ভৃত্যদেরকে শুধু ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা দিলেই ভৃত্যরা খুশি হয় না, তাদেরকে খুশি করার জন্য সম্মানিতও করতে হয়। যেমন –

রাজা তুষ্টোঽপি ভৃত্যানামর্থমাত্রং প্রযচ্ছতি।
তে তু সম্মানমাত্রেণ প্রাণৈরপ্যুপকুর্বতে॥
এবং জ্ঞাত্বা নরেন্দ্রেণ ভৃত্যাঃ কার্যা বিচক্ষণাঃ।
কুলীনাঃ শৌর্যসংযুক্তাঃ শক্তা ভক্তাঃ ক্রমাগতাঃ॥১/৮৩-৮৪

অর্থাৎ, রাজা ভৃত্যের ওপর যতই সন্তুষ্ট হন, যত কিছুই তাকে দেন, কিন্তু ভৃত্য সামান্য সম্মান পেলেই তার বিনিময়ে নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকে। এজন্য রাজার উচিত বিচক্ষণ কুলীন, সাহসী, অনুগত ও কুলক্রমাগত ভৃত্য নিয়োগ করা।

একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য বা সেবক প্রিয় থেকেও প্রিয়তর হতে পারে যেন স্ত্রী সমতুল্য। তাই পঞ্চতন্ত্রকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন –

যস্মিন্ কৃত্যং সমাবেশ্য নির্বিশঙ্কেন চেতসা।
আস্যতে সেবকঃ স স্যাৎ কলত্রমিব চাপরম্॥১/৮৫

অর্থাৎ, যে সেবককে কাজ সঁপে দিয়ে রাজা নিশ্চত থাকতে পারেন, সে তো বলতে গেলে তাঁর বিশ্বস্ত পত্নীর মতো।

প্রকৃত নিঃস্বার্থ ভৃত্যের কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা পঞ্চতন্ত্রকার বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

যঃ কৃত্বা সুকৃতং রাজ্ঞো দুষ্করং হিতমুত্তমম্।
লজ্জয়া বক্তি নো কিঞ্চিত্তেন রাজা সহায়বান্॥১/৮৬

স্বাম্যাদিষ্টস্তু যো ভৃত্যঃ সমং বিষমমেব চ।

মন্যতে ন স সন্ধার্যো ভূভুজা ভুতিমিচ্ছতা॥১/১১২

অর্থাৎ, রাজার কোনো দুষ্কর অথচ উত্তম হিতকর কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করে যে সেটি প্রকাশ পর্যন্ত না করে, সেই হলো রাজার প্রকৃত সহায়, প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী। প্রভুর আদেশ পেয়ে যে ভৃত্য ভাবে কাজটি শক্ত, না সহজ, রাজা যদি ভালো চান তবে এরকম ভৃত্যকে সাথে সাথে পরিত্যাগ করবেন ।

অপরদিকে যোগ্য ভৃত্যের মৃত্যুতে রাজার কি হতে পারে সে সম্পর্কে পঞ্চতন্ত্রকার উল্লেখ করেছেন –

ভূমিক্ষয়ে রাজবিনাশ এব ভৃত্যস্য বা বুদ্ধিমতো বিনাশে।

নো যুক্তমুক্তং হ্যনয়োঃ সমত্বং নষ্টাপি ভূমিঃ সুলভা ন ভৃত্যাঃ॥ ১/৪২৬

অর্থাৎ, ভূমি গেলেও রাজার যেমন ক্ষতি সাধিত হয়, বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত ভৃত্য মারা গেলেও তেমনটি হয়। তবে এই দুটিকে সমান চোখে দেখা ঠিক নয়। কেননা ভূমি গেলে তা পুনরায় পাওয়া যেতে পারে কিন্তু ভৃত্য পাওয়া সহজ নয়।

কুসংস্কার

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক *পঞ্চতন্ত্র*-এর যুগে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারে সমাজ আচ্ছন্ন ছিল। মানুষ, পশু-পাখি, জীব-জন্তু এমনকি প্রকৃতির নানা বিষয় নিয়ে কুসংস্কারের অবতারণা করা হয়েছে। মিত্রভেদে 'গোঁজ উপড়োন বানর' গল্পের শেষে বলা হয়েছে – 'দূর্বাপি গোরোমত'[৭] অর্থাৎ, গোরুর লোমে দূর্বা। এসব কথার বাস্তবিক কোনো ভিত্তি নাই। এছাড়া এই তন্ত্রে 'বিষ্ণুরূপধারী তাঁতি' গল্পে মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুকের প্রমাণ পাওয়া যায়। যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

মিত্রলাভে 'অতিলোভী শেয়াল' গল্পে হিরণ্যকের উক্তিতে কুসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় –

অজাধূলিরিব ত্রস্তৈর্মার্জনীরেণুবজ্জনৈঃ।

দীপখট্টোত্থচ্ছায়ের ত্যজ্যতে নির্ধনো জনৈঃ॥
শৌচাবশিষ্টয়াপ্যস্তি কিঞ্চিৎ কার্যং ক্বচিন্মৃদা।
নির্ধনেন জনেনৈব ন তু কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্॥২/১০৪-১০৫

অর্থাৎ, ছাগলীদের উড়ানো ধুলো বা ঝাঁটার ধুলো উড়লে মানুষ যেমন সরে যায়, তেমনি প্রদীপের আলোয় পড়া খাটের ছায়া দেখলে লোকে শশব্যস্ত হয়ে সরে যায়। এমনি করেই এড়িয়ে চলে ধনহীনকে। শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকায় কিছুই হয় না, সাপ হাওয়া খেয়ে জীবন ধারণ করে প্রভৃতি।

কৌতূহল উদ্দীপক কতগুলো কিংবদন্তী যার বাস্তবতা নেই।

অপরদিকে কাকোলূকীয় তন্ত্রে 'মিত্রশর্মা ও তিন ধূর্ত' গল্পে বর্ণিত আছে যে, বিশেষ কোনো পশু এবং মৃতদেহ স্পর্শ করলে মানুষের মুক্তি নেই। তাতে শরীর অপবিত্র হয়। তবে চান্দ্রায়ণ ও অন্যান্য নিয়ম পালন করে শুদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন –

তির্যঞ্চ মানুষং বাপি যো মৃতং সংস্পৃশেৎ কুধীঃ।
পঞ্চগব্যেন শুদ্ধিঃ স্যাৎ তস্য চান্দ্রায়ণেন বা॥
যঃ স্পৃশেদ্ রাসভং মর্ত্যো জ্ঞানাদজ্ঞানতেঽপি বা।
সচৈলং স্নানমুন্দিষ্টং তস্য পাপপ্রশান্তয়ে॥৩/১১৭-১১৮

অর্থাৎ, যে লোক পশু কিংবা মৃত মানুষের দেহ স্পর্শ করে, শুদ্ধি হতে হলে পঞ্চ-গব্য কিংবা চান্দ্রায়ণ ছাড়া কোনো উপায় নেই। যে ব্যক্তি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে গর্দভ স্পর্শ করে, গঙ্গা স্নানেও তার এ পাপের প্রাশ্চিত্ত হবে না।

এসবের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় তৎকালীন সমাজ কুসংস্কারপূর্ণ নানা রীতি–নীতিতে আচ্ছন্ন ছিল, যা সমাজিকীকরণে ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে বড় বাঁধা হিসেবে দাঁড়িয়েছিল বলে মনে হয়।

জুয়াখেলা

বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত জুয়াখেলা প্রচলিত রয়েছে। পঞ্চতান্ত্রিক যুগেও সমাজে জুয়াখেলা প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমান সময়ের মত তৎকালীন সময়ে জুয়াখেলায় তেমন কোনো বাঁধা-নিষেধ ছিল না। মিত্রভেদের প্রথমেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজার বিশ্বস্ত কর্মচারীরাও প্রাকাশ্যে রাজার কাছে জুয়াখেলার কথা প্রকাশ করেছে। যেমন – 'দন্তিল ও গোরম্ভ' গল্পে রাজার কথার উত্তরে গোরম্ভ বলল – 'দেব দ্যূতাসক্তস্য রাত্রিজাগরণেন সম্মার্জনং কুর্বাণস্য মম বলান্নিদ্রা সমায়াতা।'[৮] অর্থাৎ, মহারাজ, জুয়া খেলায় রাত জেগেছি, ঘুমের ঝোকে কি বলতে কি বলেছি মনে নেই। এভাবে উক্ত গল্পে গোরম্ভ একাধিকবার জুয়ার নেশার কথা রাজার কাছে ব্যক্ত করেছে। এ জন্য রাজা তাকে একবারের জন্যও ধমক দেননি বা শাসন করেননি। এ থেকে তৎকালীন সময়ে প্রকাশ্যেই জুয়াখেলা প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে নীতিগতভাবে জুয়াখেলা যে ভয়ঙ্কর নেশা এবং নিন্দিত ছিল তা 'গোঁজ-উপড়োন বানর' গল্পের শেষে দমনকের উক্তিতে প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে জুয়া খেলাকে যম দূতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন–

দ্যূতং যো যমদূতাভং হালাং হালাহলোপমাম্।
পশ্যেদ্ দারান্ বৃথাকারান্ স ভবেদ্ রাজবল্লভঃ॥১/৫৮

অর্থাৎ, জুয়াকে যমদূতের মতো বিপজ্জনক, সুরাকে বিষের মতো এবং রাজপত্নীদের আবছায়ার মতো যে দেখে সে রাজার প্রিয় হয়।

পরবর্তীতে 'বানররা ও সূচীমুখ' গল্পে পঞ্চতন্ত্রকার জুয়ারীদের সাথে বিবেকবান লোককে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। যেমন –

মুহুর্বিঘ্নিতকর্মাণং দ্যূতকারং পরাজিতম্।
নালাপয়েদ্বিবেকজ্ঞো য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ॥১/৩৯১

অর্থাৎ, নিজের ভালো চাইলে আর বিবেকবান হলে, জুয়াড়ি এবং যার কাজে বাঁধা পড়ে তাদের সঙ্গে কথা বলবে না।

এ সমস্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, তৎকালীন সমাজে অভিজাত শ্রেণি থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে জুয়াখেলার প্রচলন ছিল। তবে ভদ্রলোকেরা জুয়াকে সবসময় ঘৃণা করত। তাই বিষ্ণুশর্মা জুয়ারি থেকে সর্বদা দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন।

ধর্ম–আধ্যাত্মিকতা ও পূজার্চনা

পঞ্চতন্ত্রে চিরন্তন ধর্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে পূজা-যাগ-যজ্ঞ ব্রতপালন, ধর্মীয় নানা বিষয় সম্পর্কে পঞ্চতন্ত্রকার বর্ণনা করেছেন। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে *পঞ্চতন্ত্রে – বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বেদান্ত, পুরাণ,* প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র থেকে বহু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি নানাভাবে ফুটে উঠেছে। *পঞ্চতন্ত্র*-এর শুরুতেই কথামুখে বিভিন্ন দেব-দেবী-মুনি-ঋষিদের বন্দনা করা হয়েছে। যা ধর্মবোধের পরিচায়ক, যেমন –

ওঁ নমঃ শ্রীশারদাগণপতিগুরুভ্যো মহাকবিভ্যো নমঃ॥
ব্রহ্মা রুদ্রঃ কুমারো হরিবরুণযমা বহ্নিরিন্দ্রঃ কুবের-
শ্চন্দ্রাদিত্যৌ সরস্বত্যুদধিযুগনগা বায়ুরুর্বীবভুজঙ্গাঃ॥
সিদ্ধা নদ্যোঽশ্বিনৌ শ্রীদিতিরদিতিসুতা মাতরশ্চণ্ডিকাদ্যা
বেদাস্তীর্থানি যজ্ঞা গণবসুমুনয়ঃ পান্তু নিত্যং গ্রহাশ্চ॥
মনবে বাচস্পতয়ে শুক্রায় পরাশরায় সসুতায়।
চাণক্যায় চ বিদুষে নমোঽস্তু নয়শাস্ত্রকর্তৃভ্যঃ॥ ১/কথামুখ-১

অর্থাৎ, শ্রীদুর্গা, গণেশ ও গুরুদেবদের প্রণাম। একই সাথে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, পার্বতী, বরুণ, কুমার কার্তিকেয়, ইন্দ্র, যম, কুবের, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, বায়ু, অশ্বী, বসুরা, সিদ্ধ, মুনিগণ, দিতি-অদিতি পুত্রসহ যত দেবগণ, ধরা, নদী, গ্রহ, তীর্থ, যজ্ঞ, বেদ, আগুন, নাগ, শিবের অনুচর, মনু, বৃহস্পতি, শুক্র, পরাশর, নীতিকর এবং মহাকবিদের প্রণাম। তাঁরা সর্বদা আমাদের রক্ষা করুন।

দাক্ষিণাত্যের রাজা অমরশক্তি চৌষট্টি কলায় পারদর্শী ছিলেন। এই কলাসমূহের মধ্যেও ধর্মীয় বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং তাঁর মন্ত্রীবর্গও ধর্মশাস্ত্রের কথা বলেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় অমরশক্তির রাজত্বকালে খুব ভক্তিসহকারে ধর্মচর্চা হতো এবং ধর্মীয় বিশ্বাসও প্রবল ছিল। এছাড়া মিত্রভেদে দমনক, সঞ্জীবক ও পিঙ্গলকের কথোপকথনে ধর্মীয় নানা বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। একই তন্ত্রে 'সন্ন্যাসী, ধূর্ত, শিয়াল ও দুই দুষ্টা' গল্পে দেবশর্মা একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী তিনি শিবের আরাধনা করতেন। তাঁর শিষ্য হিসেবে আষাঢ়ভূতির মনে দুষ্টামি থাকলেও মুখে 'ওঁং নমঃ শিবায়' বলে গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে এবং সংসার ধর্মের অসারতার বিষয়ে নানা আধ্যাত্মিক কথা ব্যক্ত করেছে।[৯] গুরুদেবও শিশ্যকে যা বলেছেন তা বস্তুত ধর্ম ও আধ্যাত্মিক উপদেশে পরিপূর্ণ। যেমন –

পূর্বে বয়সি যঃ শান্তঃ স শান্তঃ ইতি মে মতিঃ।
ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষু শমঃ কস্য ন জায়তে॥
আদৌ চিত্তে ততঃ কায়ে সতাং সম্পদ্যতে জরা।
অসতাং তু পুনঃ কায়ে নৈব চিত্তে কদাচন॥
যচ্চ মাং সংসারসাগরোওরণোপায়ং পৃচ্ছসি তচ্ছ্রুয়তাম্ –
শূদ্রো বা যদি বান্যোঽপি চণ্ডালোঽপি জটাধরঃ।
দীক্ষিতঃ শিবমন্ত্রেণ স ভস্মাঙ্গী শিবো ভবেৎ॥
ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ পুষ্পমেকমপি স্বয়ম্।
লিঙ্গস্য মুর্দ্নি যো দদ্যান্ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ১/১৬৬-১৭০

অর্থাৎ, অল্প বয়সে যে শান্ত থাকে সেই প্রকৃত শান্ত। বৃদ্ধ বয়সে শান্ত হবে এটা তো প্রকৃতির নিয়ম। সজ্জন আগেই মনের দিক থেকে সাধু হয়, পরে দেহে। কিন্তু দুর্জন কখনও মনে সাধু হয় না, শেষ জীবনেও শুধু লোক দেখানো সাধুতা দেখায়। আষাঢ়ভূতি! ভবসাগর তুমিই উত্তরণ করতে পারবে। তুমি শূদ্র-চণ্ডাল যা হও না কেন একবার যদি শুদ্ধ মনে ভক্তি ভরে শিবমন্ত্রে দীক্ষা নিতে পার তাহলে আর জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে তোমাকে হাবুডুবু খেতে হবে না।

‘চোর-পণ্ডিত ও বিদেশী’ গল্পে ব্রাহ্মণের উক্তিতে শাশ্বত ধর্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে ব্রাহ্মণ নিজেকেই নিজে বুঝিয়ে স্বগতোক্তি করেছেন, যেখানে পরকাল ও আধ্যাত্মিকতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। যেমন –

মৃত্যোর্বিভেষি কিং বাল ন স ভীতং বিমুঞ্চতি।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিণাং ধ্রুবঃ॥
গবার্থে ব্রাহ্মণার্থে চ প্রাণত্যাগং করোতি যঃ।
সূর্যস্য মণ্ডলং ভিত্বা স যাতি পরমাং গতিম্॥১/৪২৩-৪২৫

অর্থাৎ, যমকে ভয় করার কোনো কারণ নেই, ভয় পেলেও সে ছেড়ে দেবে না কাউকে। সবাইকে মরতে হবেই, আজ হোক কাল হোক কিংবা শতবর্ষ পরে হোক। তাই ভালো কাজের অংশ হিসেবে গো-ব্রাহ্মণ-হিতার্থে আত্মবিসর্জন দিতে পারলেই সূর্যমণ্ডল ভেদ করে পরম গতি লাভ করা যায়। আর সেটিই মানুষের জীবনে পরম কাম্য। বস্তুত মনের সাধুতাই বড়ধর্ম, তাতেই পরম প্রাপ্তি মেলে।

মিত্রপ্রাপ্তি তন্ত্রে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে নানা দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বে অন্য প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে তাত্ত্বিক অর্থে জীবন-জগৎ-ধর্ম তথা মানব জীবনের এক কঠিন বাস্তবতার নিরিখে ধর্মীয় বিষয়সমূহ প্রতিভাত হয়েছে। যেমন –

ব্যোমৈকান্তবিচারিণোঽপি বিহগাঃ সম্প্রাপ্নুবন্ত্যপদং
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলান্মীনাঃ সমুদ্রাদপি।
কিমিহাস্তি কিং চ সুকৃতং কঃ স্থানলাভে গুণঃ
কালঃ সর্বজনান্ প্রসারিতকরো গৃহ্নাতি দূরাদপি॥২/২১

অর্থাৎ, বিশাল আকাশের এককোণে পাখিরা ওড়ে-ঘোরে চলাচল করে, তবুও তাদের নিস্তার নেই। যতই মাছ সাগরের গভীর জলেতে থাক না কেন, দক্ষ জেলে ঠিক ধরে ফেলবেই। তাই এই দুনিয়ায় পাপ কী? বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়ে কী বা লাভ? যে যেখানে আছে সময় হলে সবাইকে হাত বাড়িয়ে মহাকাল দূর থেকেই ঠিক ধরে ফেলবে।

একই তন্ত্রে পরবর্তীতে বলা হয়েছে, বিধির-বিধান যা, তা ঘটবেই, এটাকে কখনও এড়ানো যায় না। এটি আধ্যাত্মিক সত্য। তাই পঞ্চতন্ত্রকার 'অতিলোভী শেয়াল' গল্পে এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন –

অকৃতেঽপ্যুদ্যমে পুংসামন্যজন্মকৃতং ফলম্।
শুভাশুভং সমভ্যেতি বিধিনা সন্নিয়োজিতম্॥
যস্মিন্ দেশে চ কালে চ বয়সা যাদৃশেন চ।
কৃতং শুভাশুভং কর্ম তৎ তথা তেন ভুজ্যতে॥
যথা ছায়াতপৌ নিত্যং সুসংবদ্ধৌ পরস্পরম্।
এবং কর্ম চ কর্তা চ সংশ্লিষ্টাবিতরেতরম্॥২/৭৯-৮০, ১৩১

অর্থাৎ, মানুষ চেষ্টা করুক আর নাই করুক, পূর্বজন্মের কর্মফল পাপ এবং পুণ্য অদৃষ্টের বিধানে ঠিক তার সামনে যথাসময়ে হাজির হবেই। ঠিক যে সময়ে, যে স্থানে, যে বয়সে যে ধরনের পাপ বা পুণ্য কর্ম মানুষ করে, তার ফলও সেভাবেই সে পায়। যেমনি আলো ছায়া সর্বদা একে-অন্যের সঙ্গে জোড়া, তেমনি কর্তা আর কর্ম একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

পঞ্চতন্ত্র-এর বিভিন্ন স্থানে যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়া-কর্মসহ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মিত্রভেদের প্রথমেই বর্ধমান নামের বণিক সঞ্জীবকের মৃত্যু সংবাদ শুনে বৃষোৎসর্গ ইত্যাদি সব-কিছু ঔর্ধদৈহিক রিতি-নীতি সহ শ্রাদ্ধ-শান্তি সম্পন্ন করেছেন।[১০] এছাড়া মিত্রপ্রাপ্তি তন্ত্রে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন –

অগ্নিহোত্রফলা বেদাঃ শীলবিত্তফলং শ্রুতম্।
রতিপুত্রফলা দারা দত্তভুক্তফলং ধনম্॥২/১৫০

অর্থাৎ, বেদের ফল অগ্নিহোত্র। পড়াশুনার ফল ধন এবং চরিত্র প্রতিষ্ঠা। পত্নীর ফল প্রেম ও সন্তান। টাকার ফল ভোগ আর দান।

‘হিরণ্যকের আত্মকথা’ গল্পে দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরে ভগবান শ্রীমহাদেবের মন্দির। সেই মন্দিরের পরিব্রাজক তাম্রচুর। তাঁর বন্ধু সন্ন্যাসী বৃহৎস্ফিক্। তাঁদের কথোপকথনে স্বর্গ-নরক তথা পরকাল সম্পর্কে জানা যায়। সেই সাথে তৎকালীন সমাজ পূজা-পার্বণের নামে যজমানি ও মোহন্তগিরিকে ভালো চোখে দেখা হয়নি। একে পঞ্চতন্ত্রকার নরকের দ্বার বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন –

নরকায় মতিস্তে চেৎ পৌরোহিত্যং সমাচর।
বর্ষং যাবৎ কিমন্যেন মঠচিন্তাং দিনত্রয়ম্॥২/৬৮

অর্থাৎ, যদি কারো নরকে যাবার সাধ হয়ে থাকে, তাহলে যজমানি করো বছর খানেক। কিংবা অন্য কিছুতে কাজ নেই। মোহন্তগিরি করো দিন কয়েক।

একই তন্ত্রে ধর্ম রক্ষার জন্য এক গূঢ়তত্ত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা ধর্ম রক্ষার্থে নিস্পৃহ হতে হয়। সে সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায় –

ধর্মার্থং যস্য বিত্তেহা তস্যাপি ন শুভাবহা।
প্রক্ষালনাদ্ হি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্॥২/১৬১

অর্থাৎ, ধর্মের জন্যে অর্থস্পৃহা থাকলে তাতেও অকল্যাণ হয়। ময়লা ধোবে? দূরে থাকো, স্পর্শ করো না । তাই ধর্মকে ব্যক্তি স্বার্থে বা বৈষয়িক লাভের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

কাকোলূকীয় তন্ত্রে ‘হাতির দল ও খরগোসেরা’ গল্পে মনু এবং ব্যাসদেবের উক্তিতে আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে –

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥৩/৮৩

অর্থাৎ, ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করে বৃহত্তর পর্যায়ে ধাবিত হতে হবে। প্রয়োজনে বংশের জন্য একজনকে ছাড়তে হবে, গ্রামের জন্য বংশ ছাড়বে। দেশের জন্য গ্রাম ছাড়বে, অনুরূপভাবে নিজের জন্য জগৎ ছাড়তে হলে ছাড়বে।

একই তন্ত্রে ‘চড়ুই খরগোস ও বেড়াল’ গল্পে বেড়ালের চরিত্রটি ধর্মবেত্তা হিসেবে উপস্থাপন করে, সে কিভাবে ভণ্ড হতে পারে, তা সমাজকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। তবে এখানে পঞ্চতন্ত্রকার ধর্ম ও মানুষের পরকাল সম্পর্কে যে মর্মকথা তুলে ধরেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ –

অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্তব্যো ধর্মসংগ্রহঃ॥
যস্য ধর্মবিহীনানি দিনান্যায়ান্তি যান্তি চ।
স লোহকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি॥
নাচ্ছাদয়তি কৌপীনং ন দংশমশকাপহম্।
শুনঃ পুচ্ছমিবানর্থং পাণ্ডিত্যং ধর্মবর্জিতম্॥
পুলাকা ইব ধান্যেষু পূতিকা ইব পক্ষিষু।
মশকা ইব মর্ত্যেষু যেষাং ধর্মো ন কারণম্॥
শ্রেয়ঃ পুষ্পফলং বৃক্ষাদ্দধ্নঃ শ্রেয়ো ঘৃতং স্মৃতম্।
শ্রেয়স্তৈলং চ পিণ্যাকাচ্ছ্রেয়ান্ ধর্মস্তু মানুষাৎ॥
সৃষ্টা মূত্রপুরীষার্থমাহারায় চ কেবলম্।
ধর্মহীনাঃ পরার্থায় পুরুষাঃ পশবো যথা॥
স্থৈর্যং সর্বেষু কৃত্যেষু শংসন্তি নয়পণ্ডিতাঃ।
বহ্বন্তরায়যুক্তস্য ধর্মস্য ত্বরিতা গতিঃ॥
সংক্ষেপাৎ কথ্যতে ধর্মো জনাঃ কিং বিস্তরেণ বঃ।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥
শ্রূয়তাং ধর্মসর্বস্বং শ্রুত্বা চৈবাবধার্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ॥৩/৯৫-১০৩

অর্থাৎ, অনিত্য এ দেহ, ঐশ্বর্যও চিরস্থায়ী নয়। মৃত্যু আছে ওঁৎ পেতে, পুণ্য তাই করো হে সঞ্চয়। ধর্মহীন পুন্যহীন ব্যক্তির দিনগুলো শুধু আসে আর যায়, কামারের হাপর সে, বাঁচে না কো, শুধু শ্বাস নেয়। তাড়ায় না ডাঁশ-মশা, আচ্ছাদন করে না- কৌপীন, কুকুরের লেজের মতন, ধর্ম ছাড়া পাণ্ডিত্য অর্থহীন। যেসব লোক ভাবে এবং বলে, ধর্ম সবার মূলে নয়, তারা মর্ত্য প্রাণীর নিকৃষ্ট যেমন, প্রাণীর মধ্যে মশা, পাখাওয়ালার মধ্যে

উই আর ধানের মধ্যে বাজে ধান। এই তাদের উপমান। বৃক্ষের সার যেমন পুষ্প-ফল, দধির সার ঘৃত আর খোলের সার হলো তেল, তেমনি ধর্ম মানুষের সার। কেবল ভোজন আর মুত্রপুরীষত্যাগ ধর্ম নয় এরা পশুর মতন। মানুষকে শুধু অন্যের কাজের জন্যে মূলত পরার্থে সৃজন করা হয়েছে। জীবনে বহু বিঘ্ন আছে তাই সব কাজ ধীরে-সুস্থে ধর্মীয় কাজ যথাশিঘ্র করতে হয়। এসব বলেন যত নীতির পণ্ডিত। দাম্ভিকতা করে কোনো লাভ নেই। সংক্ষেপে ধর্ম হলো জনগণের উপকার তথা যা পুণ্য, আর পাপ হলো-পরনিপীড়ন। ধর্মের সংক্ষিপ্তসার হলো – কখনও প্রতিকূল আচরণ নয় নিজের ক্ষেত্রেও এবং অপরের ক্ষেত্রেও।

স্বর্গ-নরক-পরকাল সম্পর্কে আরও ধর্ম বিষয়ক নানা তথ্য পাওয়া যায় –

অহিংসাপূর্বকো ধর্মো যস্মাৎ সদ্ভিরুদাহৃতঃ।
যুকমৎকুণদংশাদীংস্তস্মাত্তানপি রক্ষয়েৎ ॥
হিংসকান্যপি ভূতানি যো হিংসতি স নির্ঘৃণঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং কিং পুনর্যঃ শুভানি চ॥
বৃক্ষাংশ্ছিত্বা পশূন্ হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দমম্।
যদ্যেবং গম্যতে স্বর্গে নরকং কেন গম্যতে॥
মানাদ্বা যদি বা লোভাৎ ক্রোধাদ্বা যদি বা ভয়াৎ।
যো ন্যায়মন্যথা ব্রূতে স যাতি নরকং নরঃ॥৩/১০৪-১০৭

অর্থাৎ, অহিংসা ধর্মের মূল, তাই ভালো মানুষেরা বলেন, ছারপোকা উকুন বা ডাঁশমশা-এদেরও মারা যাবে না। সেও নির্দয় এমন কি যে হিংস্র জন্তুকেও হত্যা করে, সে ঘোর নরকে যাবে। তাহলে কী হবে তার, নিরীহকে যে মারে? যে গাছ কেটে এবং পশু মেরে রক্তে রঞ্জিত করে, তার জন্য নরক নিশ্চিত। আবার যে বিচারক অহংকারবশত, রাগের মাথায় কিংবা লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যায় রায় দেয়, সেও নরকে যাবে।

এভাবে নানাবিধ ধর্মীয় নীতিবোধের কথা বলে পাপাচারণ করতে বারণ করা হয়েছে। তবে তৎকালীন সমাজে মুখোশের অন্তরালে মানুষ পাপ কাজে লিপ্ত ছিল।

অপরীক্ষিতকারক নামক তন্ত্রে 'সিংহ সিংহী ও শেয়ালের বাচ্চা' গল্পে সনাতন ধর্মের কর্তব্যবোধের কথা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে পঞ্চতন্ত্রকার উল্লেখ করেছেন –

অকৃতং নৈব কর্তব্যং প্রাণত্যাগেঽপি সংস্থিতে।
ন চ কৃত্যং পরিত্যাজ্যং এষ ধর্মঃ সনাতনঃ॥৪/৪১

অর্থাৎ, অকর্তব্য করা উচিত নয়, এতে যদি প্রাণ যায় যাক, আবার কর্তব্যও ছাড়া উচিত নয়, এটি সনাতন ধর্মের মূল মর্মকথা ।

একই তন্ত্রে 'তিন মুনি' গল্পে মুনিদের তপস্যার দ্বারা নানা অলৌকিক শক্তি অর্জনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে পাপ পুণ্যের নানা বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সত্য যুগে পাপীর সঙ্গে কথা বললেও ভালো মানুষের পাপ হতো, অপরপক্ষে কলি যুগে তার বিপরীত বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চতন্ত্রকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন –

সঞ্চরন্তীহ পাপানি যুগেষ্বন্যেষু দেহিনাম্।
কলৌ তু পাপসংযুক্তে যঃ করোতি স লিপ্যতে॥
আসনাচ্ছয়নাদ্ যানাৎ সঙ্গতেশ্চাপি ভোজনাৎ।
কৃতে সঞ্চরতে পাপং তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥৪/৬২-৬৩

অর্থাৎ, অন্যান্য যুগে পাপ একজনের কাছ থেকে আরেক জনের কাছে যায়। কিন্তু কলিযুগে পাপ কাজ যে করে, তারই লাগে। জলে তেলের ফোঁটার মতো সত্যযুগে পাপ সঞ্চারিত হতো নানা রকম সাহচর্যে, যেমন – পাপীর সঙ্গে বসলে, শুলে, গেলে, মিশলে এবং খেলে।

তৎকালীন সমাজে জিন-ভূত-প্রেতের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ছিল। মানুষ তখন জিন-ভূত-প্রেতের পূজার্চনাও করত। অপরীক্ষিতকারক নামক তন্ত্রের ভূমিকায় বিষ্ণুশর্মা নাপিতের উক্তিকে সে বিষয় তুলে ধরেছেন। যেমন –

জয়ন্তি তে জিনা যেষাং কেবলজ্ঞানশালিনাম্।
আজন্মনঃ স্মরোৎপত্তৌ মানসেনোষরায়িতম্॥

সা জিহ্বা যা জিনং স্তৌতি তচ্চিত্তং যজ্জিনে রতম্ ।
তাবেব চ করৌ শ্লাঘ্যৌ যৌ তৎপূজাকরৌ করৌ ॥
ধ্যানব্যাজমুপেত্য চিন্তয়সি কামুন্মীল্য চক্ষুঃ ক্ষণং
পশ্যানঙ্গশরাতুরং জনমিমং ত্রাতাপি নো রক্ষসি।
মিথ্যাকারুণিকোঽসি নির্ঘৃণতরসস্ত্বত্তঃ কুতোঽন্যঃ পুমান্।
সের্ষ্যং মারবধূভিরিত্যভিহিতো বুদ্ধো জিনঃ পাতুঃ বঃ॥৫/১২-১৪

অর্থাৎ, যে কৈবল্যতত্ত্ব জানে সে জিনেদের জয় স্বীকার করে। চিত্ত তাঁদের স্মরাঙ্কুরের আজন্ম মরুভূমি। জিনের স্তুস্তি যে গায় সে জিহ্বা, জিনে যার অনুরক্তি সে মন, প্রশংসনীয় দুটি হাত যাঁর করে পূজা-বন্দন। আবার ধ্যানের ছলে ভাবে কোনো রমণীকে, চোখ মেলে দেখে স্মরাহত। তুমি তো ত্রাতা-করো উদ্ধার। তুমি তো করুণানিধান মিথ্যা নও। তুমি তো এতোবড়ো নিষ্ঠুর নও মারের বধুরা অনুরাগে একথা বলেছিল সেই প্রবুদ্ধ জিন সব বিঘ্ন দূর করুন।

এমনিভাবে পঞ্চতন্ত্রকার ধর্ম–আধ্যাত্মিকতা ও পূজার্চনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

সমাজে নারীর অবস্থান

পঞ্চতন্ত্র-এর যুগে অভাবনীয় নারী বিদ্বেষী অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া *পঞ্চতন্ত্র*-এর প্রায় সকল স্থানেই নারীকে অসম্মানের পাত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে তৎকালীন সমাজে নারীরা ছিল ভোগ্যা, দ্বেষ্যা, নিষিদ্ধা। *পঞ্চতন্ত্র*-এর প্রথমে মিত্রভেদে 'শেয়াল ও দামাদা' গল্পে নারীকে সরলতার প্রতিভূ হিসেবে দেখানো হয়েছে। সেযুগে যে যেভাবে নারীকে চালিয়েছে সেভাবেই নারীরা পরিচালিত হয়েছে। বিষ্ণুশর্মার উক্তিতে –

শস্ত্রং শাস্ত্রং বীণা বাণী নরশ্চ নারী চ।
পরুষবিশেষং প্রাপ্তা ভবন্ত্যযোগ্যাশ্চ যোগ্যাশ্চ॥১/১১০

অর্থাৎ, অশ্ব, অস্ত্র, ভাষা, শাস্ত্র, বীণা, নারী ও পুরুষ – যেমন লোকের হাতে পড়বে, তেমনই চলবে।

'দন্তিল ও গোরম্ভ' গল্পে গোরম্ভের কানকথা শুনে রাজা নারীদের চরিত্র সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন। তাতে তৎকালীন সমাজে নারীরা ভোগ্যা, দ্বেষ্যা ও চরিত্রহীন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন –

জল্পন্তি সার্ধমন্যেন পশ্যন্ত্যন্যং সবিভ্রমাঃ।
তদ্‌গতং চিন্তয়ন্ত্যন্যং প্রিয়ঃ কো নাম যোষিতাম্॥
একেন স্মিতপাটলাধররুচো জল্পন্ত্যনল্পাক্ষরং
বীক্ষন্তেঽন্যমিতঃ স্ফুটৎকুমুদিনীফুল্লোল্লসল্লোচনাঃ।
দূরোদারচরিত্রচিত্রবিভবং ধ্যায়ন্তি চান্যং ধিয়া।
কেনেত্থং পরমার্থতেঽর্থবদিব প্রেমাস্তি বামভ্রুবাম্॥
নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ
নান্তকঃ সর্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা॥
রহো নাস্তি ক্ষণো নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা নরঃ।
তেন নারদ নারীণাং সতীত্বমুপজায়তে॥
যো মহান্ মন্যতে মূঢ়ো রক্তেয়ং মম কামিনী।
ন তস্যা বশগো নিত্যং ভবেৎ ক্রীড়াশকুন্তবৎ॥
তাসাং বাক্যানি কৃত্যানি স্বল্পানি সুগুরুণ্যপি।
করোতি যঃ কৃতৈর্লোকে লঘুত্বং যাতি সর্বতঃ॥
স্ত্রিয়ং চ যঃ প্রার্থয়তে সন্নিকর্ষং চ গচ্ছতি।
ঈষচ্চ কুরুতে সেবাং তমেবেচ্ছন্তি যোষিতঃ॥
অনর্থিত্বান্মনুষ্যাণাং ভয়াৎ পরিজনস্য চ।
মর্যাদায়ামমর্যাদাঃ স্ত্রিয়স্তিষ্ঠন্তি সর্বদা॥
নাসাং কশ্চিদ্‌গম্যেঽস্তি নাসাং চ বয়সি স্থিতিঃ।
বিরূপং রূপবন্তং বা পুমানিত্যেব ভূজ্যতে॥
রক্তো হি জায়তে ভোগ্যো নারীণাং শাটকো যথা।
ঘৃষ্যতে যো দশালম্বী নিতম্বে বিনিবেশিতঃ॥

অলক্তকো যথা রক্তো নিষ্পীড্য পুরুষস্তথা।

অবলাভির্বলাদ্ রক্তঃ পাদমূলে নিপাত্যতে॥১/১৩৬-১৪৬

অর্থাৎ, নারীরা এমন তারা গল্প করছে একজনের সঙ্গে, আর একজনের দিকে তাকাচ্ছে, কত রকম ভাবভঙ্গি করছে, মনে মনে ভাবছে আর একজনের কথা। মেয়েদের আবার প্রিয় কে? মুচকি হাসির গোলাপী আভায় ঠোঁটটি রাঙিয়ে একজনের সঙ্গে গল্প করেই চলছে, কথা আর ফুরায় না যেন। সেখান থেকেই আবার উৎফুল্ল কুমুদের মতো উজ্জ্বল বড়ো বড়ো চোখ করে তাকাচ্ছে আর একজনের দিকে। এক মনে ধ্যান করছে আরেক জনের, যার আচরণে উদারতার লেশমাত্র নেই, কিন্তু রকমারি ঐশ্বর্য দিয়ে তাক লাগাচ্ছে। সুতরাং সুন্দর-সুন্দর-ভুরু সমৃদ্ধ এসব মেয়েদের কারোরই মনের মধ্যে সত্যিকার প্রেম বলতে কিছু নেই। যতই দাও না কাঠ, হুতাশন চায় আরো আরো। হাজার নদী আসুক, তবু তৃপ্ত হয় না সাগর। সমস্ত প্রাণীকে খায়, তবু চির-অতৃপ্ত অন্তক, তেমনি তৃপ্তি নেই ঐ সুলোচনাদের যত পুরুষই পাক না কেন। নারদকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে মেয়েরা সতী হয় তখন, যখন নিভৃত নেই, সুযোগ নেই, আর প্রার্থী পুরুষ নেই। যে-গাড়োল হাঁদার মতো ভাবে, এ মেয়ে আমায় ভালোবেসেছে, সে নির্ঘাৎ সে মেয়ের খেলার পাখি, হাতের পুতুল। তাদের কথা শুনে যে ছোটোখাটো অথবা রীতিমতো শক্ত শক্ত কাজ করে দেয়, তাতে করে সে লোক সমাজে একেবারেই তুচ্ছ হয়ে যায়। যে তাদের চায়, এগিয়ে আসে এবং সামান্য একটু সেবা করে, তারই প্রেমে পড়ে যায় মেয়েরা। স্ত্রীলোকের কোনো সীমা-জ্ঞান নেই। তারা যে যতটুকু সংযত থাকে, তা শুধু পরিজনের ভয়ে এবং প্রার্থী পুরুষ কেউ নেই বলে। তাদের অগম্য কেউ নেই, বয়সের জন্যেও তাদের কিছু আটকায় না। কুৎসিত হোক, রূপবান না হোক, পুরুষ হলেই চলে। যে পুরুষ তার প্রেমে মজেছে, তাকে নিয়ে মজা করতে মেয়েদের বেশ লাগে। সে যেন তাদের নিতম্বে-বিনিবেশিত রাঙা শাড়ি, আঁচলটা ঝুলিয়ে হঠাৎ টেনে নিয়ে যেতে কী মজা। তারা যেমন সবলে নিঙড়ে রাঙা আলতা পরে, তেমনি অনুরক্ত পুরুষকেও পায়ের নিচে ফেলে দেয়।

পঞ্চতন্ত্র-এর প্রায় প্রত্যেক তন্ত্রে কমবেশি নারীদের ব্যভিচারের প্রমাণ পাওয়া যায়। মিত্রভেদে 'সন্ন্যাসী, ধূর্ত, শেয়াল ও দুই দুষ্টা' গল্পে তৎকালীন সমাজের নারীদের ব্যভিচারের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে –

পর্যঙ্কেষ্বাস্তরণং পতিমনুকূলং মনোহরং শয়নম্।
তৃণমিব লঘু মন্যন্তে কামিন্যশ্চৌর্যরতলুব্ধাঃ॥
কেলিঃ প্রদহতি মজ্জাং শৃঙ্গারোঽস্থীনি চাটবঃ কটবঃ।
বন্ধক্যাঃ,পরিতোষো ন স্যাদনভীষ্টদম্পত্যোঃ॥
কুলপতনং জনর্গহা বন্ধনমপি জীবিতব্যসন্দেহম্।
অঙ্গীকরোতি সকলমবলা পরপুরুষসংসক্তা॥ ১/১৭৫-১৭৭
শম্বরস্য চ যা মায়া যা মায়া নমুচেরপি।
বলেঃ কুম্ভীনসেশ্চৈব সর্বাস্তা যোষিতো বিদুঃ॥
হসন্তং প্রহসন্ত্যেতা রুদন্তং প্ররুদন্ত্যপি।
অপ্রিয়ং প্রিয়বাক্যৈশ্চ গৃহ্নন্তি কালযোগতঃ॥
উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ বেদ বৃহস্পতিঃ।
কস্ত্রীবুদ্ধ্যা ন বিশেষ্যেত তস্মাদ্ রক্ষ্যাঃ কথং হি তাঃ॥১/১৮৪-১৮৬

অর্থাৎ, পালঙ্কে মনোরম বিছানা, অনুকূল পতি এবং মনোহর শয়নকে তৃণসম জ্ঞান করে গোপন-প্রণয়-লুব্ধ মেয়েরা। খারাপ রমণীর স্বামীর প্রেমে মন জুড়ায় না, ভালোবাসায় হাড় জ্বালিয়ে স্বামীর প্রশংসামূলক বাক্যও খারাপ লাগে। কিন্তু পারস্পরিক ভালোবাসা না হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তো সুখ হয় না। যে মেয়ে পরপুরুষে আসক্ত সে কুল-হারানো, লোকনিন্দা, বন্দীদশা, এমন কি জীবন বিসর্জন সব সইতে রাজী থাকে। যেমন, যত ভেলকি জানত শম্বর, যত জাদু জানত নমুচি, আর যত কুম্ভীনসি-সব কটা জানে মেয়েরা। যখন যেমন দরকার পড়ে, সেইভাবে নারীরা পুরুষকে কাছের করে, হাসন্ত-র সঙ্গে হাসে, কাঁদন্ত-র সঙ্গে কাঁদে। যাকে ভালোবাসে না তার সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। ভাগবতকার শুক্রাচার্য যে-শাস্ত্র জানেন এবং যা জানেন মুনি বৃহস্পতি, নারীর বুদ্ধির চেয়ে বেশি নয়। অতএব নারীদের ধরে রাখা কঠিন ব্যাপার।

অপরীক্ষিতকারক নামক তন্ত্রে 'রাক্ষস ও ব্রাহ্মণ' গল্পে নারীদের ব্যভিচারের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে নারীর চরিত্রের রূপ পরিবর্তনের নানা কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন –

যদি স্যাচ্ছীতলো বহ্নিশ্চন্দ্রমা দহনাত্মকঃ।
সুস্বাদঃ সাগরঃ স্ত্রীণাং তৎ সতীত্বং প্রজায়তে॥৫/৯৩

অর্থাৎ, আগুন যদি ঠাণ্ডা হতো, চাঁদ যদি কিরণে পোড়াতে পারত, সাগরে যদি সুস্বাদু জল পাওয়া যেত, তবেই স্ত্রীলোক সতী হতো।

একই গল্পে পরিব্রাজক দেবশর্মা নারীদের কাছ থেকে পুরুষকে সর্বদা সতর্ক থাকার কথা বলেছেন। কারণ পুরুষ যদি নারীর মতো উচ্ছল ও সতত সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে ব্যস্ত থাকে, তবে সমাজ ও রাষ্ট্রের দায় নেবে কে? নারীর বহুরূপ আছে। তার শত বুদ্ধি ব্যয় হয় পুরুষকে পটাতে, আর এতে সফল হলেই ব্যাস, তারপর রীতিমতে মজা করে কেটে পড়া। এ প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকার দেবশর্মার উক্তিতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন –

নাতিপ্রসঙ্গঃ প্রমদাসু কার্যো নেচ্ছেদ্বলং স্ত্রীষু বিবর্ধমানম্।
অতিপ্রসক্তৈঃ পুরুষৈর্যতস্তাঃ ক্রীড়ন্তি কাকৈরিব লূনপক্ষৈঃ॥
সমুখেন বদন্তি বল্গুনা প্রহরন্ত্যেব শিতেন চেতসা।
মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং হৃদয়ে হালহলং মহদ্বিষম্॥
অতএব নিপীয়তেঽধরো হৃদয়ং মুষ্টিভিরেব তাড্যতে।
পুরুষৈঃ সুখলেশবঞ্চিতৈর্মধুলুব্ধৈঃ কমলং যথালিভিঃ॥
আবর্তঃ সংশয়ানামবিনয়ভবনং পত্তনং সাহসানাং
দোষাণাং সন্নিধানং কপটশতগৃহতং ক্ষত্রমপ্রত্যয়ানাম্।
দুর্গ্রাহ্যং যন্মহদ্ভির্নরবরবৃষভৈঃ সর্বমায়াকরণ্ডং
স্ত্রীযন্ত্রং কেন লোকে বিষমমৃতপূতং ধর্মনাশায় সৃষ্টম্॥
কার্কশ্যং স্তনয়োর্দৃশোস্তরলতালীকং মুখে দৃশ্যতে
কৌটিল্যং কচসংঞ্চয়ে প্রবচনে মান্দ্যং ত্রিকে স্থূলতা।
ভীরুত্বং হৃদয়ে সদৈব কথিতং মায়াপ্রয়োগঃ প্রিয়ে
যাসাং দোষগণো গুণা মৃগদৃশাং তাঃ কিং নরাণাং প্রিয়াঃ॥
এতা হসন্তি চ রুদন্তি চ কার্যহতোবিশ্বাসয়ন্তি চ পরং ন চ বিশ্বসন্তি।
তস্মান্নরেণ কুলশীলবতা সদৈব নার্যাঃ শ্মশানঘটিকা ইব বর্জনীয়াঃ॥

কুর্বন্তি তাবৎ প্রথমং প্রিয়াণি যাবন্ন জানন্তি নরং প্রসক্তম্ ।
জ্ঞাত্বাথ তং মন্থথপাশবদ্ধং গ্রস্তামিষং মীনমিবোদ্ধরন্তি ॥
সমুদ্রবীচীব চলস্বভাবাঃ সন্ধ্যাভ্ররেখেব মুহূর্ত রাগাঃ ।
স্ত্রিয়ঃ কৃতার্থাঃ পুরুষং নিরর্থং নিষ্পীড়িতালক্তকবৎ ত্যজন্তি॥
অনৃতং সাহসং মায়া মূর্খত্বমতিলোমতা ।
অশৌচং নির্দয়ত্বং চ স্ত্রীণাং দোসাঃ স্বভাবজঃ॥
অন্তর্বিষময়া হ্যেতা বহিশ্চৈব মনোরমাঃ ।
গুঞ্জাফলসমাকারা যোষিতঃ কেন নির্মিতাঃ॥ ১/১৮৮-১৯৭

অর্থাৎ, মেয়েদের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হবে না। মেয়েদের বল-বুদ্ধি-সহায়তা চাইবে না। কেননা, অত্যাসক্ত পুরুষদের নিয়ে তারা ডানা-কাটা কাকের মতো খেলা করে। সুন্দর সহাস্য মুখে চমৎকার করে কথা বলে, হৃদয়কে শীতল করে দেয়। তাই দিয়ে করে চলে কেবল প্রহার। তাদের মুখনিঃসৃত বাক্যে শুধু মধু কিন্তু হৃদয়ে ভীষণ গরল। তাই তো পুরুষেরা এতটুকু সুখের মিথ্যে ছলনায় ভুলে পদ্মমধুলুব্ধ ভ্রমরের মতো তাদের অধর-পান করে বটে, আবার পরক্ষণেই হৃদয়কে মুষ্টি দিয়ে তাড়না করে। সংসারের ঘুর্ণিপাকে, ঔদ্ধত্যের নিকেতন, যত দুঃসাহসের নগর, দোষের মিলন স্থান, শত শত ছলনার গৃহ, অবিশ্বাসের আকর হলো নারীরা। তাদের মহা মহা নরশ্রেষ্ঠরা ধরতে পারে না, মৌচাক মায়ায় বিষামৃত, স্ত্রী-যন্ত্রকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুনিয়ার সবার ধর্ম নষ্ট করতে। যত সব দোষ, সেগুলিই গুণ হয়ে দেখা দিয়েছে তাদের সর্বাঙ্গে, যেমন – বুকে কাঠিন্য, চোখে চাঞ্চল্য, মুখে মিথ্যা ও অলীক কথা, কেশভারে কৌটিল্য (ঢেউ খেলানো ভাব, কুটিলতা), বলনে-মান্দ্য (ধীরে ধীরে থেমে থেমে বলা, জড়তা), জঘনে স্থুলতা হৃদয়ে সর্বদাই নাকি ভীরুত্ব (সলজ্জভাব, ভয়) এবং প্রিয়ে মায়াপ্রয়োগ(সস্নেহ আচরণ, তুকতাক) এই মৃগাক্ষীরাই পুরুষের প্রিয় থেকে প্রিয়তর। এরা সুযোগ বুঝে হাসে এবং কাঁদে। অপরকে পটায়, কিন্তু নিজে পটে না। অতএব সচ্চরিত্র অভিজাত ব্যক্তি মেয়েদের ত্যাগ করবে শ্মশানের ঘটের মতো। নারীরা যতদিন না নিশ্চিত হয়, মানুষটা তার প্রতি আসক্ত, ততদিন সে যাতে খুশি হয় তাই করে। যেই বুঝতে পারে, প্রেম-পাশে বাঁধা পড়েছে, অমনি টোপ-গেলা মাছের মতো টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সমুদ্রের

ঢেউয়ের মতো চঞ্চল স্বভাব, সন্ধ্যার মেঘের রেখার মতো এক মুহূর্তের জন্যেই রঙিন হয়ে ওঠা স্ত্রীলোকেরা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে (টাকা-পয়সা নিয়ে) অর্থহীন পুরুষকে নেঙড়ানো আলতার মতোই ত্যাগ করে। মিথ্যে হঠকারিতা (বা দুঃসাহস) ছলনা, বোকামি, অতিলোভ, অসাধুতা, নির্দয়তা – এসব দোষ স্ত্রীলোকের স্বভাবের মধ্যেই বেশি থাকে। তাদের ভেতরটা বিস্ময়, বাইরেটা মনোরম-কুঁচফলের মতো দেখতে। এই স্ত্রীলোকদেরকে সৃষ্টি করেছেন কে?

তবে 'বিষ্ণুরূপধারী তাঁতি' গল্পে রাজার অন্তরে কন্যার জন্য ব্যাকুল চিত্তের নানা ধরনের আকুতি আমরা প্রত্যক্ষ করি। এখানে তৎকালীন সময়ে নারীর প্রতি পিতৃহৃদয়ের হাহাকারের পরিচয় মেলে –

পুত্রীতি জাতা মহতীহ চিন্তা কস্মৈ প্রদেয়েতি মহান্ বিতর্কঃ।
দত্তা সুখং প্রাপ্স্যতি বা ন বেতি কন্যাপিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্॥
জননীমনো হরতি জাতবতী পরিবর্ততে সহ শুচা সুহৃদাম্।
পরসাৎকৃতাপি কুরুতে মলিনং দুরতিক্রমা দুহিতরো বিপদঃ॥ ১/২০৫-২০৬

অর্থাৎ, মেয়ে হলে পিতার চিন্তার শেষ থাকে না। কার হাতে দেব, এ এক বিরাট সমস্যা, দিলে মেয়ে সুখী হবে কি হবে না? মেয়ের পিতা হওয়া নিদারুণ জ্বালা। মেয়ে জন্মালেই মায়ের প্রাণ উড়ে যায় প্রায়। ক্রমে ক্রমে সে যত বড়ো হয়, আত্মীয়স্বজন-শুভাকাঙ্ক্ষীদের দুশ্চিন্তাও ততই বাড়ে। বিয়ে দিয়েও নিস্তার নেই, পিছে কেলেঙ্কারি করে বসে কিনা। মেয়ে তো নয় যেন দুস্তরণীয় আপদ একটা।

মিত্রপ্রাপ্তি তন্ত্রে 'ষাঁড় ও শেয়াল দম্পতি' গল্পে পঞ্চতন্ত্রকার স্ত্রীর কথাকে অস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেননা, স্ত্রী বাক্য অত্যন্ত ধারালো অলঙ্ঘনীয়। এখানে স্ত্রী স্বামীকে যেভাবে কাজ করতে বলেছেন সে অনুসারেই কাজ করতে হয়েছে। সে কাজ অসম্ভব হলেও চেষ্টা করতে হয়েছে। স্ত্রীর কথায় প্রলোভককে পনের বছর অসম্ভবের পেছনে ঘুরতে হয়েছে। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে তার প্রমাণ মেলে –

তাবৎ স্যাৎ সর্বকৃত্যেষু পুরুষেঽত্র স্বয়ং প্রভুঃ।

স্ত্রীবাক্যাঙ্কুশবিক্ষুণ্ণো যাবন্নোদ্ভ্রিয়তে বলাৎ॥
অকৃত্যং মন্যতে কৃত্যমগম্যং মন্যতে সুগম্
অভক্ষ্যং মন্যতে ভক্ষ্যং স্ত্রীবাক্যপ্রেরিতো নরঃ॥২/১৪৭-১৪৮

অর্থাৎ, সংসারে পুরুষ ততক্ষণই স্বাধীন স্ত্রীর বাক্যাঙ্কুশ যতক্ষণ না বিঁধে। স্ত্রীর কথাতে লোকে অকৃত্যকে কৃত্য ভাবে, দুর্গমকে সুগম ভাবে, অখাদ্যকে খাদ্য ভাবে, মন্দকে ভালো ভাবে।

পঞ্চতন্ত্রে ক্ষেত্র বিশেষে অর্থকে অত্যন্ত বড় করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু কাকোলূকীয় তন্ত্রে অর্থের চেয়ে পত্নীকে বড় করে দেখিয়ে নারীর মূল্যায়ন করা হয়েছে –

আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্ দারান্ রক্ষেদ্ ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি॥৩/৮৫

অর্থাৎ, বিপদের জন্য টাকা বাঁচাবে। পত্নীকে বাঁচাবে তাতে টাকা যায় যাক। পত্নী যাক টাকা যাক, নিজেকে সর্বদা বাঁচাবে।

একই তন্ত্রে তৎকালীন সময়ে নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি উভয়ের আন্তরিকতা প্রত্যক্ষ করা যায়। বিষ্ণুশর্মা সেই গভীর ভালোবাসা 'ব্যাধ ও কপোত দম্পতি গল্পে' কপোত-কপোতীর উক্তিতে বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছেন। একটি গাছের কুঠরিতে বসবাসরত একটি পায়রা স্ত্রীর বিরহে কাতর হয়ে নিম্নোক্ত বিলাপ করেছিল –

তস্যাহং শরণং প্রাপ্তঃ স পরিত্রাতু মামিতি।
শীতেন ভিদ্যমানং চ ক্ষুধয়া গতচেতসম্॥
অথ তস্য তরোঃ স্কন্ধে কপোতঃ সুচিরোষিতঃ।
ভার্যাবিরহিতস্তিষ্ঠন্ বিললাপ সুদুঃখিতঃ॥
বাতবর্ষো মহানাসীন্ন চাগচ্ছতি মে প্রিয়া।
ত্বয়া বিরহিতং হ্যেতচ্ছূন্যমদ্য গৃহং মম॥
পতিব্রতা পতিপ্রাণা পত্যুঃ প্রিয়হিতে রতা।
যস্য স্যাদীদৃশী ভার্যা ধন্যঃ স পুরুষো ভুবি॥

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
গৃহং হি গৃহিণীহীনমরণ্যসদৃশং মতম্॥
পঞ্জরস্থা ততঃ শ্রুত্বা ভর্তুর্দুঃখান্বিতং বচঃ।
কপোতিকা সুসন্তুষ্টা বাক্যং চেদমাহ সা॥
ন সা স্ত্রীত্যভিমন্তব্যা যস্যাং ভর্তা ন তুষ্যতি ।
তুষ্টে ভর্তরি নারীণাং তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ॥
দাবাগ্নিনা বিদগ্ধেব সপুষ্পস্তবকা লতা।
ভস্মীভবতু সা নারী যস্যাং ভর্তা ন তুষ্যতি॥৩/১৪৩–১৫০

অর্থাৎ, এত ঝড়বৃষ্টি হলো, কই আমার প্রিয়া তো এখনো ফিরল না। তাকে ছাড়া আজ শূন্য আমার এ ঘর। এমন পতিব্রতা-পতিপ্রাণা পতির প্রিয়হিতে রত যার স্ত্রী, সে পুরুষ ধন্য এ পৃথিবীতে। স্ত্রী বিহীন ঘর অর্থহীন। সে ঘর প্রকৃত ঘর নয়। সেটা যেন অরণ্যের সমতুল্য। খাঁচার

মধ্যে থেকে স্বামীর এই বেদনা ভরা কথাগুলো শুনে কপোত স্ত্রী বড়োই সন্তুষ্ট হলো। যে নারীর প্রতি স্বামী সন্তুষ্ট নয়, দাবানলে পুষ্পস্তবকিতা লতা যেমন পুড়ে যায়, তেমনি তারা পুড়ে ছাই হোক। নারীদের স্বামী তুষ্ট হলেই সব দেবতা তুষ্ট। পিতা পরিমিত দেন, ভাইও পরিমিত দেয়, পুত্র পরিমিত দেয়। অপরিমিত যিনি দেন, সেই স্বামীকে সব স্ত্রীই মাথায় করে রাখবে।

লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে মেয়েরা যে পুরুষকে ফাঁদে ফেলে কিংবা জোর করে অমানবীয় কাজ করায়, সিদ্ধান্ত থেকে এক বিন্দুও নড়ে না, শত অনুরোধ ও ক্ষমা ভিক্ষা করেও নারীদের কাছ থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। এখানে তার প্রমাণ পাওয়া যায় –

ময়ি তে পাদপতিতে কিঙ্করত্বমুপাগতে।
ত্বং প্রাণবল্লভে কস্মাৎ কোপনে কোপমেষ্যসি॥
সাপি তদ্ববচনমাকর্ণ্যাশ্রুপ্লুমুখী তমুবাচ –
সার্ধং মনোরথশতৈস্তব ধূর্ত কান্তা
সৈব স্থিতা মনসি কৃত্রিমভাবরম্যা।

অস্মাকমস্তি ন কথঞ্চিদিহাবকাশ-

স্তস্মাৎ কৃতং চরণপাতবিড়ম্বনাভিঃ॥৪/৮-৯

অর্থাৎ, তোমার নফর আমি, ওগো, পায়ে পড়ি, কেন রাগ কর চণ্ডী প্রাণেশ্বরী। এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে মকরী বলল – মজেছ কোন মন-ভোলানীর রঙে-ঢঙে। তাকে আমা হতে বেশি ভালোবাস, শত সাধে তাকেই মনে রেখেছ ঘিরে। ওরে ধূর্ত, কোথায় আমার স্থান? সুতরাং পায়ে পড়া-টড়া ওসব রঙ্গ রাখো।

'সিংহ শেয়াল ও গাধা' গল্পে পঞ্চতন্ত্রকার শেয়ালের উক্তিতে নারী চরিত্রের ভালো–মন্দ দুটি দিকই ফুটিয়ে তুলেছেন। একদিকে নারীর ভালোবাসায় যেমন জীবন বিপন্ন হতে পারে, তেমনি একে-অপরের মিলিত সাধনায় জীবনে মুক্তি মেলে। যেমন –

নামৃতং ন বিষং কিঞ্চিদেকাং মুক্ত্বা নিতম্বিনীম্।
যস্যাঃ সঙ্গেন জীব্যেত ম্রিয়েত চ বিয়োগতঃ॥
যাসাং নাম্নাপি কামঃ স্যাৎ সঙ্গমং দর্শনং বিনা।
তাসাং দৃক্সঙ্গমং প্রাপ্য যন্ন দ্রবতি কৌতুকম্॥
স্ত্রীমুদ্রাং ঋর্ষকেতনস্য জয়িনীং সর্বার্থসম্পৎকরীং
যে মূঢ়াঃ প্রবিহায় যান্তি কুধিয়ো মিথ্যাফলান্বেষিণঃ।
তে তেনৈব নিহত্য নির্দয়তরং নগ্নীকৃতা মুণ্ডিতাঃ।
কেচিদ্ রক্তপটীকৃতাশ্চ জটিলাঃ কাপালিকাশ্চাপরে॥৪/৩৪-৩৬

অর্থাৎ, নারী ছাড়া অমৃত কিছু নেই, অবার এর চেয়ে বিষও কিছু নেই। নারীর মিলনে জীবন, বিরহে মরণ। যাদের দেখার আগেই, পাওয়ার আগেই, নামেই রতির উদয়, তাদের আঁখিতে আঁখিতে মদির-মিলনে হৃদয় গলবে না, তা কি হয়? সর্বার্থ সাধিকা নারী মদনের বিজয়-পতাকা। যে-সব দুর্বুদ্ধি মূঢ় তাকে ছেড়ে মিথ্যে সিদ্ধি খুঁজে ফেরে এদিক-ওদিক, নির্দয় প্রহার দিয়ে তাদের মদন করে নাগা সন্ন্যাসী, দিগম্বর, ন্যাড়া-মাথা, কাউকে পড়ায় লাল-কাপড়, কাউকে বা জটাধারী, কাউকে কাউকে শ্মশানবাসী।

‘তিন মুনি’ গল্পে তৎকালীন সমাজে বাল্য বিয়ের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে বিষটি অত্যন্ত অমানবিক। এখানে বলা হয়েছে কন্যাকে বিয়ে দিতে হবে যৌবনবতী হওয়ার আগেই এবং যৌবনবতী কন্যাকে পিতৃগৃহে দেখলেও বাবা-মা ও দাদার অমঙ্গল হয়। এটি সেসময়ে একটি সামাজিক বিধি-নিষেধ ছিল বলে ধারণা পাওয়া যায়। মুনি শালঙ্কায়নের উক্তিতে যেমন –

অনূঢ়া মন্দিরে যস্য রজঃ প্রাপ্নোতি কন্যকা।
পতন্তি পিতরস্তস্য স্বর্গস্থা অপি তৈর্গুণৈঃ৷৷
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্৷৷৪/৬৫, ৬৮

অর্থাৎ, যার গৃহে অনূঢ়া কন্যা যৌবনবতী হয়, বহুগুণ থাকার পরও পিতা-মাতাসহ স্বর্গস্থ তার পিতৃগণও অধঃগামী হয়। মূলত অবিবাহিত মেয়েকে যৌবনবতী দেখলে মা বাবা এবং দাদা এরা তিনজনই ঘোর নরকে যায়।

কন্যা পাত্রস্থ করার ক্ষেত্রে বর্তমান সমাজের মানুষ যেমন কতগুলো ধারণা পোষণ করে, তৎকালীন সমাজেও তেমনি স্বয়ং মেয়ে, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন সর্বোপরি সমাজস্থ লোকদের কতগুলো আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন –

বরং রয়তে কন্যা মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ৷৷৪/৬৬

অর্থাৎ, মেয়ে চায় সেরা বর, মা চায় টাকা-পয়সা’য়ালা জামাই, বাবার ইচ্ছে-ছেলে লেখাপড়া জানা হোক। আত্মীয়রা চায় ভালো বংশ। আর ভালো ভালো খাবার পেলে বাকিরা সবাই খুশি থাকে।

পঞ্চতন্ত্রকার কন্যা বিবাহের জন্য উপযুক্ত সময় কখন? কোন বরের কাছে কন্যা সম্প্রদান করা উচিৎ এবং কোন বরের কাছে কন্যা সম্প্রদান উচিত নয়। সে সম্পর্কে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, তৎকালীন সময়ে পণ্ডিতগণ

নারীদের নিয়ে ভাবতেন এবং পিতা-মাতা তথা অভিভাবকদের সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে কন্যার বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করতেন। যেমন –

যাবন্ন লজ্জতে কন্যা যাবৎ ক্রীড়তি পাংসুনা ।
যাবত্তিষ্ঠতি গোমার্গে তাবৎ কন্যাং বিবাহয়েৎ॥
কুলং চ শীলং চ সনাথতাং চ বিদ্যাং চ বিত্তং চ বপুর্বয়শ্চ।
এতান্ গুণান্ সপ্ত পরীক্ষ্য দেয়া কন্যা বুধৈঃ শেষমচিন্তনীয়ম্॥
দুরস্থানামবিদ্যানাং মোক্ষধর্মানুবর্তিনাম্।
শূরাণাং নির্ধনানাং চ ন দেয়া কন্যকা বুধৈঃ॥৪/৬৭, ৬৯-৭০

অর্থাৎ, যতদিন মেয়ে লজ্জা না পায়, যতদিন ধুলো-খেলা করে এবং যতদিন গরুদের আসা-যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে থাকে, তার মধ্যেই তাকে বিয়ে দিতে হবে। এছাড়া ভালো বংশ, সচ্চরিত্র, গুরুজন আছে, বিদ্যে, টাকা, সুঠাম শরীর, বয়েসটা যৌবন এই সাতগুণ যাচাই করে বিজ্ঞ কন্যা পাত্রস্থ করবেন। তারপর দেখার কিছু নেই, যা হবার হবে। আর যেসব লোকের কাছে কন্যা সম্প্রদান করবেন না সে বিষয় সম্পর্কেও পঞ্চতন্ত্রকার পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন – যারা বহুদূরে থাকে, বিদ্যে নেই, মোক্ষধর্মের অনুশীলন করে দুঃসাহসী এবং টাকাকড়ি নেই ।

তবে সর্বোপরি এ ক্ষেত্রে পঞ্চতন্ত্রকার কন্যার সিদ্ধান্তকেই গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। সে ক্ষেত্রে বর যতই রূপবান হোক না কেন। যেমন –

অনিষ্টঃ কন্যাকায়া যো বরো রূপান্বিতোঽপি যঃ।
যদি স্যাৎ তস্য নো দেয়া কন্যা শ্রেয়োঽভিবাঞ্ছতা॥
ন সুবর্ণং ন রত্নানি ন চ রাজ্যপরিক্রিয়াম্।
তথা বাঞ্ছন্তি কামিন্যো যথাভীষ্টতমং বরম্॥৪/৭১-৭২

অর্থাৎ, বর রূপবান হলেও মেয়ের যদি পছন্দ না হয়, তাহলে কন্যার মঙ্গলার্থে সেখানে মেয়ে বিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। মেয়েরা সাধারণত সোনাদানা, রাজসিক সুখাড়ম্বর চায় না তারা চায় মনের মতন বর।

এ বিষয়গুলো মূলত কন্যার অন্তরের গভীর আকুতিকে স্বাগত জানানো। সে ক্ষেত্রে তাদের দাম্পত্য জীবনও সুখের হয়। তৎকালীন সময়ে বিষ্ণুশর্মার দেওয়া অত্যন্ত সুন্দর উপদেশ বর্তমান সময়েও শিক্ষণীয়। অভিভাবকরা এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে কন্যাকে বিয়ে দিতে পারেন।

'বৃদ্ধবণিক ও চোর' গল্পে স্ত্রী বিহীন ঘর যেমন অন্ধকারের সামিল, তেমনি অবাধ্য-অমানবিক-কুলটা স্ত্রী ঘরে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। এমনকি তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখাও ঠিক নয়। এ সম্পর্কে পঞ্চতন্ত্রকার নানা ধরনের মন্তব্য করে তৎকালীন সময়ের নারীদের খারাপ দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন –

যা ভার্যা দুষ্টচরিতা সততং কলহপ্রিয়া।
ভার্যারূপেণ সা জ্ঞেয়া বিদগ্ধৈর্দারুণা জরা॥
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন নামাপি পরিবর্জয়েৎ।
স্ত্রীণামিহ হি সর্বাসাং য ইচ্ছেৎ সুখমাত্মনঃ॥
কে নাম ন বিনশ্যন্তি মিথ্যাজ্ঞানান্বিতস্বিনীম্।
রম্যাং বুদ্ধোপসর্পন্তি যে জ্বালাং শলভা ইব॥
অন্তর্বিষয়া হ্যেতা বহিশ্চৈবং মনোরমাঃ।
গুঞ্জাফলসমাকারাঃ স্বভাবাদেব যোষিতঃ॥
যদন্তস্তন্ন জিহ্বায়াং যজ্জিহ্বায়াং ন তদ্বহিঃ।
যদ্বহিস্তন্ন কুর্বন্তি বিচিত্রচরিতাঃ স্ত্রিয়ঃ॥
তাড়িতা অপি দণ্ডেন শস্ত্রৈরপি বিখণ্ডিতাঃ।
ন বশং যোষিতা যান্তি ন দানৈর্ন চ সংস্তবৈঃ॥
আস্তাং তাবৎ কিমন্যেন দৌরাত্ম্যেনেহ যোষিতাম্।
বিধৃতং স্বোদরেণাপি ঘ্নন্তি পুত্রমপি স্বকম্॥
রুক্ষায়াং স্নেহসদ্ভাবং কঠোরায়াং সুমার্দবম্।
নীরসায়াং রসং বালো বালিকায়াং বিকল্পয়েৎ॥
যদর্থং স্বকুলং ত্যক্তং জীবিতার্ধং চ হারিতম্।
সা মাং ত্যজতি নিঃস্নেহা কঃ স্ত্রীণাং বিশ্বসেন্নরঃ॥৪/৮০–৮৬, ৯৮

অর্থাৎ, পণ্ডিতেরা বলেন, কুঁদুলে-কুকাজে যার আকর্ষণ, সে প্রকৃতপক্ষে পত্নী নয়, সে ভয়ঙ্করী জরা পত্নী। সুখী হতে হলে প্রাণপণ চেষ্টা করে সে রমণীকে এড়িয়ে চলতে হবে। এমন কি তার নাম পর্যন্ত মুখে আনা যাবে না। আগুনে যেমন পতঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তেমনি নারীর ছলনায় ভুললেও একই দশা হয়। নারীর বাইরেটা কুঁচফলের মতো সুন্দর ও আকর্ষণীয় কিন্তু অন্তরটা বিষময়। তাদের মনে যা থাকে তা তারা কখনও মুখে বলে না। বরং চেপে রেখে দেয় মনের অন্তরালে। আবার কথা যা বলে সে অনুযায়ী কাজ করে না। এগুলো নারী চরিত্রের সব বৈচিত্র। তাকে ভালোবাসলে, তোষামোদ করলে, লাঠি দিয়ে প্রহার করলে, অস্ত্র দিয়ে বিচ্ছিন্ন করলেও বশ করা যায় না। মেয়েদের এসব শয়তানির কথা বলে কোনো লাভ নেই। নিজের পেটের ছেলেকেও সে প্রয়োজনে মেরে ফেলে। যে এরকম রুক্ষ, কঠোর এবং নীরস নারীতে স্নেহ-ভালোবাসার অস্তিত্ব, অতি সুকোমল ভাব এবং রস কল্পনা করে, সে নিতান্তই ছেলেমানুষি-নির্বোধ-বোকা। নারীর জন্যে কুল ছাড়লে, আত্মীয়স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বিসর্জন দিলে, এমনকি তাকে অর্ধেক জীবন দিয়ে দিলেও, তবুও তার মনে এটুকু দয়া-মায়ার উদ্রেক হয় না। এসব কারণে সহজে নারীকে কেউ বিশ্বাস করে না।

অপরীক্ষিত কারক নামক তন্ত্রে 'তাঁতি মন্থরক' গল্পে তাঁতির বন্ধু নারীদের থেকে সাবধান হতে বলেছেন। এর মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। সেখানে নারীদের ভাত-কাপড়-সোনা-গয়নাসহ সকল উপকরণ দেওয়া যায় কিন্তু তার সঙ্গে মন্ত্রণা করা যায় না। এছাড়া এ গল্পে নারীদের নানা স্বার্থপরতার কথাও বলা হয়েছে। যেমন –

ভোজনাচ্ছাদনে দদ্যাদ্ ঋতুকালে চ সঙ্গমম্।
ভূষণাদ্যং চ নারীণাং ন তাভির্মন্ত্রয়েৎ সুধীঃ॥
যত্র স্ত্রী যত্র কিতবো বালো যত্র প্রশাসিতা।
রাজন্নির্মূলতাং যাতি তদ্ গৃহং ভার্গবোঽব্রবীৎ॥
তাবৎ স্যাৎ সুপ্রসন্ন্যস্যস্তাবদ্ গুরুজনে রতঃ।
পুরুষো যোষিতাং যাবন্ন শৃণোতি বচো রহঃ॥

এতাঃ স্বার্থপরাঃ নার্যঃ কেবলং স্বসুখে রতাঃ।

ন তাসাং বল্লভঃ কোঽপি সুতেঽপি স্বসুখং বিনা॥৫/৬০–৬৩

অর্থাৎ, মেয়েদের ভাত-কাপড়-গয়না টয়না দেওয়া যায় কিন্তু বুদ্ধিমান লোক তাদের সঙ্গে মন্ত্রণা করবে না। যে বাড়ি নারী, জুয়াড়ি, বালকের নির্দেশে পরিচালিত হয়, শুক্রাচার্যের মতে সে-বাড়ি উচ্ছন্নে যায়। একান্তে নারীর কথা পুরুষ যতক্ষণ না শোনে, ততক্ষণই পিতা-মাতা. গুরুজনের প্রতি তার শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং সহাস্য বদন থাকে। স্বার্থপর মেয়েরা কেবলই আত্মসুখপরায়ণা হয়। কেউই তাদের কাছে প্রিয়-আপন জন হতে পারে না। এমনকি নিজের পুত্রও নয়।

এভাবে বিষ্ণুশর্মা তৎকালীন সমাজে নারীদের অবস্থা তার নিখুঁত লেখনীর মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। সর্বকালে ভালো-মন্দ দুটি বিষয়ই থাকে। *পঞ্চতন্ত্র*-এর যুগেও নারীদের নিয়েও ছিল। বুদ্ধিমান পুরুষের উচিত এসব বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মেনে বুঝে চলা। তবে নারীদের এ অবস্থার জন্য শুধু তারাই দায়ী নয়, সমাজও দায়ী ছিল বলে মনে হয়। সমাজ-সংসারের কঠিন বাস্তবতায় বরং পরুষকেই সামলে নিতে হয়।

হিংসা

পঞ্চতান্ত্রিক যুগে মানুষ শিক্ষা-দীক্ষা-মানবিক-আধ্যাত্মিক প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি হিংসা-বিদ্বেষ, পরচর্চা-পরনিন্দায়ও ব্যাপৃত ছিল। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা নানা উপমার মাধ্যমে সমাজের সেই বাস্তব চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন –

অত্তুং বাঞ্ছন্তি শাম্ভবো গণপতেরাখুং ক্ষুধার্তঃ ফণী

তং ক্রৌঞ্চরিপোঃ শিখী গিরিসুতাসিংহোঽপি নাগাশনম্।

ইত্থং যত্র পরিগ্রহস্য ঘটনা শম্ভোরপি স্যাদ্ গৃহে

তত্রান্যস্য কথং ন ভাবি জগতো যস্মাৎ স্বরূপং হি যৎ॥১/১৬০

প্রায়েণাত্র কুলান্বিতং কুকুলজাঃ শ্রীবল্লভং দুর্ভগা

দাতারং কৃপণা ঋজূননৃজবো বিত্তে স্থিতং নির্ধনাঃ।
বৈরূপ্যোপহতাশ্চ কান্তবপুষং ধর্মাশ্রয়ং পাপিনো
নানাশাস্ত্রবিচক্ষণং চ পুরুষং নিন্দন্তি মূর্খাঃ সদা॥
মূর্খাণাং পণ্ডিতা দ্বেষ্যা নির্ধনানাং মহাধনাঃ।
ব্রতিনঃ পাপশীলানামসতীনাং কুলস্ত্রিয়ঃ॥১/৪১৯-৪২০

অর্থাৎ, ক্ষুধার্ত শিবের সাপ গণেশের ইঁদুরটাকে খেতে চায়, কার্তিকের শিখী সাপটাকে খেতে চায়। আবার গৌরীর সিংহ ওগুলিকে খেতে চায়। দেবাদিদেব মহাদেবের পরিবারে যদি হয় এই অবস্থা, তাহলে সমাজে তো হিংসা বিদ্বেষ থকবে এটাই স্বাভাবিক। এমন সমাজ-সংসারে কুলীনকে দেষারোপ করে নীচকুলে জন্ম যার, ভাগ্যবান পুরুষকে দেষারোপ করে দুর্ভাগা, দাতাকে দেষারোপ করে কৃপণ, ধনীকে দেষারোপ করে দরিদ্রজন, গালি দেয় সরলকে বাঁকা, সুরূপকে কুরূপ যারা – হিংসা করে, অধার্মিককে ধার্মিক ব্যথা দেয় অবিরল। নানাশাস্ত্রে বিচক্ষণ মানুষকে যা তা বলে অশিক্ষিত নির্বোধের দল। পণ্ডিত মূর্খের দ্বেষের পাত্র, নিঃস্বের দ্বেষ্য ধনী। ব্রতী পাপীর কলঙ্কিনীর দ্বেষ্য কুল-কামিনী। অযোগ্যরা যোগ্যকে হিংসা করে থাকে।

এভাবে পঞ্চতন্ত্রকার তৎকালীন সমাজে হিংসা বিদ্বেষের চিত্র পাঠক সম্মুখে তুলে ধরেছেন।

আতিথেয়তা

পঞ্চতন্ত্র-এর প্রথমেই অতিথিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। মিত্রভেদে 'সন্ন্যাসী, ধূর্ত, শেয়াল ও দুই দুষ্টা' গল্পে গৃহে অতিথি আসা মানে গৃহ আলোকিত হওয়া এবং তাকে যথোপযুক্ত সমাদর করলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। তাকে সেবা করলে সকল দেবতা, দেবাদিদেব মহাদেব সর্বোপরি ভগবানও খুশি হন। যেমন –

সম্প্রাপ্তো যেঽতিথিঃ সায়ং সূর্যোঢ়ো গৃহমেধিনাম্।
পূজয়া তস্য দেবত্বং প্রযান্তি গৃহমেধিনঃ॥
স্বাগতেনাগ্নয়স্তৃপ্তা আসনেন শতক্রতুঃ।

পাদশৌচেন গোবিন্দো অর্ঘ্যাচ্ছম্ভুস্তথাতিথেঃ॥১/১৭১, ১৭৩

অর্থাৎ, গৃহস্থের বাড়িতে অতিথি সন্ধ্যাবেলা সূর্য বয়ে আনেন। তার সেবা-শুশ্রুসা করলে গৃহস্থ দেবতা হন। অতিথিকে আসুন বললে অগ্নি দেবতা খুশি হন। বসুন বললে ইন্দ্র দেবতা। অর্ঘ দিলে খুশি হন শিব ঠাকুর, পা ধুয়ে দিলে খুশি হন স্বয়ং ভগবান।

পরবর্তীতে পঞ্চতন্ত্রকার অতিথি সেবায় গৃহস্থের কল্যাণকর দিকের বিষয় আলোচনা করেছেন। গৃহে অতিথি আসলে তাঁর আদর-যত্ন করা, তার খোঁজ-খবর নেওয়ার কথা বেশ গুরুত্বের সাথে বলেছেন। তিনি অতিথি সেবাকে ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করে, সেবার মাধ্যমে স্বর্গ প্রাপ্তি তথা মোক্ষলাভের কথা বলেছেন। যেমন –

এহ্যাগচ্ছ সমাশ্বসাসনমিদং কস্মাচ্চিরাদৃশ্যসে
কা বার্তা স্বতিদুর্বলোঽসি কুশলং প্রীতোঽস্মি তে দর্শনাৎ ।
এবং নীচজনেঽপি যুজ্যতি গৃহং প্রাপ্তে সতাং সর্বদা
ধর্মেঽয়ং গৃহমেধিনাং নিগদিতঃ স্মার্তৈর্লঘুঃ স্বর্গদঃ॥ ১/২৫৬
এবং যে সমুপাগতান্ প্রণয়িনঃ প্রহলাদয়ন্ত্যাদরাৎ
তেষাং যুক্তমশঙ্কিতেন মনসা হর্ম্যাণি গন্তুং সদা॥২/৬৫
দূরমার্গশ্রমশ্রান্তং বৈশ্বদেবান্তমাগতম্।
অতিথিং পূজয়েদ্ যস্তু স যাতি পরমাং গতিম্॥৪/৪

অর্থাৎ, আহা এসো এসো বিশ্রাম গ্রহণ করো, এই নাও আসন, অনেকদিন আসনি যে ? খবর কী? বড়ো রোগা দেখছি যে? ভালো তো? বড়ই আনন্দ হলো দেখে। সজ্জন ব্যক্তিরা সামান্য লোকও বাড়িতে আসলে তাকে এইভাবে সমাদর করবেন। অপরদিকে বন্ধু-বান্ধব বাড়িতে এলেও আগ্রহ দেখিয়ে এভাবে যারা খুশি করে, স্মৃতিপণ্ডিতগণ বলেছেন, গৃহস্থদের এ ধর্ম অতি সহজে স্বর্গ এনে দেয়। দূরের পান্থ, শ্রমক্লান্ত, বৈশ্বদেবের অন্তে যে করে অতিথি সেবা-সৎকার, তার জীবনাবসানে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়।

এছাড়া বাড়িতে অতিথি এলে গৃহস্থ উপযুক্ত সম্মান না করলে পঞ্চতন্ত্রকার সে গৃহস্থকে কর্কশ ভাষায় বিদ্রুপ করেছেন এবং ভালোভাবে কথা না বললে সে বাড়িতে যেতে নিষেধ করেছেন। যেমন –

গৃহী যত্রাগতং দৃষ্ট্বা দিশো বীক্ষেত বাপ্যধঃ।
তত্র যে সদনে যান্তি তে শৃঙ্গরহিতা বৃষাঃ॥
নাভ্যুত্থানক্রিয়া যত্র নালাপা মধুরাক্ষরাঃ।
গুণদোষকথা নৈব তত্র হর্ম্যে ন গম্যতে॥২/৬৬-৬৭

অর্থাৎ, যে বাড়িতে অতিথি এলে গৃহস্থ ঊর্ধ্বে অথবা নিম্নে তাকায়, সে তো ষাঁড়ের ন্যায়। যে বাড়িতে গেলে কেউ দাড়াঁয় না, কেউ মিষ্টি ভাষায় কথা বলে না, ভালো মন্দ খোঁজ-খবর নেয় না সে বাড়িতে কারো যেতে নেই।

ব্যভিচার ও গণিকাবৃত্তি

পূর্বে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যভিচার সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন সময়ে নারী-পুরুষ উভয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। তবে এরকম নারী-পুরুষকে সমাজ ভালো চোখে দেখেনি। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা কিন্তু নারীকে কটাক্ষ করে মন্দ রমণী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, পুরুষকে মন্দ পুরুষ বলেননি। তবে সমাজের কঠিন বাস্তবতায় এজন্য পুরুষরাও সমভাবে দায়ী।

মিত্রভেদে 'সন্ন্যাসী, ধূর্ত, শেয়াল ও দুই দুষ্টা' গল্পে বিষ্ণুশর্মা দেবশর্মার উক্তিতে নারীকে মন্দ রমণী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন –

দুর্দিবসে ঘনতিমিরে দুঃসঞ্চারাসু নগরবীথীষু।
পত্যুর্বিদেশগমনে পরমসুখং জঘনচপলায়াঃ॥১/১৭৪

অর্থাৎ, প্রতিকূল আবহাওয়া, বাদল দিন, ঘন আঁধার, নগর-পথে চলা দুষ্কর, আবার স্বামী বহুদূরে যাচ্ছে তখন মন্দমেয়েরা মহাসুখী হয়। তখন কোনো নারী দূর পথ পাড়ি দিতে বাড়ি থেকে বের হয়, কারণ তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারবে।

একই গল্পে নারীকে তার সখী ব্যভিচারে সহায়তা করে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে সেকাজে প্রলুব্ধ করে তার প্রমাণও পাওয়া যায় –

সন্দিগ্ধে পরলোকে জনাপবাদে চ জগতি বহুচিত্রে।
স্বাধীনে পররমণে ধন্যাস্তারুণ্যফলভাজঃ ॥
যদি ভবতি দৈবযোগাৎ পুমান্ বিরূপোঽপি বন্ধকী রহসি।
ন তু কৃচ্ছ্রাদপি ভদ্রং নিজকান্তং সা ভজত্যেব॥ ১/১৮১-১৮২

অর্থাৎ, পরলোক আছে কি নেই তার ঠিক নেই, লোক যে কত রকমের বদনাম দেয় তারও কোনো আগা-গোড়া নেই, সুতরাং প্রেমিক যেখানে নাছোড়বান্দা, সেখানে যারা তারুণ্যের ফলভোগ করে তারাই ধন্য। মন্দরমণী দৈবযোগে নির্জনে যদি বিরূপ পুরুষও পায়, তাহলে নিজের সুন্দর পতিকেও সে আর কোনমতেই ভজনা করতে চায় না। অপরদিকে 'বিষ্ণুরূপধারী তাঁতি' গল্পে এক তাঁতি বন্ধুর সহায়তায় অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে রাজকন্যার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তারও প্রমাণ পাওয়া যায় –

সুপ্রযুক্তস্য দম্ভস্য ব্রহ্মাপ্যন্তং ন গচ্ছতি।
কৌলিকো বিষ্ণুরূপেণ রাজকন্যাং নিষেবতে॥ ১/২০৩

অর্থাৎ, কৌশল করে কাজ করলে ব্রহ্মাও যেমন ধরতে পারে না। তেমনি তাঁতি হয়ে বিষ্ণুরূপ ধরে রাজকন্যাকে ভোগ করে।

অপরীক্ষিত কারক তন্ত্রে 'চার ব্রাহ্মণযুবক ও মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা' গল্পে পঞ্চতন্ত্রকার তৃতীয়ার উক্তিতে গণিকাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন –

কিং তয়া ক্রিয়তে লক্ষ্ম্যা যা বধূরিব কেবলা।
যা ন বেশ্যেব সামান্যা পথিকৈরুপভুজ্যতে ॥৫/৩৭

অর্থাৎ, সেসম্পদ দিয়ে বলো কী হবে, বধূর মতো যা শুধু একজনের জন্য, গণিকার মতো সবার নয়, যাকে ভোগ করতে পারে পথ-চলতি মানুষেরা।

এ সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয় তৎকালীন সমাজে ব্যভিচার ও গণিকাবৃত্তি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং সমাজের কিছু মানুষ এ কাজে উৎসাহিত হতো।

মাদকাসক্তি

তৎকালীন সমাজে ব্যাপকভাবে মাদকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সমাজে উচ্চবৃত্ত থেকে আরম্ভ করে নিম্নবৃত্ত লোকজন সকলেই কমবেশি মাদকের প্রতি আসক্ত ছিল। মিত্রভেদে 'সন্ন্যাসী, ধূর্ত, শেয়াল ও দুই দুষ্টা' গল্পে বিষ্ণুশর্মার উক্তিতে মাদকাসক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় –'নেশায় টলছে সর্বাঙ্গ, চুলগুলো লটপট করছে, হাতে মদের ভাঁড়, পায়ে পায়ে হোঁচট খেতে খেতে আসছে। দেখেই বৌ হঠাৎ করে ঘুরে গিয়ে বাড়িতে এসে বেশ-ভূষা খুলে ফেলে আবার যে সেই।'[১০]

নেশা আসক্ত মানুষ এলোমেলো টালমেটাল অবস্থায় থাকে। মদ্যপান করে সঠিকভাবে চলতে পারে না। তার বেশ-ভূষা ঠিক থাকে না। এ প্রসঙ্গে তাঁতি বৌয়ের উক্তিতে মাদকাসক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় –

বৈকল্যং ধরণীপাতমযথোচিতজল্পনম্।
সন্নিপাতস্য চিহ্নানি মদ্যং সর্বাণি দর্শয়েৎ॥
করস্পন্দেঽম্বরত্যাগস্তেজোহানিঃ সরাগতা ।
বারুণীসঙ্গজাবস্থা ভানুনাপ্যনুভূয়তে ॥ ১/১৭৮-১৭৯

অর্থাৎ, মদ খেলে বেভুল ভাব দেখা দেয়, মুখে যা আসে তাই বলে, সে মাটিতে শুয়ে পড়ে আর বিভিন্ন অলীক কল্পনা আসে, পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে ফেলে দেয়। মানুষ কেন সূর্য দেবতারও নেশায় এরকম হয়।

মাদকাসক্ত লোকজন স্বভাবত উগ্র হয়। তাদের সাথে কখনও কথা বলতে নেই, কথা বললে হিতে বিপরীতই হয়। পঞ্চতান্ত্রিক যুগেও বিষ্ণুশর্মা 'বানররা ও সূচীমুখ' গল্পে সেরকম ইঙ্গিত দিয়েছেন –

আখেটকং বৃথাক্লেশং মূর্খং ব্যসনসংস্থিতম্ ।
আলাপয়তি যো মূঢ়ঃ স গচ্ছতি পরাভবম্ ॥১/৩৯২

অর্থাৎ, পণ্ডশ্রমী, শিকারী, মূর্খ, যারা মাদকাসক্ত – এদের সঙ্গে কথা বলাটাই নিছক বোকামির পরিচয়। এতে সম্মানের হানি ঘটে, বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

অপরপক্ষে মিত্রলাভ তন্ত্রে যারা মাদকাসক্ত নয়, এ রকম লোকদের পঞ্চতন্ত্রকার লক্ষ্মী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন –

উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রং ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্ ।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদং চ লক্ষ্মীঃ স্বয়ং মার্গতি বাসহেতোঃ॥২/১২৫

অর্থাৎ, যারা উৎসাহী, কর্মঠ, নেশা-ভাঙে আসক্তি নেই, বীর, কৃতজ্ঞ – এরা লক্ষ্মী। স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী এদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং খোঁজেন ।

তবে অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে তৎকালীন সমাজে মাদকাসক্ত পুত্রকে পরিত্যাগ না করার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে সমাজে যে মাদকদ্রব্যের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় –

কুপুত্রোঽপি ভবেৎ পুংসাং হৃদয়ানন্দকারকঃ।
দুর্বিনীতঃ কুরূপোঽপি মূর্খোঽপি ব্যসনী খলঃ॥৫/১৯

অর্থাৎ, পুত্র নেশায় আসক্ত, কুৎসিত, মূর্খ, উদ্ধত হলেও পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

এমনি বিভিন্নভাবে পঞ্চতন্ত্রকার তৎকালীন সমাজে মাদকের কথা সরাসরি বলেছেন। কখনও বা অন্যভাবে নীতি-উপদেশের ভিতর মাদকাসক্তের বিষটি উল্লেখ করেছেন। তাতে বোঝা যায় পঞ্চতান্ত্রিক যুগে মাদকের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

জ্যোতিষ

বেদাঙ্গের একটি অংশ জ্যোতিষ। চন্দ্র-সূর্যের আবর্তন, ভবিষ্যৎ কথন, গ্রহ-নক্ষত্রের বিচার-বিশ্লেষণ, ঋতু পরিবর্তনসহ প্রকৃতির নানা বিষয় জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করে। সে হিসেবে পঞ্চতন্ত্রকার বিভিন্ন প্রসঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। মিত্রভেদ তন্ত্রে দেখা যায় –

আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।

অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥
যদি রোহিণ্যাঃ শকটং ভিনত্তি রবিনন্দনো গগনবীথ্যাম্।
দ্বাদশবর্ষাণি তদা নহি বর্ষতি বাসবো ভূমৌ॥
প্রাজাপত্যে শকটে ভিন্নে কৃত্বৈব পাতকং বসুধা।
ভস্মাস্থিশকলকীর্ণা কাপালিকমিব ব্রতং ধত্তে॥
রোহিণীশকটমর্কনন্দনশ্চেদ্ ভিনত্তি রুধিরেঽথবা শশী।
কিং বদামি তদনিষ্টসাগরে সংক্ষয়ং জগদশেষমুপৈতি॥
বিশেষাৎ পরিপূর্ণস্য যাতি শত্রোরমর্ষণঃ।
আভিমুখ্যং শশাঙ্কস্য যথাদ্যাপি বিধুন্তুদঃ॥১/১৮৩, ২১৪-২১৬, ৩২৯

অর্থাৎ, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ, মাটি, হৃদয়, যম, দিন-রাত, দুই-সন্ধ্যা এবং ধর্ম মানুষ না দেখলেও, তারা যা করে এ কয়জন সাক্ষী থাকেন। রোহিণী-শকট-নভ নক্ষত্রে যদি শনি গ্রহ ভেদ করে, তবে ইন্দ্র পৃথিবীতে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি দেন না এবং যদি ভাঙে প্রাজাপত্য-রথ, তবে বসুমতী খণ্ড খণ্ড অস্থি ভস্মে ভরে থাকে। দেখে মনে হয় যেন পাপ করে কাপালিকা-ব্রত নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে। অপরদিকে যদি রবিসুত কিংবা চন্দ্র অথবা মঙ্গল ভেদ করে রোহিণী শকট, তবে অনর্থসাগরে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হয়। বিশেষত পরিপূর্ণ শত্রুর দিকেই ধাবিত হয় শক্তিমান যেমন পূর্ণচাঁদের সামনে রাহু আজো ধাবমান।

মিত্রপ্রাপ্তির প্রথমেই বিধির-বিধান নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্যতম বিষয়। যেমন–

রবিনিশাকরয়োর্গ্রহপীড়নং গজভূজঙ্গবিহঙ্গমবন্ধনম্।
মতিমতাং চ নিরীক্ষ্য দরিদ্রতাং বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ॥২/২০

অর্থাৎ, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ করে পীড়ন করে রাহু, ধরা পড়ে মাতঙ্গ বিহঙ্গ। প্রতিভাবান জগতে দরিদ্র হয়, এসব দেখে মনে হয় বিধিই বলবান।

এ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, তৎকালীন সমাজে জ্যোতিষশাস্ত্রের এ সমস্ত বিষয় প্রচলিত ছিল এবং লোকজন তা মেনে চলত।

স্বদেশপ্রেম

পঞ্চতন্ত্রে স্বদেশপ্রেমের নানা দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চতন্ত্রকার বিষ্ণুশর্মা মিত্রভেদ তন্ত্রে 'চড়ুই কাঠঠোকরা, মাছি, ব্যাঙ ও হাতি' গল্পে দমনকের উক্তিতে স্বদেশপ্রেমের কথা ব্যক্ত করেছেন। যেমন –

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কূলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥১/৩৫৯

অর্থাৎ, ব্যক্তিকে ছাড়বে বংশ রক্ষার্থে, বংশ ছাড়বে গ্রাম রক্ষার্থে, গ্রাম ছাড়বে দেশ রক্ষার্থে, পৃথিবী ছাড়বে আত্ম রক্ষার্থে।

একই তন্ত্রে 'ধর্মবুদ্ধি পাপবুদ্ধি' গল্পে দুই বন্ধু বিদেশে যায় টাকা উপার্জনের জন্য কিন্তু টাকা আয়ত্ব হলে আর বিদেশ ভালো লাগে না। দেশের কথা মনে পড়ে, ফেরার পথে আবেগে উচ্ছসিত হয়ে সামান্য পথও অনেক দূরত্ব মনে হয়। এ প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকারে স্বদেশপ্রেমের এক গভীর অনুভূতি এখানে ব্যক্ত করেছেন –

প্রাপ্তবিদ্যার্থশিল্পনাং দেশান্তরনিবাসিনাম্।
ক্রোশমাত্রেঽপি ভূভাগঃ শতযোজনবদ্ ভবেৎ॥১/৪০৩

অর্থাৎ, প্রবাসীর বিদেশে বিদ্যা শিল্প ধন আয়ত্ত হলে, দেশে আসার প্রাক্যালে সামান্য রাস্তাও সহস্র যোজন মনে হয়।

এছাড়া মিত্রপ্রাপ্তির 'সোমিলক গুপ্তধন ও উপভুক্ত' গল্পে সোমিলকের স্ত্রীর কথায় স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। সে বিদেশ না গিয়ে দেশে থেকে উপার্জনের কথা বলেছে। যেমন – 'ভোঃ প্রিয়তম মিথ্যা প্রলপিতমেতদ্ যদন্যত্রগতানাং ধনং ভবতি

স্বস্থানে ন ভবতি।' অর্থাৎ, ওগো বিদেশ গেলে টাকা হয়, আর দেশে থাকলে হয় না, কথাটা ঠিক না।

কাকোলূকীয় তন্ত্রে 'হাতির দল ও খরগোসেরা' গল্পে হাতির অত্যাচারে খরগোসেরা যখন অতিষ্ঠ তখন এক খরগোস দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তাব করলো। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যরা যেভাবে স্বদেশের বুকে সংগ্রাম করে, বুদ্ধি করে, বেঁচে থাকতে পণ করলো তাতে অপার দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় –

'ভোঃ পিতৃপৈতামহং স্থানং ন শক্যতে সহসা ত্যক্তুম্। তৎ ক্রিয়তাং তেষাং কৃতে কাচিদ্ বিভীষিকা যৎ কথমপি দৈবান্ন সমায়ান্তি।'[১১]

অর্থাৎ, বাবা-দাদার ভিটে এককথায় ছেড়ে দেওয়া যায় না। বরং ওদের ভয় পাওয়ার মতো একটা উপায় বের করতে হবে, যাতে ভুলেও কখনও দল বেঁধে না আসে।

লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে 'চিত্রাঙ্গের বিদেশবাসের অভিজ্ঞতা' নামক গল্পে চিত্রাঙ্গ কিছুদিন বিদেশে থাকার পর নানা কষ্টকর পরিবেশের সন্মুখীন হয়। তখন তার দেশের কথা মনে পড়ে যায়। সে বলে ওঠে –

'অহো বরং স্বদেশো যত্র দুর্ভিক্ষেঽপি সুখেন স্থীয়তে। ন কোঽপি যুদ্ধং করোতি। তৎ স্বদেশং গচ্ছামি' অর্থাৎ, স্বদেশই সবচেয়ে ভালো। দুর্ভিক্ষই হোক আর যাই হোক, অন্তত নিশ্চিন্তে থাকা যায়। কেউ রুখে আসে না। আমি দেশেই ফিরে যাই।

অপরীক্ষিতকারক নামক তন্ত্রে 'শতবুদ্ধি সহস্রবুদ্ধি একবুদ্ধি' গল্পে সহস্রবুদ্ধির কথায় দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। কারো মুখের কথা শুনে সে জন্মস্থান ত্যাগ করবে না। সে বলে –

বচনশ্রবণমাত্রাদপি পিতৃপর্যায়াগতং জন্মস্থানং ত্যক্তং ন শক্যতে।

ন তৎ স্বর্গেঽপি সৌখ্যং স্যাদ্ দিব্যস্পর্শনশোভনে।

কুস্থান্যেঽপি ভবেৎ পুংসাং জন্মনো যত্র সম্ভবঃ॥৫/৪৭

অর্থাৎ, শুধুমাত্র কথা শুনে বাবার ভিটে ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না। জন্মভূমি সে হোক কু-স্থান তবু এত সুখ থাকে, দিব্য অঙ্গ পরশ সুলভ রমণীয় স্বর্গের মতন।

এমনিভাবে *পঞ্চতন্ত্রে* বিষ্ণুশর্মা স্বদেশপ্রেমের নানা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। এসব উদ্ধৃতি থেকে অনুধাবন করা যায় যে, জন্মভূমি প্রাণের চেয়েও প্রিয়। স্বদেশে যেভাবে গর্ব করে থাকা যায়, আনন্দে চলা যায়, খুশি মনে কাজ করা যায় বিদেশে তা সম্ভব হয় না।

বিদেশযাত্রা

পঞ্চতান্ত্রিক যুগে যেমন স্বদেশের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি বিদেশ যাত্রার প্রবণতাও বিভিন্ন গল্পে প্রত্যক্ষ করা যায়। মিত্রভেদে 'উকুন ও ছারপোকা' গল্পে অগ্নিমুখের উক্তিতে পেটের ক্ষুধার জন্য বিদেশে গমনের প্রমাণ পাওয়া যায় –

যদসত্যং বদেন্মর্ত্যো যদ্বাসেব্যং চ সেবতে।
যদ্ গচ্ছতি বিদেশং চ তৎ সর্বমুদরার্থতঃ॥১/২৫৯

অর্থাৎ, মানুষ যে মিথ্যা বলে, খারাপ লোকের অধীনে কাজ করে, এই যে বিদেশ যাচ্ছে, সবই তো পেটের ক্ষুধার জন্য।

একই তন্ত্রে 'অনাগতবিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি ও যদ্‌ভবিষ্য' গল্পে স্বদেশে বিপদে থাকলে বিদেশে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রত্যুৎপন্নমতির উক্তিতে, যেমন –

পরদেশভয়াদ্ ভীতা বহুমায়া নপুংসকাঃ।
স্বদেশে নিধনং যান্তি কাকাঃ কাপুরুষা মৃগাঃ॥
যস্যাস্তি সর্বত্র গতিঃ স কস্মাৎ স্বদেশরাগেণ হি যাতি নাশম্।
তাতস্য কূপোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ পিবন্তি ॥১/৩২৪-৩২৫

অর্থাৎ, ফন্দিবাজ, কাপুরুষ আর নপুংসক যারা দেশে মারা যাবে তবু বিদেশে যাবে না, যে বিশ্বের সর্বত্র যেতে পারে, শুধু দেশকে ভালোবেসে তার মরা উচিত নয়। বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে থেকে বাবার কুয়োর খর জল খেয়ে কাপুরুষই বলে বেশ ভালো আছি। 'ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি' গল্পে পঞ্চতন্ত্রকার বিদ্যা, বিত্ত, শিল্প অর্জন করতে হলে অবশ্যই পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। এ থেকেও বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন –

বিদ্যা বিত্তং শিল্পং তাবন্নাপ্নোতি মানবঃ সম্যক্।

যাবদ্ ব্রজতি ন ভূমৌ দেশাদ্ দেশান্তরং হৃষ্টঃ॥১/৪০২

অর্থাৎ, বিদ্যা, বিত্ত, শিল্প কোনো কিছুই মানুষ পাওয়ার মতো করে পায় না, যতক্ষণ না পর্যন্ত এই পৃথিবীতে খোশমেজাজে ঘুরে বেড়ায়। তাই মানুষ সাধারণত বিদেশে গিয়ে প্রচুর অর্থ-সম্পদ অর্জন করে আবার দেশে ফিরে এসে আনন্দ পায়।

মিত্রপ্রাপ্তি নামক তন্ত্রের প্রথমেই বিষ্ণুশর্মা বিদেশ যাত্রার কথা ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে লঘুপতনক হিরণ্যককে বলল –

> ভাই হিরণ্যক এদেশের উপর আমার বিরক্তি ধরে গেছে, আর ভালো লাগছে না। ঠিক করেছি অন্য জায়গায় চলে যাব। কারণ এদেশে দারুণ খরার ফলে অকাল হয়েছে। অকাল হওয়াতে লোকে না খেয়ে মরছে। কেউ আর পশু-পাখির বরাদ্দ খাবারটুকুও ছড়িয়ে দেয় না। উপরন্তু খিধের চোটে হন্যে হয়ে লোকে বাড়িতে বাড়িতে পাখি ধরার জন্য জাল পেতে রেখেছে। আমিও জালে পড়েছিলুম, নেহাৎ আয়ু ছিল তাই ছাড়িয়ে পালিয়ে এসেছি। এই হলো আমার বিরক্তির কারণ। তাই বিদেশ চলে যাচ্ছি।[১২]

পরবর্তীতে লঘুপতনক আরও বলল – আনন্দে দিন কাটানোর জন্য উদ্যমীদের কাছে দূর দেশ বলতে কিছু নেই, বিদ্বানদের কাছে দেশ-বিদেশ একই রকম, যেমন –

কেঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্॥২/৫৬

অর্থাৎ, শক্তিমানের কাছে কী বেশি ভারী? উদ্যমীদের কাছে দূর কী আবার? বিদ্বানদের কাছে কী আর বিদেশ? প্রিয়ভাষীদের কাছে কে পর আর কে আপন?

একই তন্ত্রে 'সোমিলক গুপ্তধন ও উপভুক্তধন' গল্পে সোমিলক অনেক পরিশ্রম করে মিহি মিহি কাপড় বুনে ঠিকমতো জীবিকা নির্বাহ করতে পারছেন না। অন্যদিকে মোটা কাপড় বোনা তাঁতিরা অনেক ধনী। এমতাবস্থায় সোমিলক দুঃখ করে স্ত্রীকে বলল – 'দেখো, মোটা কাপড় বুননেওয়ালাও রিতিমত বড়োলোক, অতএব আর এখানকার ধার ধারি না, বিদেশ চল্লুম, রোজগার করে টাকা আনি ।'[১৩]

অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে বিদেশযাত্রার কথা 'চার ব্রাহ্মণ ও সিদ্ধবর্তিকা' গল্পে ব্রাহ্মণীর উক্তিতে ফুটে উঠেছে –

সত্যং পরিত্যজতি মুঞ্চতি বন্ধুবর্গং

শীঘ্রং বিহায় জননীমপি জন্মভূমিম্।
সন্ত্যজ্য গচ্ছতি বিদেশমভীষ্টলোকং
চিন্তাকুলীকৃতমতিঃ পুরুষোঽত্র লোকে॥৫/২৭

অর্থাৎ, দুশ্চিন্তায় যারা হতবুদ্ধি হয়ে যায়, তারাই এই দুনিয়ায় সত্যকে ছাড়ে, বন্ধুবর্গকে ছাড়ে, জননী এবং জন্মভূমিকেও এক কথায় ছেড়ে দেয়, চলে যায় সেই দূর-দূরান্তে যেটি তাদের জন্য বাঞ্ছিত স্থান।

কৃষি

পঞ্চতন্ত্র-এর নানা স্থানে তৎকালীন সমাজের কৃষক ও কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মিত্রভেদের প্রথমে 'সন্ন্যাসী, ধূর্ত, শেয়াল ও দুই দুষ্টা' গল্পে কৃষি ও অর্থকে সমান গুরুত্ব দিয়ে কৃষি কিভাবে সুরক্ষা করা যাবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে – 'কৃষিস্ত্যাগাৎ প্রমাদাদ্ধনম্' অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কৃষির ক্ষতি সাধিত হয়, যেমন ব্যয় করলে অর্থ ফুরিয়ে যায়।

কাকোলূকীয় নামক তন্ত্রে 'হরিদত্ত ও ক্ষেত্রদেবতা' গল্পে হরিদত্ত ব্রাহ্মণ হয়েও কৃষিকাজ করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ভালো ফসল উৎপাদন করতে পারেননি ঠিক তবে ক্ষেত্রদেবতার পূজা দিয়ে আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও হীরক লাভ করেছিল।

সংস্কৃতি

ভারতীয় উপমহাদেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি জাতি কতটা সভ্য, কতটা উন্নত সেই পরিচয় বহন করে। সংস্কৃতি শব্দটির মধ্যেই সমাজনীতি কথাটি লুকিয়ে আছে।[১৪] সে অর্থে *পঞ্চতন্ত্রে* সমাজনীতি আলোচনায় সমগ্র বিষয়ই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। তদুপরি সংস্কৃতির নির্দিষ্ট কতগুলো বিষয় রয়েছে। যেমন – কোনো জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, শিল্প, নৈতিকতা, আচার-আচরণ, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, ভোজনরীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ,

উৎসব ইত্যাদি। পঞ্চতন্ত্রকার বিষ্ণুশর্মা তাঁর গ্রন্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এ সমস্ত বিষয় বর্ণনা করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো –

পোষাক-পরিচ্ছদ

আদিম সভ্যতার পথ ধরে মানুষ ধীরে ধীরে আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। সভ্যতা সংস্কৃতির একটি বড় উপকরণ এবং ঐতিহ্য হচ্ছে পেষাক-পরিচ্ছদ। এই পেষাক-পরিচ্ছদকে কেন্দ্র করে ক্রমান্বয়ে তাঁতশিল্পের উদ্ভব হয়েছিল। *পঞ্চতন্ত্র*-এর যুগে তাঁত শিল্পের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানে অনেক গল্পেই তাঁতি চরিত্রটি দেখা যায়। মিত্রভেদে তাঁতি প্রধান চরিত্র হিসেবে 'বিষ্ণুরূপধারী তাঁতি' নামে একটি গল্প রয়েছে। এছাড়া তাঁতি চরিত্রটি দেখা যায় – 'সন্ন্যাসী, ধূর্ত, শেয়াল ও দুই দুষ্টা' গল্পে। 'সোমিলক গুপ্তধন ও উপভুক্তধন' গল্পে সোমিলক হচ্ছে একজন তাঁতি। এ গল্পে সূক্ষ্ম ও মোটা কাপড় বোনার কথা আমরা জানতে পারি। তবে সোমিলক সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম, মিহি-মিহি কাপড় বোনায় পরদর্শী ছিল। কিন্তু দুঃভাগ্যবশত সোমিলক দরিদ্র ছিল। অপরপক্ষে অন্যরা মোটা কাপড় বুনেও ধনী বনে গিয়েছিল।

কাকোলূকীয় তন্ত্রের প্রথমেই শ্বেতপোষাকের কথা পঞ্চতন্ত্রকার উল্লেখ করেছেন। মুনিরা তৎকালীন সময়ে শ্বেত পোষাক পরিধান করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় –

নরাণাং নাপিতো ধূর্তঃ পক্ষিণাং চৈব বায়সঃ।
দংষ্ট্রীণাং চ শৃগালস্তু শ্বেতভিক্ষুস্তপস্বিনাম্॥৩/৭৫

অর্থাৎ, মানুষ জাতির মধ্যে নাপিত ধূর্ত, পাখির মধ্যে কাক, দাঁতযুক্ত প্রাণির মধ্যে শেয়াল, মুনির মধ্যে শ্বেত পোষাক।

অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে 'চার ব্রাহ্মণ ও সিদ্ধবর্তিকা' গল্পে চার ব্রাহ্মণ বল্কল পরিধান করেছিলেন, সে প্রমাণ পাওয়া যায়।

খাদ্য

সকল জীবের জীবনধারণের জন্য খাবার অত্যন্ত প্রয়োজন। পঞ্চতান্ত্রিক যুগেও নানা ধরনের খাবার-দাবারের বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। তখন উন্নত মানের খাবার থেকে আরম্ভ করে সাধারণ খাবারের প্রচলন দেখা যায়। সমাজের উচ্চ শ্রেণির লোকেরা ভালো-ভালো দামি খাবার খেতেন মিত্রভেদ তন্ত্রে 'উকুন ও ছারপোকা' গল্পে অগ্নিমুখের উক্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় –

'রাজা সুস্বাদু নানারকম ব্যঞ্জন চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয় খাওয়ায় শরীরে যে মিষ্টি রক্ত হয়েছে, সেটি আস্বাদন করে জিভের পরিতৃপ্তি করি।'[১৫]

মিত্রপ্রাপ্তি তন্ত্রের প্রথমেই বিষ্ণুশর্মা অতি সাধারণ খাবারের কথা বলেছেন। যেমন – নিসিন্দার ফুলের মতো চালের কথা উল্লেখ করেছেন। একই তন্ত্রে ব্যাধেরা পাখির মাংস খেত এবং মাংস বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অতি প্রচলিত প্রবাদে আছে জীবন দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বিষ্ণুশর্মা লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে 'পুনমূর্ষিকা' গল্পে ঠিক একই কথা বলেছেন – 'বিধাতা সমস্ত প্রাণীকে গড়েছেন, তিনি তাদের খাদ্যও সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যার যা নিদিষ্ট খাদ্য, তাই সে খাবে সেজন্য কোনো দোষ নেই। অখাদ্যে অনেক দোষ। ব্যতিক্রম শুধু অকর্তব্য।'[১৬]

একই গল্পে তৎকালীন সমাজে মদ, সুরা প্রভৃতি খাবারের কথা বলা হয়েছে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সুরা পছন্দ করত আর মদ্যপেরা পছন্দ করত হবি। যে খাবার একজনের কাছে ভালো সে খাবারই অন্যের কাছে অখাদ্যও হতো। তবে যে খাবার খাওয়া শোভন পঞ্চতন্ত্রকার ইঁদুরীর উক্তিতে সে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন –

মদ্যং যথা দ্বিজাতীনাং মদ্যপানাং যথা হবিঃ।
ভক্ষ্যমভক্ষ্যতামেতি তথান্যেষামপি দ্বিজ ॥
ভক্ষ্যমভক্ষ্যয়তাং শ্রেয়ো অভক্ষ্যং তু মহদঘম্।
তৎ কথং মাং বৃথাচারং ত্বং দণ্ডয়িতুমর্হসি॥৪/৫৭, ৫৮

অর্থাৎ, হে ব্রাহ্মণ, বিপ্রের যেমন প্রিয় সুরা, মদ্যপের হবি, খাদ্যই অখাদ্য হয়, তেমনি সবারই। যারা ভক্ষ্যটি ভক্ষণ করে তাদের মঙ্গল নিশ্চিত, আর যারা অভক্ষ্যটি ভক্ষণ করে তারা মহাপাপে পতিত হয় এবং সেটি অন্যায় কাজ। শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

একই তন্ত্রে 'মরা হাতি ও শেয়াল' গল্পে বলা হয়েছে, যে খাবার খেলে সহজে হজম হয় তাতেই শরীরের উপকার হয়। সেই বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্যকর দিকের কথা পঞ্চতন্ত্রকার উল্লেখ করেছেন। যেমন –

যচ্ছক্যং গ্রসিতুং গ্রস্যং গ্রস্তং পরিণমেচ্চ যৎ।
হিতং চ পরিণামে যৎ তদদ্যং ভূতিমিচ্ছতা॥৪/১০৯

অর্থাৎ, যে মানুষ নিজের ভালো চায়, সে শুধু সে খাবারই খাবে, যেটি খাওয়া যায়, সহজে পরিপাক হয়, কেননা পরিপাকেই উপকার হয়।

এমনিভাবে একই তন্ত্রে 'তিন মুনি' গল্পে সাধারণ মানুষের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি যে ব্যাপক আকর্ষণ ছিল সে সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন –

বরং ররয়তে কন্যা মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥৪/৬৬

অর্থাৎ, মেয়ে চায় সেরা বর, মা চায় টাকা-পয়সাওয়ালা ছেলে, বাবার ইচ্ছে ছেলে লেখাপড়া জানা হোক। আত্মীয়রা চায় ভালো বংশ আর খাবার পেলে সাধারণ মানুষ খুশি হয়।

অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে 'চার পণ্ডিতমূর্খ' গল্পে গ্রামের লোকের নিমন্ত্রণ করে তিনজনকে তিন রকমের খাবার দেয়। প্রথম জনকে খেতে দিয়েছে ঘিচিনি মাখানো সিমোই, দ্বিতীয় জনকে খেতে দিয়েছে মণ্ডা (আটার তৈরি ছড়ানো পাতলা খাবার)। তৃতীয় জনকে খেতে দিয়েছে বটিকা (চাল ও মাসকলাইয়ের গুড়ো মিশিয়ে তৈরি ছিদ্রযুক্ত খাবার)

সংগীত চর্চা

মানুষ মাত্রই সংগীতের সুর মূর্ছনায় আবিষ্ট হয়ে পড়ে। দেবতারাও সংগীতের সমজদার। তৎকালীন সমাজে সংগীত চর্চা হতো সে সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়। অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে 'গাধার গান' গল্পে সংগীতের সুর তাল লয় সহ নানা বিভাগ সম্পর্কে ব্যাকরণ সম্মত ধারণা এবং সংগীত যে শ্রেষ্ঠ সাধনা সে কথা বিষ্ণুশর্মা উল্লেখ করেছেন। যেমন –

সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রাম মূর্ছনাশ্চৈকবিংশতিঃ।
তানাস্ত্বেকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলম্॥
স্থানত্রয়ং যতীনাং চ ষড়াস্যানি রসা নব।
রাগাঃ ষট্ত্রিংশতির্ভাবাশ্চত্বারিংশৎ ততঃ স্মৃতাঃ॥
সপঞ্চাশীত্যধিকং হ্যেতদ্ গীতাঙ্গানাং শতং স্মৃতম্।
স্বয়মেব পুরা প্রোক্তং ভরতেন শ্রুতেঃ পরম্॥
নান্যদ্ গীতাং প্রিয়ং লোকে দেবানামপি দৃশ্যতে।
শুষ্কস্নায়ুস্বরাহ্লাদাস্ত্র্যক্ষং জগ্রাহ রাবণঃ॥৫/৫২-৫৫

অর্থাৎ, সংগীতের সপ্ত স্বর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছনা, ঊনপঞ্চাশ তান, তিনটি বিরামস্থান, রাগ ছত্রিশ, ছয় আস্য, নয় রস, চল্লিশ ভাব, বিভাগ একশ পঁচাশি রকম। পৃথিবীতে সঙ্গীতের থেকে প্রিয়তর এবং শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। বেদের পরে এ কথা বলেন ভরত স্বয়ং।

লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ও পঙ্গু' গল্পে উক্ত হয়েছে – ব্রাহ্মণী এক পঙ্গুর স্বর্গীয় গলায় গান শুনে কুসুমেষুপীড়িত হয়ে তাকে পাওয়ার জন্য অত্যাসক্ত হয়ে পড়ে।

উৎসব

পঞ্চতন্ত্রে অনেক ধরনের উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান, মেলা, মহোৎসব, বিয়ে, বিভিন্ন ব্রতপালন, চান্দ্রায়ন প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাই। মিত্রভেদে 'দন্তিল ও গোরম্ভ' গল্পে দন্তিলের বিয়ে উপলক্ষে নানা ধরনের আয়োজন হয়। বিষ্ণুরূপধারী তাঁতি গল্পে তৎকালীন সমাজের সংস্কৃতির নানা ধরনের চিত্র ফুটে উঠেছে। যেমন –

'তত্রাধিষ্ঠানে কস্মিংশ্চিদ্দেবায়তনে যাত্রামহোৎসবঃ সংবৃত্তঃ। তত্র চ নটনর্তকচরণসঙ্কুলে নানাদেশাগতজনাবৃতে।'[১৭] আর্থাৎ, নগরের এক মন্দিরে বিশাল আয়োজন। মহোৎসব উপলক্ষে সমস্ত অঙ্গন জুড়ে লোকে গিজগিজ করছে। কোথাও যাত্রাপালা-পার্বণ, কোথাও মেলা বসেছে, কোথাও চারণ কবিদের যুক্তি-তর্কের আসর।

চুরি-ডাকাতি

চুরি-ডাকাতি সমাজের চোখে চরম অপরাধ। বর্তমান সময়ে যেমন চুরি-ডাকাতি লক্ষ্য করা যায়, তৎকালীন সমাজেও চুরি-ডাকাতি ছিল। তবে কোনো কালেই সমাজ একে ভালো চোখে দেখেনি। *পঞ্চতন্ত্রে* অভিনবভাবে চুরি-ডাকাতির ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। মিত্রভেদে 'সন্ন্যাসী, ধূর্ত, শেয়াল ও দুই দুষ্টা গল্পে' আষাঢ়ভূতি নামে এক ধূর্ত সন্ন্যাসীর টাকা-পয়সা, কাপড় চুরি করার জন্য কৌশল হিসেবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাসীর সাথে ধর্মীয় কথা-বার্তা বলে বিশ্বাস অর্জন করে পরে সুযোগ বুঝে টাকা-পয়সা-পাপড়-চোপর নিয়ে চম্পট দেয়। একই তন্ত্রে 'ধর্মবুদ্ধি পাপবুদ্ধি' গল্পে দুই বন্ধু মিলে বিদেশ গিয়ে অনেক অর্থ উপার্জন করে। পাপবুদ্ধি গচ্ছিত সকল অর্থ চুরি করে নিয়ে অস্বীকার করে। পরবর্তীতে পাপবুদ্ধির পিতা পুত্রের চুরির কীর্তি-কলাপ বর্ণনা করে। বিচারে পাপবুদ্ধিকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়। 'চোর পণ্ডিত ও বিদেশীরা' গল্পে চার বিদেশী বণিক প্রচুর অর্থ-সম্পদ নিয়ে দেশে ফিরছিলেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ যুবক চুরি করবে বলে তাদের পিছু নিল। পরক্ষণে চোরসহ বণিকরা ডাকাতের খপ্পরে পড়ল। অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে 'গাধার গান' গল্পে গাধা ও শিয়াল অন্যের ক্ষেতে রাতের বেলায় চুরি করে কাঁকুড় খেতে দেখা যায়। এ সময় চমৎকার জ্যোৎস্নাস্নাত নির্মল রজনীতে গাধা গান গাইতে চাইলে শেয়াল বলল – 'যতশ্চৌরকর্মপ্রবৃত্তাবাবাং নিভৃতৈশ্চ চৌরজারৈরত্র স্থাতব্যম্।'[১৮] অর্থাৎ, চোর আর অবৈধ প্রণয়ীকে গোপনে অবস্থান করে থাকতে হয়। এ প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকার বলেছেন –

কাংসী বিবর্জয়েচ্চৌর্যং নিদ্রালুশ্চ স চৌরিকাম্।

জিহ্বালৌল্যং রুজাক্রান্তো জীবিতং যেঽত্র বাঞ্ছতি॥৫/৫০

অর্থাৎ, কাশিতে আক্রান্ত ব্যক্তি চুরি ছাড়বে, ঘুমকাতুরে ব্যক্তিও চৌর্যবৃত্তি ছাড়বে, রুগিও ছাড়বে লোভ-লালসা যদি দুনিয়ায় সে বাঁচতে চায়।

পরবর্তীতে 'বৃদ্ধবণিক ও চোর' গল্পে চোরকে চুরি করতে আহ্বান করা হয়েছে। কারণ হলো, বয়সের ভারে ন্যুব্জ এক বণিক অল্প বয়স্ক এক মেয়েকে বিয়ে করে কিন্তু স্ত্রী বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে খুব কষ্টে থাকত। কখনও তার মুখের দিকেও তাকাতো না, তাকে স্পর্শও করত না। একদিন ঘরে চোর এসেছে, তখন স্ত্রী চোরকে দেখে ভয়ে বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরল। এ সমস্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায় তৎকালীন সময়ে ব্যাপকভাবে চুরি-ডাকাতি হতো।

যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থা

সমাজ গতিশীলতার একটি প্রধান নিয়ামক হচ্ছে যোগাযোগ। বর্তমান সময়ে সমাজবদ্ধ মানুষ যেমন পারস্পরিক যোগাযোগ তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে বসবাস করছে। পঞ্চতান্ত্রিক যুগেও বিভিন্নভাবে পারস্পরিক মেলামেশা, তথ্য আদান-প্রদান বিষয়টি বিষ্ণুশর্মা উল্লেখ করেছেন। সে ক্ষেত্রে মিত্রভেদের প্রথমেই গরুর গাড়ির ব্যবহার দেখা যায়। ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে মানুষ গরুর গাড়িই বেশি ব্যবহার করত এবং দূর- দেশে যেত। সাধারণ মানুষ গাধার পিঠে করে মালামাল আনা- নেওয়া করত। রাজাদের যানবাহনের ক্ষেত্রে হাতির ও ঘোড়ার গাড়ির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া নানারকমের যানবাহনের কথা বিষ্ণুশর্মা উল্লেখ করেছেন।[১৯]

প্রযুক্তি

পঞ্চতান্ত্রিক যুগে আধুনিক যুগের মতো কম্পিউটার, ইন্টারনেট তথা উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি – এসব কিছুই ছিলনা। তা সত্ত্বেও নানা ধরনের প্রযুক্তি লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চতন্ত্রকার শিক্ষার কথা বলেছেন, শিল্পের কথা বলেছেন, কৃষির কথা বলেছেন প্রভৃতি প্রযুক্তির

অন্তর্ভূক্ত বিষয়। তবে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো তিনি অনেক স্থানেই কৌশল তথা বুদ্ধির কথা বলেছেন। 'বিষ্ণুরূপধারী তাঁতি' গল্পে যন্ত্রচালিত গরুড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাকোলূকীয় তন্ত্রে ব্যাধ ও কপোত দম্পতি গল্পে বিমানের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া – ওষুধ প্রযুক্তি, মানবদেহের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়াবলী এবং ভৌতিক অবকাঠামোগত ননা বিজ্ঞানসম্মত বিষয়ের চর্চার আভাস পাওয়া যায়।[২০]

খরা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ

পঞ্চতন্ত্রে কাকোলূকীয় নামক তৃতীয় তন্ত্রে 'হাতির দল ও খরগোসেরা' গল্পে অনাবৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। সাংঘাতিক অনাবৃষ্টিতে বড় বড় দিঘি, বিল, ডোবা, পুকুর শুকিয়ে চৌচির হয়ে গেছে। তেষ্টায় ছটফটিয়ে বাচ্চা হাতিগুলো মরতে বসেছে, কোনো কোনো জীব মারাও পড়েছে।[২১] মিত্রপ্রাপ্তি তন্ত্রে লঘুপতনককে খরা ও দুর্ভিক্ষের জন্য বিদেশ যেতে দেখা যায়।[২২] লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে 'চিত্রাঙ্গর বিদেশবাসের অভিজ্ঞতা' গল্পে দেখা যায়, চিত্রাঙ্গর স্বদেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় সে অন্য দেশে গেল সেখানেও, দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে।[২৩] এ থেকে তৎকালীন সমাজে খরা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ

পঞ্চতন্ত্রে নানা ধরনের পেশাজীবী মানুষ পরিলক্ষিত হয়। যেমন – ধোপা, নাপিত, কাঠুরে, তাঁতি, কাঠমিস্ত্রী, জেলে, চোর, ভিক্ষুক ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, পঞ্চতন্ত্রকার তৎকালীন সমাজের যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তাতে একটি সমাজের সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি শিক্ষা, অর্থ, ব্যবসা, নারী, কুসংস্কার, আতিথেয়তা, ব্যভিচার ও গণিকাবৃত্তি, জুয়াখেলা, মাদকাসক্তি, জ্যোতিষ, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, কৃষি, স্বদেশপ্রেম, সংস্কৃতি, দুর্ভিক্ষ-খরা-অনাবৃষ্টি, বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ, প্রভৃতি বিষয়ের একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. ভোঃ জ্ঞাতমেতদ্ ভবদভির্যন্নমৈতে ত্রয়োঽপি পুত্রাঃ শাস্ত্রাবিমুখা বিবেকরহিতাশ্চ। তদেতান্ পশ্যতো মে মহদপি রাজ্যং ন সৌখ্যমাবহতি।

প্রসূন বসু সম্পাদিত, বিষ্ণুশর্মা, *পঞ্চতন্ত্রম্, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* ১৫দশ খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-২৩৫

২. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৩৫

৩. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৩৬

৪.স চার্থঃ পুরুষাণাং ষড়ভিরুপায়ৈর্ভবতি–ভিক্ষয়া নৃপসেবা কৃষিকর্মণা বিদ্যোপার্জনেন ব্যবহারেণ বণিক্কর্মণা বা।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৩৭

৫. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩০১

৬. তচ্চ বাণিজ্যং সপ্তবিধমর্থাগমায় স্যাৎ। তদ্ যথা গান্ধিকব্যবহারঃ নিক্ষেপপ্রবেশঃ গোষ্ঠিককর্ম পরিচিতগ্রাহকাগমঃ মিথ্যাক্রয়কথনং কূটতুলামানং দেশান্তরাদ্ ভণ্ডানয়নং চেতি।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৩৭

৭. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৪৩

৮. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৫০

৯. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৫২

১০. মদবিহ্বলাঙ্গো মুক্তকেশঃ পদে পদে প্রস্খলন্ গৃহীতমদ্যভাণ্ডঃ সমভ্যেতি। তং চ দৃষ্ট্বা সা দ্রুততরং ব্যাঘুট্য স্বগৃহং প্রবিশ্য মুক্তশৃঙ্গারা যথাপূর্বমভবৎ।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৫৪

১১. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩২৫

১২. ভদ্র হিরণ্যক বিরক্তিঃ সঞ্জাতা মে সাম্প্রতং দেশস্যাস্যোপরি। তদন্যত্র যাস্যামি। হিরণ্যক আহ-ভদ্র কিং বিরক্তেঃ কারণম্। স আহ-ভদ্র শ্রুয়তাম্। অত্র দেশে মহত্যানাবৃষ্ট্যা দুর্ভিক্ষং সঞ্জাতম্। দুর্ভিক্ষত্বজ্জনো বুভুক্ষাপীড়িতঃ কোঽপি বলিমাত্রমপি ন

প্রযচ্ছতি। অপরং গৃহে গৃহে বুভুক্ষিতজনৈবিহঙ্গানাং বন্ধনায় পাশাঃ প্রগুণীকৃতাঃ সন্তি। অহমপ্যায়ুঃশেষতয়া পাশেন বদ্ধ উদ্ধরিতোঽস্মি।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৯৮

১৩. প্রিয়ে পশ্যৈতান্ স্থূলপট্টক্বারকান্ ধনকনকসমৃদ্ধান্। তদধারণকং মমৈতং স্থানম্। তদনাত্রোপার্জনায় গচ্ছামি।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩০৯

১৪. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক সংকলিত, *সংসদ বাংলা অভিধান,* সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা-৭৯৭

১৫. তদ্ যদি প্রসাদং করোষি তদস্য নৃপতেবি বিধব্যঞ্জনান্ন

পানচোষ্যলেহ্যস্বাদ্বহারবশাদস্য শরীরে যন্নিষ্টং রক্তং সঞ্জাতং তদাস্ববাদনেন সৌদ্ধ্যং সম্পাদয়ামি জিহ্বায়া ইতি।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৬৮

১৬. ইহ হি সর্বেষাং প্রাণিনাং বিধিনা সৃষ্টিং কুর্বতাহারোঽপি বিনির্মিতঃ। ততো যথা ভবতামন্নং তথাস্মাকম্ মূষিকাদয়ো বিহিতাঃ। তৎ স্বাহারকাঙ্ক্ষিণং মাং কিং দূষয়সি।

উক্তং চ

যদ্ যস্য বিহিতং ভোজ্যং ন তং তস্য প্রদুষ্যতি।

অভক্ষ্যে বহুদোষঃ স্যাৎ তস্মাৎ কার্যো ন ব্যত্যয়ঃ॥৪/৫৬

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৫৮

১৭. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৫৭

১৮. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩৭৭

১৯. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩৩৬

২০. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৫৮, ৩৩৬, ৩৮০

২১. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩২৫

২২. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৯৮

২৩. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩৬৮

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চতন্ত্রে রাজনীতি

চতুর্থ অধ্যায়ে *পঞ্চতন্ত্রে* সমাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে *পঞ্চতন্ত্রে* রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। মানব সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুগ যুগ ধরে মানুষ যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আসছে, তার মধ্যে রাজনীতি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের নেতৃত্ব ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি গড়ে ওঠে। রাজনীতি মানুষের জীবনকে গতিশীল করে। সর্বকালে সর্বস্থানে রাজনীতিই মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে আসছে, তবুও রাজনীতি সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-ধারা সবসময় একই রকম হয়নি। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক কারণে রাজনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের চিন্তাভাবনা আলোড়িত হয়েছে এবং নতুন নতুন সোপানে আসীন হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে *পঞ্চতন্ত্রে* যে ধরনের রাষ্ট্রচিন্তা লক্ষ করা যায়, বর্তমান সময়েও তার যৌক্তিকতা রয়েছে। পঞ্চতন্ত্রকারের সেসব নীতি যদি রাষ্ট্রনায়ক এবং জনগণ ধারণ করে তাহলে দেশে শান্তি আসতে পারে। এই গ্রন্থে রাজনীতির আলোচ্য বিষয় হলো – রাজসেবা, রাজধর্ম, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ষড়গুণ তথা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, রাষ্ট্রীয় নীতি-পদ্ধতি, বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি তথা মন্ত্রীদের ধর্ম, শত্রুতা, যুদ্ধ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, দুর্গ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ক্রিয়াকলাপ, রাজকর্মচারীদের ভূমিকা ও মতামতের যৌক্তিকতা প্রভৃতি। এ সমস্ত বিষয়ের আলোকে পঞ্চতন্ত্রকার বিষ্ণুশর্মা তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তা-ধারাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব অত্যধিক। বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনায় *পঞ্চতন্ত্র*-এর রাজনৈতিক বিষয়গুলো বিশ্লেষণ এবং এর প্রাসঙ্গিকতার মূল্যায়ন করা হয়েছে।

রাজনীতি কী? এ বিষয়টি বিষ্ণুশর্মা *পঞ্চতন্ত্র*-এর প্রথমেই সংজ্ঞায়িত করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তিনি যে রাজনীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন, বর্তমান সময়ে রাজনীতি একই আবর্তে প্রবাহিত হচ্ছে। যেমন –

সত্যানৃতা চ পরুষা প্রিয়বাদিনী চ
হিংস্রা দয়ালুরপি চার্থপরা বদান্যা।
ভুরিব্যয়া প্রচুরবিত্তসমাগমা চ
বেশ্যাঙ্গনেব নৃপনীতিরনেকরূপা॥১/৪৩০

অর্থাৎ, সত্যবাদিনী, মিথ্যাবাদিনী, রুক্ষ, প্রিয়ংবদা, নৃশংসা, দয়াময়ী, বদান্যা, টাকা-দাও, টাকা-নাও, অপরদিকে ঢালাওভাবে খরচ করছে, অঢেল টাকা আসছেও। এ যেন নিত্য বহুরূপী বারনারী। এই হলো রাজনীতি।

তাঁর এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায়, তিনি রাজনৈতিকভাবে কতটা সচেতন ছিলেন।

মিত্রভেদের প্রথমে দাক্ষিণাত্য নামক রাজ্যের উল্লেখ আছে। সেই রাজ্যের রাজধানী মহিলারোপ্য নগরের কথা জানতে পারা যায় এবং উক্ত রাজ্যের রাজা ছিলেন অমরশক্তি। তাঁর পুত্রদের অজ্ঞানতার বিষয় নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। কেননা তাঁর অনুপস্থিতিতে পুত্রদের বুদ্ধিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তখন রাজা সুমতি নামে একজন মন্ত্রীর পরামর্শে বিদ্যা-শিক্ষা তথা রাজনীতিতে অভিজ্ঞ করতে বিষ্ণুশর্মাকে নিযুক্ত করলেন। তিনি পাঁচটি তন্ত্রে সমস্ত জ্ঞানের সারস্বরূপ *পঞ্চতন্ত্র* রচনা করেন। বিষ্ণুশর্মা কথামুখেই গ্রন্থটিকে রাজনীতির গ্রন্থ হিসেবে অভিহিত করে সাধারণ পাঠকদের উদ্দেশে বলেছেন – '*পঞ্চতন্ত্র* নামক রাজনীতির এই বইটি প্রচারিত হলো ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য।'[১]

মিত্রপ্রাপ্তির প্রথমে পঞ্চতন্ত্রকার রাজনীতি তিনটি ভাগে বিভক্ত বলে মত দিয়েছেন। যেমন –

সুকৃত্যং বিষ্ণুগুপ্তস্য মিত্রাপ্তির্ভার্গবস্য চ।
বৃহস্পতেরবিশ্বাসো নীতিসন্ধিস্ত্রিধা স্থিতঃ॥২/৪৫

অর্থাৎ, বিষ্ণুগুপ্ত অর্থাৎ চাণক্যের নিখুঁতভাবে কাজ করা, ভার্গব অর্থাৎ শুক্রাচার্যের বন্ধুত্ব অর্জন এবং বৃহস্পতির অবিশ্বাস রাজনীতি এই তিনটি পর্বে বিভক্ত।

সংক্ষেপে বলা যায় –

১. নিখুঁতভাবে কাজ করা

২. বন্ধুত অর্জন করা এবং

৩. বিশ্বাস-অবিশ্বাস

বস্তুত পঞ্চতন্ত্রকারের এই তিনটি কথার মধ্যে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে রাজনীতির মূল বিষয় লুক্কায়িত আছে। এখন বিস্তারিত আলোচনা করা যাক –

রাজসেবা

পঞ্চতন্ত্রে মিত্রভেদ নামক প্রথম তন্ত্রের শুরুতেই বিষ্ণুশর্মা রাজসেবার কথা উল্লেখ করেছেন। রাজসেবার মাধ্যমে সম্মানিত হওয়া যায়, সে বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। তবে 'রাজাকে যতই সেবা করা হোক না কেন, এতে রাজা ন্যায্য পুরস্কার দেন না।'[২] রাজা যদি পুরস্কার নাও দেন, তবে পরোক্ষভাবে রাজসেবার পুরস্কার পাওয়া যায়। রাজার থেকে পুরস্কার বড় কথা নয়, রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিকে সম্মান করলে, সে সম্মান আপনা থেকে ফিরে আসে, রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে, প্রজারা সুখে থাকে, রাষ্ট্রের কল্যাণ নিশ্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে করটক ও দমনকের কথোপকথনে রাজসেবার নানা দৃষ্টান্ত প্রতিভাত হয়েছে। যেমন –

অপ্রধানঃ প্রধানঃ স্যাৎ সেবতে যদি পার্থিবম্।
প্রধানেঽপ্যপ্রধানঃ স্যাদ্ যদি সেবাবিবর্জিতঃ ॥১/৩৪
কোপপ্রসাদবস্তুনি যে বিচিন্বন্তি সেবকাঃ।
আরোহন্তি শনৈঃ পশ্চাদ্ধুন্বন্তমপি পার্থিবম্॥
বিদ্যাবতাং মহেচ্ছানাং শিল্পবিক্রমশালিনাম্।
সেবাবৃত্তিবিদাং চৈব নাশ্রয়ঃ পার্থিবং বিনা॥
যে জাত্যাদিমহোৎসাহান্নরেন্দ্রান্নোপযান্তি চ।

তেষামামরণং ভিক্ষা প্রায়শ্চিত্তং বিনির্মিতম্॥
যে চ প্রাহুর্দুরাত্মানো দুরারাধ্যা মহীভুজঃ।
প্রমাদালস্যজাড্যানি খ্যাপিতানি নিজানি তৈঃ ॥
সর্পান্ ব্যাঘ্রান্ গজান্ সিংহান্ দৃষ্ট্বোপায়ৈর্বশীকৃতান্ ।
রাজেতি কিয়তী মাত্রা ধীমতামপ্রমাদিনাম্ ॥
রাজানমেব সংশ্রিত্য বিদ্বান্ যাতি পরাং গতিম্ ।
বিনা মলয়মন্যত্র চন্দনং ন প্ররোহতি ॥
ধবলান্যাতপত্রাণি বাজিনশ্চ মনোরমাঃ ।
সদা মত্তাশ্চ মাতঙ্গাঃ প্রসন্নে সতি ভূপতৌ ॥১/৩৬-৪২
সুবর্ণপুষ্পিতাং পৃথীং বিচিন্বন্তি ত্রয়ো জনাঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্॥
সা সেবা যা প্রভুহিতা গ্রাহ্যা বাক্যবিশেষতঃ।
আশ্রয়েৎ পার্থিবং বিদ্বাংস্তদ্ভূরিণৈব নান্যথা॥
যো ন বেত্তি গুণান্যস্য ন তং সেবেত পণ্ডিতঃ ।
ন হি তস্মাৎ ফলং কিঞ্চিৎ সুকৃষ্টাদূষরাদিব॥
দ্রব্যপ্রকৃতিহীনেঽপি সেব্যঃ সেব্যগুণান্বিতঃ ।
ভবত্যাজীবনং তস্মাৎ ফলং কালান্তরাদপি ॥১/৪৫-৪৮
অকুলীনেঽপি মূর্খেঽপি ভূপালং যেঽত্র সেবতে।
অপি সম্মানহীন্দেঽপি চ সর্বত্রাপি পূজ্যতে॥
অপি কাপুরুষো ভীরুঃ স্যাচ্চেন্নৃপতিসেবকঃ ।
তথাপি ন পরাভূতিং জনাদাপ্নোতি মানবঃ॥১/১৪৯-১৫০

অর্থাৎ, অতি সাধারণ লোকও অসাধারণ হতে পারে যদি রাজার সেবা করে। অপরদিকে অসাধারণ লোকও একেবারে নিঃস্ব হতে পারে যদি রাজার সেবা ছেড়ে দেয়। কিসে রাজা খুশি, কিসে খ্যাপা যে-সেবকরা তা দেখে, শেষে তেরিয়া-মেজাজ রাজার ওপরে ক্রমে তারা চড়ে বসে। বিদ্বান, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, শিল্পী, শূর এবং সেবাবৃত্তিবিদ্-এদের সকলেরই আশ্রয় হলো রাজা। নিজের বংশ, বিত্ত, বৈভব প্রভৃতিকে বেশি বড় করে দেখে যাঁরা রাজার কাছে যান না, তাঁদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হলো – আমরণ ভিক্ষা। যেসব কপটবুদ্ধি

সম্পন্ন লোকে বলে, রাজাদের আরাধনা বড়ো দুঃসাধ্য, তারা নিজেদেরই আলস্য, ভুল এবং বোকামি প্রকাশ করে। বুদ্ধিতে যেমন সাপ-বাঘ-সিংহ-হাতিও বশ হয়, রাজার ক্ষেত্রেও তেমনটি হয়। অবশ্য যদি মাথায় বুদ্ধি থাকে আর ভুলভ্রান্তি না হয়। রাজাকে সেবা করেই বিদ্বান উন্নতির চরমে ওঠে। মলয় ছাড়া চন্দন তো অন্যত্র জন্মায় না। রাজা খুশি হলে পাওয়া যায় কত শ্বেতছত্র, মনোহর অশ্ব এবং সদামত্ত মাতঙ্গ। সোনায় ছাওয়া ডাগর লতার মতো সুবর্ণপুষ্পিতা তথা এই পৃথিবীর ফুল তুলতে পারে শুধু তিন জন। তারা হলো – বীর, বিদ্বান এবং যে সেবাদান করতে জানে। বিশেষ করে বলা আছে, সেই সেবাই বেছে নিতে হয়, যাতে প্রভুর মঙ্গল হয়। বিদ্বান ব্যক্তি সেই পথেই রাজাকে আশ্রয় করবেন, অন্যভাবে নয়। যিনি তাঁর গুণ জানেন না, তাঁকে পণ্ডিত ব্যক্তি সেবা করবেন না। তাতে কোনো ফল নেই, যেমন ঊষর ভূমিতে ভালো করে লাঙ্গল দিলেও ভালো ফসল হয় না। টাকা নেই-প্রজা নেই-রাজ্য নেই এমন রাজাকেও সেবা করা উচিত, যদি তাঁর সেবা পাবার মতো আর্থাৎ প্রভু হওয়ার মতো গুণ থাকে। কেননা ভবিষ্যতে সারা জীবন তাঁর ফল পাওয়া যায়। না হোক কুলীন, হোক না মূর্খ, পদস্থ না-ই হোক, রাজাকে যে সেবা করে, সবখানে সেই লোক সম্মান পায়। কাপুরুষ, দুর্বল, ভীরুপ্রাণ ব্যক্তিও যদি রাজাকে সেবা করে কেউ তাকে অসম্মান করতে পারে না।

দমনকের কথার সূত্রধরে পরবর্তীতে করটক ও সঞ্জীবকের উক্তিতে রাজসেবার দুঃসাধ্যের কথা পঞ্চতন্ত্রকার নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করেছেন –

দুরারাধ্যা হি রাজানঃ পর্বতা ইব সর্বদা।
ব্যালাকীর্ণাঃ সুবিষমাঃ কঠিনা দুঃখসেবিতাঃ॥
ভোগিনঃ কঞ্চুকাবিষ্টাঃ কুটিলাঃ ক্রুরচেষ্টিতাঃ।
সুদৃষ্টা মন্ত্রসাধ্যাশ্চ রাজানঃ পন্নগা ইব॥১/৬৪-৬৫
ভক্তানামুপকারিণাং পরহিতব্যাপারযুক্তাত্মনাং
সেবাসদ্ব্যবহারতত্ত্ববিদুষাং দ্রোহচ্যুতানামপি।
ব্যাপত্তিঃ স্খলিতান্তরেষু নিয়তা সিদ্ধির্ভবেদ্বা ন বা

তস্মাদম্বুপতেরিবাবনিপতেঃ সেবা সদা শঙ্কিনী ॥
ভাবস্নিগ্ধৈরুপকৃতমপি দ্বেষ্যতাং যাতি লোকে
সাক্ষাদন্যৈরপকৃতমপি প্রীতয়ে চোপযাতি।
দুর্গ্রাহ্যত্বান্নৃপতিমনসাং নৈকভাবাশ্রয়াণাং
সেবাধর্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ॥১/২৮৭-২৮৮

অর্থাৎ, রাজাদের আরাধনা পর্বতকে অনুকূল করার মতোই বড়ো কঠিন কাজ। পর্বত যেমন হিংস্র জন্তু জানোয়ারে ভর্তি, তেমনি রাজার চারপাশ সুবিধাবাদী ও দুষ্ট লোকে ভর্তি থাকে। ওটি অতিশয় এবড়ো-থেবড়ো, আর রাজাকে বোঝা ভার। উভয়ই কর্কশ কঠিন। ওটি চড়তে বড়ো কষ্ট, এর সেবাতেও কষ্টের শেষ নেই। রাজারা সাপের মতো। ওটির ভোগ আর্থাৎ ফণা আছে, ইনিও ভোগী। ওটির কঞ্চুক অর্থাৎ খোলস আছে, এরও কঞ্চুক আর্থাৎ বর্ম আছে। ও কুটিল-এঁকেবেঁকে চলে, ইনিও কুটিল প্যাঁচালো এবং এ ক্রুর হিংস্র কর্ম করে, ইনিও ক্রুর-নিষ্ঠুর কর্ম করেন। উভয়েই অতিশয় দুষ্ট। এটিও মন্ত্রে বশ হয়, ইনিও বশ হন মন্ত্রে আর্থাৎ মন্ত্রণায়। ভক্ত, উপকারী, পরহিতকর্মে প্রদত্ত প্রাণ-মণ-দেহ, জানা আছে কাকে বলে সেবা, কাকে বলে বিদ্রোহ, তা-সত্ত্বেও পুরস্কার পাওয়া যেতে পারে আবার না-ও পারে, কিন্তু ভুল করলে সর্বনাশ সুতরাং সাগরের মতোই রাজার সেবা বড়ো শক্ত, পদে পদে ত্রাস। অর্থাৎ সমুদ্রোপজীবী মানুষের মতো রাজসেবক সদাই ভয়ে থাকে। রাজার বিরক্তি উদ্রেক করে আন্তরিক ভালোবেসে করা উপকার। বিপরীত লোকেদের চোখের সুমুখে করা অপকার তা-ও চমৎকার লাগে কখন যে কী ভাব, তার ঠিক নেই। নৃপতির মন বোঝা কঠিন ব্যাপার। অতীব জটিল এই সেবাধর্ম, সাধ্য নেই যোগীরও বোঝার।

পরবর্তীতে 'সিংহ, উট ও কাক' গল্পে পঞ্চতন্ত্রকার বুঝাতে চেয়েছেন, রাজার ভালো-মন্দ দুই গুণই থাকবে, তবে রাজ্যের জন্য রাজাই মূল অবলম্বন। তাঁকে প্রাণপণে রক্ষা করতে হয়। যেমন –

যস্মিন্ কুলে যঃ পুরুষঃ প্রধানঃ স সর্বযত্নৈঃ পরিরক্ষণীয়ঃ।

তস্মিন্ বিনিষ্টে হি কুলং বিনষ্টং ন নাভিভঙ্গে হ্যরকা বহন্তি ॥১/২৯৪

গৃধ্রাকারো ঽপি সেব্যঃ স্যাদ্ধংসাকারৈঃ সভাসদৈঃ ।

হংসাকারো ঽপি সংত্যাজ্যো গৃধ্রাকারৈঃ স তৈর্নৃপঃ॥১/৩০৫

অর্থাৎ, যে কুলে যে পুরুষ প্রধান, তাকে প্রাণপণে রক্ষা করবে। সে গেলে তো কুলই গেল। চাকার নাভিটি ভাঙলে অরেরা অর্থাৎ, শলাকাগুলি কি আর বইতে পারে? গৃধ্র হলেও সেব্য রাজা, হংস যদি হয় সভা-জন। হংস হলেও ত্যাজ্য রাজা, গৃধ্র যদি হয় সভা-জন।

তবে রাজার স্নেহ ও ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কতগুলো কাজ করতে হয়। পঞ্চতন্ত্রকার সেই কৌশলও বাতলে দিয়েছেন। যেমন –

জীবেতি প্রব্রুবন্ প্রোক্তঃ কৃত্যং কৃত্যবিচক্ষণঃ।

করোতি নির্বিকল্পং যঃ স ভবেদ্ রাজবল্লভঃ॥১/ ৫৩

প্রভুপ্রসাদজং বিত্তং সুপ্রাপ্তং যো নিবেদয়েৎ।

বস্ত্রাদ্যং চ দধাত্যঙ্গে স ভবেদ্ রাজবল্লভঃ ॥

অন্তঃপুরচরৈঃ সার্ধং যো ন মন্ত্রং সমাচরেৎ।

ন কলত্রৈর্নরেন্দ্রস্য স ভবেদ্ রাজবল্লভঃ ॥

সম্মতেঽহং প্রভোনিত্যমিতি মত্বা ব্যতিক্রমেৎ।

কৃচ্ছ্রেষ্বপি ন মর্যাদাং স ভবেদ্ রাজবল্লভঃ ॥

দ্বেষিদ্বেষপরো নিত্যমিষ্টানামিষ্টকর্মকৃৎ ।

যো নরো নরনাথস্য স ভবেদ্ রাজবল্লভঃ ॥

দ্যূতং যো যমদূতাভং হালাং হালাহলোপমাম্ ।

পশ্যেদ্ দারান্ বৃথাকারান্ স ভবেদ্ রাজবল্লভঃ ॥

যুদ্ধকালেঽগ্রগো যঃ স্যাৎ সদা পৃষ্ঠানুগঃ পুরে।

প্রভোর্দ্বারাশ্রিতো হর্ম্যে স ভবেদ্ রাজবল্লভঃ ॥১/৫৩-৫৯

অর্থাৎ, যে ভৃত্য ডাকলেই মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন বলে সম্মোধন করে, কর্তব্যে বিচক্ষণ আর ইতস্তত না করে বা যা বলা হয় তাই করে এমন ব্যক্তি রাজার প্রিয় হয়। প্রসন্ন প্রভুর দেওয়া ধন পেয়ে যে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং তাঁর দেওয়া উপহার অঙ্গে ধারণ করে

সে রাজার প্রিয় হয়। অন্তঃপুরের ভৃত্যদের সঙ্গে যে গুজগুজ-ফুসফুস করে না এবং রাজার রানীদের সঙ্গে কথা বলে না, সে রাজার প্রিয় হয়। আমায় তো রাজা খুবই ভালো নজরে দেখেন, এই ধারণায় যে কখনোই মর্যাদা লঙ্ঘন করে না, সঙ্কটে পড়েও না, সে রাজার প্রিয় হয়। রাজা যাদের পছন্দ করেন, যাদের অপছন্দ করেন, যে রাজার প্রিয়কার্য করে, সে রাজার প্রিয় হয়। জুয়াকে যে দেখে যমদূতের মতো, সুরাকে বিষের মতো, এবং রাজপত্নীদের আবছায়ার মতো। সে রাজার প্রিয় হয়। যে সর্বদা যুদ্ধের সময় প্রভুর আগে যায়, রাজধানীতে পেছনে পেছনে থাকে, আর প্রাসাদে থাকে দরজায় দণ্ডয়মান, সে রাজার প্রিয় হয়।

রাজধর্ম

রাজধর্ম বলতে সাধারণত বোঝায় রাজার আচরিত ধর্ম, রাজার পালনীয় কর্তব্য তথা দেশ শাসন, প্রজাশাসন প্রভৃতি। *পঞ্চতন্ত্রে* বিষ্ণুশর্মা মিত্রপ্রাপ্তি নামক দ্বিতীয় তন্ত্রে রাজধর্মের সংজ্ঞায় বলেছেন – 'যে রাজা ভৃত্যদের, প্রজাদের নির্ভয়ের স্থান এবং যে রাজা ভৃত্যদের-প্রজাদের বেশী সম্মান দেন তিনিই রাজধর্ম পালন করেন। অপরদিকে পঞ্চতন্ত্রকার আরও বলেছেন সুশীল ভৃত্য যদি না খেয়ে মরতে বসে আর প্রভু সুস্থ থাকেন, সে প্রভু পরকালে নরকে যাবেন, দুঃখ পাবেন নিশ্চিত।'[৩] বিষ্ণুশর্মা দুষ্টু অমনোযোগী কুমারদের পশু-পাখি-জীব-জন্তু নানা চরিত্রের মাধ্যমে গল্প রচনা করে রাজধর্ম সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া রাজার ধর্ম, তাঁর স্বভাব, মানসিকতা, চিন্তা- চেতনা কেমন হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করে রাজনীতি শেখাতে চেয়েছেন। যেমন – পিঙ্গলক নামে এক সিংহকে রাজার চরিত্রে রূপায়ণ করেছেন এবং সেই সাথে নীতির আবরণে রাজধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়েছেন। মিত্রভেদের প্রথমে বলা হয়েছে – 'বনের রাজা পিঙ্গলক সঞ্জীবককে দেখে মনে ভয় পেল কিন্তু রাজা বলে কথা, ভয়টা চোখে মুখে ফুটতে না দিয়ে, মনের ভয় মনে চেপে যমুনায় জল খেতে গিয়েও ফিরে আসল এবং চতুর্মণ্ডল অবস্থান করে বসে পড়ল।'[৪] এখানে চতুর্মণ্ডল কি? সে সম্পর্কেও বিষ্ণুশর্মা ব্যাখ্যা

দিয়েছেন – 'প্রথমে হচ্ছে সিংহ, তারপর সিংহের অন্তরঙ্গ অনুচরবৃন্দ, তারপর কাক-বকেরা এবং কিং-বৃত্তেরা।'[৫] অর্থাৎ চার স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা বিধান করে অবস্থান করল। তৎকালীন সময়ের নিরাপত্তার এই ধারণা বর্তমান সময়ে অনেক কার্যকরী। কেননা বর্তমান সময়ে সরকার প্রধানদের নিরাপত্তার স্বার্থে চতুর্মণ্ডলের মতো করে চার স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তার বিধান করা হয়। রাজা কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে নিরাপত্তার স্বার্থে নিযুক্ত করে থাকেন দমনকের উক্তিতে বিষ্ণুশর্মা তা ব্যক্ত করেছেন –

আসন্নমেব নৃপতির্ভজতে মনুষ্যং
বিদ্যাবিহীনমকুলীনমসংস্কৃতং বা।
প্রায়েণ ভূমিপতয়ঃ প্রমদা লতাশ্চ
যৎপার্শ্বতো ভবতি তৎ পরিবেষ্টয়ন্তি॥ ১/৩৫

অর্থাৎ, যে লোক রাজার কাছাকাছি থাকে, তাকেই ধরেন, না থাক তার লেখাপড়া, না থাক উচ্চকুলে জন্ম, না থাক সংস্কৃতি। মূলত রাজারা, মেয়েরা এবং লতারা সাধারণত যে নিকটে থাকে তাকেই জড়ায়।

দমনকের উক্তিতে বিষ্ণুশর্মা রাজাকে বিবেকবান, উদার, মিষ্টভাষী হতে বলেছেন। তা না হলে সে রাজাকে ত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন –

অপি স্থাণুবদাসীনঃ শুষ্যন্ পরিগতঃ ক্ষুধা।
ন ত্বেবানাত্মসম্পন্নাদ্ বৃত্তিমীহেত পণ্ডিতঃ॥
সেবকঃ স্বামিনং দ্বেষ্টি কৃপণং পরুষাক্ষবম্।
আত্মানং কিং স ন দ্বেষ্টি সেব্যাসেব্যং ন বেত্তি যঃ॥১/৪৯-৫০

অর্থাৎ, পণ্ডিত ব্যক্তি ক্ষুধায় একবারে শুকিয়ে থামের মতো অচল অনড় হয়ে বসে থাকবেন, তবু যার বিবেকের বলাই নেই এমন রাজার চাকরি করতে যাবেন না। কৃপণ এবং রুক্ষভাষী রাজাকে কেউ দুচক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু তার তো নিজেকেই দোষা উচিত, কেননা সে নিজেই তো জানে না, কোন রাজার চাকরি করতে হয়, আর কোন রাজার করতে হয় না।

রাজধর্ম বড়ই জটিল ও কুটিল বিষয় একথা আমরা সবাই জানি। রাজা খুবই ক্ষমতাবান ব্যক্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পঞ্চতান্ত্রিক যুগেও দেখা যায় যে, রাষ্ট্রে সামান্য কোনো ত্রুটি হলেও হাতজোড় করে ভুল স্বীকার করতে হয়েছে। আবার কখনও বজ্রের মতো কঠিনও হতে হয়। তা না হলে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। তবে রাজাকে সকল পরিস্থিতি বুদ্ধির দ্বারা মোকাবেলা করে চলতে হয়। যেমন –

দুরারোহং পদং রাজ্ঞাং সর্বলোকনমস্কৃতম্।
স্বল্পেনাপ্যপকারেণ ব্রাহ্মণ্যমিব দুষ্যতি॥
দুরারাধ্যা শ্রিয়ো রাজ্ঞাং দুরাপা দুষ্পরিগ্রহাঃ
তিষ্ঠন্ত্যাপ ইবাধারে চিরমাত্মনি সংস্থিতাঃ॥
যস্য যস্য হি যো ভাবস্তস্য তস্য হি তং নরঃ
অনুপ্রবিশ্য মেধাবী ক্ষিপ্রমাত্মবশং নয়েৎ॥১/৬৬-৬৮
কনকভূষণসংগ্রহণোচিতো যদি মণিস্ত্রপুণি প্রতিবধ্যতে।
ন স বিরৌতি ন চাপি স শোভতে ভবতি যোজয়িতুর্বচনীয়তা॥১/৭৫
অন্যপ্রতাপমাসাদ্য যো দৃঢ়ত্বং ন গচ্ছতি।
জতুজাভরণস্যেব রূপেণাপি হি তস্য কিম্॥১/১০৭

অর্থাৎ, রাজা হওয়া সহজ কথা নয়, কখনও হাতজোড় করে থাকতে হয়। কেননা পান থেকে চুনটি খসলেই *মহাভারত* অশুদ্ধ হয় যেন । রাজশ্রীর আরাধনা অতি কঠিন ব্যাপার, কঠিন তাকে পাওয়া, কঠিন তাকে আয়ত্তে রাখা। তবে একবার একজনের কাছে থিতু হলে ইনি অনেকদিন থাকেন, আধারে জলের মতো। আবার যার যেটি ভাব, সেটি ঠিক বুঝে নিয়ে মেধাবী ব্যক্তি চট করে বশ করে ফেলতে পারে। যে মণি সোনার গয়নায় বসানো উচিত, তা যদি টিনে বসানো হয়, তখন সে যদি চমক না দেয়, রুনুঝুনু রব না তোলে- সে তো স্যাকরার দোষ। অন্যের প্রতাপের সামনে যে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তার রূপ নিয়েই বা কী হবে ? সে তো বাহারী লাক্ষার গয়না, তাপ লাগলেই গলে যায়।

রাজধর্মের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ধৈর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। দমনকের উক্তিতে বিষ্ণুশর্মা ধৈর্যের কথা নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করেছেন –

অত্যুৎকটে চ রৌদ্রে চ শত্রৌ প্রাপ্তে ন হীয়তে।
ধৈর্যং যস্য মহীনাথো ন স যাতি পরাভবম্॥
দর্শিতভয়েঽপি ধাতরি ধৈর্যধ্বংসো ভবেন্ন ধীরাণাম্।
শোষিতসরসি নিদাঘে নিতরামেবোদ্ধতঃ সিন্ধুঃ॥১/১০৩-১০৪

অর্থাৎ, অতিবড়ো ভয়ংকর শত্রুর আক্রমণেও যে রাজার ধৈর্য টলে না, তাঁর পরাজয় নেই।

স্বয়ং বিধাতা ভয় দেখালেও ধীরেদের ধৈর্যচ্যুতি হয় না। ঘোর গ্রীষ্মে পুকুর শুকিয়ে যায় বটে, কিন্তু সাগর? সে তো আরও উত্তাল হয়।

তবে এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুশর্মা রাজাকে অবশ্যই শ্রদ্ধাবান হওয়ার কথা বলেছেন। যেমন –

বাচ্যং শ্রদ্ধাসমেতস্য পৃচ্ছতশ্চ বিশেষতঃ।
প্রোক্তং শ্রদ্ধাবিহীনস্য অরণ্যরুদিতোপমম্ ॥১/৩৯৭

অর্থাৎ, সশ্রদ্ধ, বিশেষ করে জিজ্ঞাসু যে, উপদেশ তাকেই দেওয়া শোভন। শ্রদ্ধা নেই যার তাকে বলতে যাওয়া অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাজধর্মে ভৃত্য

রাজধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাজকর্মচারী বা ভৃত্যদের প্রতি রাজার ভূমিকা। *পঞ্চতন্ত্রে* এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। রাজা কেমন ধরনের ভৃত্য নিয়োগ করবেন,[৬] রাজার ভৃত্যদের প্রতি কি ধরনের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা উচিত? কি কারণে ভৃত্য প্রভুকে ত্যাগ করে? প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক কেমন ছিল, কার কি কর্তব্য-কর্ম ছিল? রাজা যদি তাঁদের প্রতি দয়া-মায়া-আদর-যত্ন-স্নেহ-সম্মান দেখান তাহলে রাষ্ট্রের জন্য কতটা মঙ্গল।[৭] কিভাবে নেতৃত্বগুণে আদর্শ ভৃত্যে পরিণত হয়। এমন ভৃত্যদের নানা বিষয় সম্পর্কে পঞ্চতন্ত্রকার মিত্রভেদে রাজধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশদভাবে উপস্থাপন করেছেন –

যমাশ্রিত্য ন বিশ্রামং ক্ষুধার্তা যান্তি সেবকাঃ।
সোহর্কবন্নৃপতিস্ত্যাজ্যঃ সদা পুষ্পফলোঽপি সন॥১/৫১
সব্যদক্ষিণয়োর্যত্র বিশেষো নোপলভ্যতে।
কস্তত্র ক্ষণমপ্যার্যো বিদ্যমানগতির্বসেৎ॥১/৭৬
কাচে মণির্মণৌ কাচো যেষাং বুদ্ধিবিকল্পতে।
ন তেষাং সন্নিধৌ ভৃত্যো নামমাত্রেঽপি তিষ্ঠতি॥
যত্র স্বামী নির্বিশেষং সমং ভৃত্যেষু বর্ততে।
তত্রোদ্যমসমর্থানামুৎসাহঃ পরিহীয়তে॥
ন বিনা পার্থিবো ভৃত্যৈর্ন ভৃত্যঃ পার্থিবং বিনা।
তেষাং চ ব্যবহারোঽয়ং পরস্পরনিবন্ধনঃ॥
ভৃত্যৈর্বিনা স্বয়ং রাজা লোকানুগ্রহকার্যপি।
ময়ূখৈরিব দীপ্তাংশুস্তেজস্ব্যপি ন শোভতে॥
অরৈঃ সন্ধার্যতে নাভির্নাভৌ চারাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
স্বামিসেবকয়োরেবং বৃত্তিচক্রং প্রবর্ততে॥
শিরসা বিধৃতা নিত্যং স্নেহেন পরিপালিতাঃ।
কেশা অপি বিরজ্যন্তে নিঃস্নেহাঃ কিং ন সেবকাঃ॥
রাজা তুষ্টোঽপি ভৃত্যানামর্থমাত্রং প্রযচ্ছতি।
তে তু সম্মানমাত্রেণ প্রাণৈরপ্যুপকুর্বতে॥
এবং জ্ঞাত্বা নরেন্দ্রেণ ভৃত্যাঃ কার্যা বিচক্ষণাঃ।
কুলীনাঃ শৌর্যসংযুক্তাঃ শক্তা ভক্তাঃ ক্রমাগতাঃ॥১/৭৬-৮৪
স্বাম্যাদেশাৎ সুভৃত্যস্য ন ভীঃ সঞ্জায়তে চিৎ ।
প্রবিশেম্মুখমাহেয়ং দুস্তরং বা মহার্ণবম্॥১/১১১
স্বাম্যাদিষ্টস্তু যো ভৃত্যঃ সমং বিষমমেব চ।
মন্যতে ন স সন্ধার্যো ভূভুজা ভূতিমিচ্ছতা॥১/১১২

অর্থাৎ, যার চাকরিতে ভৃত্যেরা খালি পেটে কেবল খেটেই চলে, বিশ্রাম পর্যন্ত পায় না, থাকুক না তাঁর অফুরন্ত জাঁক-জৌলুস ধন-রতন, তাকে ত্যাগ করা উচিত। ক্ষুধার্ত পথিক কি আকন্দগাছের কাছে এসেও ছেড়ে চলে যায় না, যদি সে ফুলে-ফলে ভর্তিও থাকে?

যেখানে ডাইনে-বাঁয়ে ভেদ নেই আর্থাৎ মুড়ি-মিছরির এক দর, অন্য উপায় থাকলে সেখানে এক মুহূর্তের জন্য ভদ্র ভৃত্যরা অবস্থান করবে না। যারা কাচঁকে মণি ভাবে, আর মণিকে কাঁচ ভাবে -এই যাদের বুদ্ধি, তাঁদের কাছে কোনো ভৃত্য থাকবে না, থাকলেও রাজার সুনাম করবে না। যেখানে মালিক সব ভৃত্যের সঙ্গেই সমান ব্যবহার করেন, কোনো তারতম্য-ভেদাভেদ করেন না, সেখানে যারা উদ্যম-সমর্থ তাদের উৎসাহ কমে যায়। ভৃত্য ছাড়া রাজা থাকতে পারেন না। ভৃত্যও রাজা ছাড়া থাকতে পারে না। তাদের সম্পর্কটা হল পারস্পরিক। লোকানুগ্রহকারী এবং তেজস্বী হয়েও ভৃত্য ছাড়া রাজা নিজে নিজে শোভা পান না, যেমন সূর্য লোকানুগ্রহকারী ও তেজস্বী হয়েও তার কিরণ ছাড়াও শোভা পায় না। চাকার নাভিকে কেন্দ্র করে ধরে থাকে শলাকারা আবার শলাকাদের ধরে থাকে নাভি। প্রভু এবং ভৃত্যের সম্পর্কও চাকার মতো এইভাবে ঘোরে। মাথায় ধরে থাকা চুল রোজ রোজ স্নেহ (তেল) দিয়ে কত যত্ন করা হয়, তাও একটু স্নেহ না দিলেই চুলের রং পাল্টে যায়। তাই একদিন যাদের মাথায় করে কতো স্নেহে পালন করেছিলে, সেই ভৃত্যেরা স্নেহ-ভালোবাসা না পেলে দূরে সরে যাবে না কেন? রাজা ভৃত্যের ওপর যতই সন্তুষ্ট হোন, তাদের কি প্রদান করেন? শুধু টাকা! কিন্তু ভৃত্য টাকায় সন্তুষ্ট নয়। এতটুকু সম্মান পেলেই সে বিনিময়ে প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে উপকার করে। এসব বুঝে-শুনে রাজা বিচক্ষণ কুলীন শূর সমর্থ অনুরক্ত কুলক্রমাগত ভৃত্য নিয়োগ করবেন।

প্রভু যেমন নানা সুবিধাদি দেন তেমনি ভৃত্যও নানা সুবিধাদির উপড় ভিত্তি করে আজ্ঞাবহ থাকে। অপরপক্ষে রাজার যেমন ভৃত্যদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, তেমনি ভৃত্যদের রাজা ও রাজ্যের প্রতি বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। যে ভৃত্যকে কাজ সঁপে দিয়ে রাজা নিশ্চত থাকতে পারেন, সে তো বলতে গেলে তাঁর আর এক অন্তরাত্মা হয়ে দাঁড়ায়। সে ভৃত্যই প্রকৃত সহায় যে রাজার কোনো দুষ্কর অথচ উত্তম হিতকর কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করে লজ্জায় মুখ ফুটে পর্যন্ত বলে না।[৮] নীরবে-নিভৃতে কাজ করে আরেকটি কাজের অপেক্ষায় থাকে। কষ্ট পেয়েও সহ্য করে, কোনো কাজে বলতে হয় না। সর্বদা দড়জায় দণ্ডায়মান থাকে। যেমন –

যো ঽনাহূতঃ সমভেতি দ্বারি তিষ্ঠতি সর্বদা।
পৃষ্টঃ সত্যং মিতং ব্রূতে স ভৃত্যো ঽর্হো মহীভুজাম্॥
অনাদিষ্টো ঽপি ভূপস্য দৃষ্ট্বা হানিকরং চ যঃ।
যততে তস্য নাশায় স ভৃত্যো ঽর্হো মহীভুজাম্॥
তাড়িতো ঽপি দুরুক্তো ঽপি দণ্ডিতো ঽপি মহীভুজা।
যো ন চিন্তয়তে পাপং স ভৃত্যো ঽর্হো মহীভুজাম্॥
ন ক্ষুধা পীড্যতে যস্তু নিদ্রয়া ন কদাচন।
ন চ শীতাতপাদ্যৈশ্চ স ভৃত্যো ঽর্হো মহীভুজাম্॥
শ্রুত্বা সাংগ্রামিকীং বার্তাং ভবিষ্যাং স্বামিনং প্রতি।
প্রসন্নাস্যো ভবেদ্ যস্তু স ভৃত্যো ঽর্হো মহীভুজাম্॥
সীমা বৃদ্ধিং সমায়াতি শুক্লপক্ষ ইবোডুরাট্।
নিয়োগসংস্থিতে যস্মিন্ স ভৃত্যো ঽর্হো মহীভুজাম্॥
সীমা সঙ্কোচমায়াতি বহ্নৌ চর্ম ইবাহিতম্।
স্থিতে যস্মিন্ স তু ত্যাজ্যো ভৃত্যো রাজ্যং সমীহতা॥১/৮৭–৯৩
অন্ত্যাবস্থো ঽপি মহান্ স্বামিগুণান্ন জহাতি তু শুদ্ধতয়া।
ন শ্বেতভাবমুজ্ঝতি শঙ্খঃ শিখিভুক্তমুক্তো ঽপি॥৪/১০৬

অর্থাৎ, না ডাকতেই যে এসে দরজায় সবসময় খাড়া এবং জিজ্ঞেস করলে যে সংক্ষেপে সত্য কথা বলে, সেই হলো সত্যিকার রাজভৃত্য। রাজার ক্ষতিকর কিছু দেখলে আদেশের অপেক্ষা না করেই যে সেটি দূর করার চেষ্টা করে, সেই হলো সত্যিকার রাজভৃত্য। রাজার কাছে মার খেয়ে, গালি খেয়ে, শাস্তি পেয়েও যে তাঁর অনিষ্ট চিন্তা করে না, সেই হলো আদর্শবাদী রাজভৃত্য। খিদে নেই, ঘুম নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই দিনরাত সেবা করে চলছে সেই হলো সত্যিকার রাজভৃত্য। যুদ্ধ আসন্ন খবর পেয়ে যে প্রফুল্লমুখে রাজার সামনে এসে দাঁড়ায় সেই হলো সত্যিকার রাজভৃত্য। যার কার্যকালে শুক্লপক্ষে চাঁদের মতো রাজ্যের সীমা বাড়তে থাকে, সেই হলো সত্যিকার রাজভৃত্য। আগুনে ফেললে চামড়া যেমন কুচঁকে যায়, তেমনি করে রাজ্যসীমা সঙ্কুচিত হয় যার কার্যকালে, রাজ্যেচ্ছু নৃপতি তেমন ভৃত্যকে ত্যাগ করবেন। সৎ ভৃত্য যে, সে অকুতোভয়ে প্রভুর আদেশে ঢুকবে সাপের মুখে, ঝাঁপ দেবে বিপদ সঙ্কুল পারাবারে। অপরদিকে প্রভুর আদেশ পেয়ে

যে- ভৃত্য ভাবে কাজটি শক্ত, না সোজা রাজা যদি ভালো চান তবে কাল বিলম্ব না করে তাকে বিদায় দেবেন। ভৃত্য বড়লোক হয়েও শেষ দশাতে প্রভুর গুণ-গান ছাড়েন না, সেই হলো খাঁটি রাজভৃত্য। কেননা শাঁখা আগুনে পুড়িয়ে ছেড়ে দিলেও যে-সাদা সেই-সাদাই থাকে।

রাজ কর্মচারী হওয়ায় মনে মনে গর্ব থাকলেও সর্বদা ভয়-ভীতির আশঙ্কা কাজ করে। যদি পিছে কোন ভুল হয়ে য়ায়। রাজ ভৃত্যদের মনের সে অবস্থা পঞ্চতন্ত্রকার অতি সাবলীলভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন –

সম্পত্তয়শ্চ পরায়ত্তাঃ সদা চিত্তমনির্বৃতম্।
স্বজীবিতেঽপ্যবিশ্বাসস্তেষাং যে রাজসেবকাঃ॥১/২৬৬
বরং বনং বরং ভৈক্ষ্যং বরং ভারোপজীবনম্।
বরং ব্যাধির্মনুষ্যাণাং নাধিকারেণ সম্পদঃ॥১/২৮৩
প্রভোঃ প্রসাদমন্যস্য ন সহন্তীহ সেবকাঃ।
সপত্ন্য ইব সংক্রুদ্ধাঃ সপত্ন্যাঃ স্বাকৃতেরপি॥১/২৮৯

অর্থাৎ, রাজার চাকর হলে এই হয় – চিত্তে সদাই অস্বস্তি। কখন যে প্রাণ যাবে ঠিক নেই, কেননা তাঁর হাতেই সমস্ত বিচারের ভার। এর থেকে বন ভালো, ভালো ভিক্ষা মেগে খাওয়া, অন্য কায়িক পরিশ্রম করে জীবনধারণ করা ভালো। রোগও ভালো, তবু ভালো নয়, পদস্ত হয়ে ধন-সম্পদ লাভ করা। অন্যের ওপর প্রভুর অনুগ্রহ ভৃত্যরা সইতে পারে না, যেমন রূপসী সতীনের ওপরেও স্বামীর সোহাগ সইতে পারে না সতীনরা, রেগে আগুন হয়, কখনও ভীষণ কষ্ট পায়।

পঞ্চতন্ত্রকার আদর্শবান ভৃত্যের পুরস্কারের কথা বলেছেন। তবে বস্তুগত কোনো পুরস্কারের কথা বলেননি। নিষ্ঠাবান ভৃত্য পারমার্থিকভাবে পুরস্কারে ভূষিত হয়। স্রষ্টাই তাঁর কর্মের পুরস্কার দেন। সে পরম গতি লাভ করে এবং তাঁর কীর্তি-যশ অক্ষয় হয়ে থাকে। যেমন –

স্বাম্যর্থে যস্ত্যজেৎ প্রাণান্ ভৃত্যো ভক্তিসমন্বিতঃ।
স পরং পদমাপ্নোতি জরামরণবর্জিতম্॥১/২৯৬
মৃতানাং স্বামিনঃ কার্যে ভৃত্যানামনুবর্তিনাম্।
ভবেৎ স্বর্গেঽক্ষয়ো বাসঃ কীর্তিশ্চ ধরণীতলে॥১/৩০১
ন যজ্বানোঽপি গচ্ছন্তি তাং গতিং নৈব যোগিনঃ।
যাং যান্তি প্রোজ্ঝিতপ্রাণাঃ স্বাম্যর্থে সেবকোত্তমাঃ ॥১/৩০৩

অর্থাৎ, যে ভৃত্য প্রভুর জন্যে ভক্তিভরে প্রাণ দেয় তার জন্ম-মৃত্যু নেই, সে ভগবানের নিত্যপদ লাভ করে। স্বর্গে তার অক্ষয়বাস হয়, কীর্তি ধরাতলে অমর থাকে। অপরদিকে যে উত্তম সেবক প্রভুর জন্য প্রাণত্যাগ করে, পরকালে যে পারমার্থ লাভ করে, তা যাজ্ঞিকও পায় না, যোগীও পায় না।

পঞ্চতন্ত্রকার কতিপয় ভৃত্যদের থেকে সাবধান হতে বলেছেন। তারা হলো – যারা চাকরী হারানো রাজ কর্মচারী, যারা রাজার কষ্ট দাঁড়িয়ে দেখে এবং যুদ্ধের সময় নীরব থাকে। যেমন –

যে ভবন্তি মহীপস্য সম্মানিতবিমানিতাঃ।
যতন্তে তস্য নাশায় কুলীনা অপি সর্বদা॥১/১১৩
আপদং প্রাপ্নুয়াৎ স্বামী যস্য ভৃত্যস্য পশ্যতঃ।
প্রাণেষু বিদ্যমানেষু স ভৃত্যো নরকং ব্রজেৎ॥১/২৯৫
অপি প্রাণসমানিষ্টান্ পালিতাঁল্লালিতানপি।
ভূত্যান্ যুদ্ধে সমুৎপন্নে পশ্যেচ্ছুষ্কমিবেন্ধনম্॥ ৩/১২২

অর্থাৎ, একসময়ে রাজার কাছে সম্মান পেয়ে পরবর্তীতে কোনো কারণে রাজা কর্তৃক যারা অপমানিত হয়েছে, তারা অভিজাত হলেও সবসময় রাজার পতন ঘটানোর চেষ্টা করে। নিজের প্রাণ থাকতে যে- চাকর মালিকের কষ্ট, দুর্দশা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, সে নির্ঘাৎ নরকে যাবে। যারা অতি প্রিয়, যাদের আপন ভেবে লালন-পালন করেছেন, নিজের প্রাণের থেকেও বেশি ভালোবেসেছেন, যুদ্ধ বাঁধলে সেসব ভৃত্যরা যদি শত্রু পক্ষকে ইন্ধন দেয় – রাজাকে এদের থেকে সর্বদা সাবধান থাকতে হবে।

ভৃত্যবৃত্তিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাজার দোষ-গুণ-ভালো-মন্দ সমালোচনা করতে হবে। রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল কামনা করলে রাজাকে খুশি করার জন্য শুধুমাত্র মিষ্টি মিষ্টি প্রিয়কথা বললেই হবে না। অনেকক্ষেত্রে অপ্রিয় সত্য কথাও বলতে হবে। তাতেই রাজার কল্যাণ নিশ্চিত হবে। যেমন –

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥২/১৬৪
অপ্রিয়াণ্যপি পথ্যানি যে বদন্তি নৃণামিহ।
ত এব সুহৃদঃ প্রোক্তা অন্যে স্যুর্নামধারকাঃ॥২/১৬৫

অর্থাৎ, হে রাজন্ ! যে ভৃত্যের মিষ্টি কথা মুখে লেগে আছে সর্বক্ষণ তেমন লোক তো পাওয়া কঠিন নয়। তবে শুনতে মন্দ লাগে, তবু যাতে মঙ্গল হয়- সেরকম লোক পাওয়া খুবই দুষ্কর। অপ্রিয় হিতকর কথা রাজাকে যারা শোনায় তারাই প্রকৃত বন্ধু । অন্যরা শুধু নামেমাত্র, প্রয়োজনে কোনো কাজে লাগে না ।

দণ্ডবিধান

রাজধর্মের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দণ্ডবিধান করা বা শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা। দণ্ডনীতি ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা করা বড়ই কঠিন। অন্যায়কারী, ষড়যন্ত্রকারী যেই হোক অপরাধ অনুযায়ী তাকে অবশ্যই দণ্ড দিতে হবে। পঞ্চতন্ত্রকার বিভিন্ন প্রসঙ্গে সে বিষয় উল্লেখ করেছেন। যেমন –

তুল্যার্থং তুল্যসামর্থ্যং মর্মজ্ঞং ব্যবসায়িনম্।
অর্ধরাজ্যহরং ভৃত্যং যো ন হন্যাৎ স হন্যতে॥১/২৫১
দত্ত্বাপি কন্যকাং বৈরী নিহন্তব্যো বিপশ্চিতা।
অন্যোপায়ৈরশক্যো যো হতে দোষো ন বিদ্যতে॥১/২৭৯
কৃত্যাকৃত্যং ন মন্যেত ক্ষত্রিয়ো যুধি সঙ্গতঃ।
প্রসুপ্তো দোণপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পুরা হতঃ॥১/২৮০
জাতমাত্রং ন যঃ শত্রুং ব্যাধিং চ প্রশমং নয়েৎ।

মহাবলোঽপি তেনৈব বৃদ্ধিং প্রাপ্য স হন্যতে॥১/৩৬৮

নিস্ত্রিংশং হৃদয়ং কৃত্বা বাণীং চেক্ষুরসোপমাম্।

বিকল্পোঽত্র ন কর্তব্যো হন্যাৎ তত্রাপকারিণম্॥১/৩৭১

অর্থাৎ, অর্থে তুল্য, সামর্থ্যে তুল্য, উদ্যোগী, নাড়ীনক্ষত্রের খবর জানে এবং অর্ধেক রাজ্য নিয়ে নিতে পারে, এমন ভৃত্যকে যিনি হত্যা করেন না, তিনি নিজেই মরেন। প্রাজ্ঞ লোক কন্যা সমর্পণ করলেও শত্রুকে (অর্থাৎ জামাইকেও) হত্যা করে। অন্য উপায় না থাকলে তেমন হত্যায় দোষ নেই। যুদ্ধে নামলে ক্ষত্রিয় কি বাছে কৃত্যাকৃত্য? যেমন ঘুমের মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রকে মারলেন। জন্মমাত্র শত্রু কিংবা ব্যাধিকে নির্মূল করা উচিত, তা নাহলে শক্তিশালী হয়ে প্রভুকেই আক্রমণ করে। তাই রাজাকে খড়্গের মতো, বজ্রের মতো করতে হয় হৃদয়টা, আর কথাগুলো করতে হয় আখের রসের মতো। তাই অনিষ্টকারীকে ইতস্তত না করে মেরে ফেলাই রাজনীতি।

এছাড়া কাকোলূকীয় তন্ত্রে 'হাতির দল ও খরগোসেরা' গল্পে রাজা হাসতে হাসতে দণ্ড দিয়ে থাকেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না, সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন –

স্পৃশন্নপি গজো হন্তি জিঘ্রন্নপি ভুজঙ্গমঃ।

হসন্নপি নৃপো হন্তি মানয়ন্নপি দুর্জনঃ॥৩/৮২

অর্থাৎ, হাতি স্পর্শের মাধ্যমে পদদলিত করে হত্যা করে, সাপ নিঃশ্বাসের মাধ্যমে, দুর্জন হত্যা করে সম্পর্ক স্থাপন করে, তেমনি রাজা হাসতে হাসতে দণ্ড দিয়ে দেন।

রাজধর্মে রক্ষক হিসেবে ভূমিকা

প্রজাদের রক্ষক হিসেবে রাজার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যে অশান্তি, অরাজকতা, চুরি-ডাকাতি তথা কোনো কারণে শান্তি বিনষ্ট হলে রাজাই রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাজাই প্রজাদের রক্ষা করে থাকেন। যেমন –

চাটুতস্করদুর্বৃত্তৈস্তথা সাহসিকাদিভিঃ।

পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষ্যাঃ কূটচ্ছদ্মাদিভিস্তথা॥
প্রজানাং ধর্মষড্ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষিতুঃ।
অধর্মাদপি ষড্ভাগো জায়তে যো ন রক্ষতি॥
প্রজাপীড়নসন্তাপাৎ সমুদ্ভূতো হুতাশনঃ।
রাজ্ঞঃ শ্রিয়ং কুলং প্রাণান্নাদগ্ধ্বা বিনিবততর্তে॥
রাজা বন্ধুরবন্ধূনাং রাজা চক্ষুরচক্ষুষাম্।
রাজা পিতা চ মাতা চ সর্বেষাং ন্যায়বর্তিনাম্॥
ফলার্থী পার্থিবো লোকান্ পালয়েদ্ যত্নমাস্থিতঃ।
দানমানাদিতোয়েন মালাকারো২ঙ্কুরানিব॥
যথা বীজাঙ্কুরঃ সূক্ষ্মঃ প্রজযত্নেনাভিরক্ষিতঃ।
ফলপ্রদো ভবেৎ কালে তদ্বল্লোকঃ সুরক্ষিতঃ॥
হিরণ্যধান্যরত্নানি যানানি বিবিধানি চ।
তথান্যদপি যৎকিঞ্চিৎ প্রজাভ্যঃ স্যান্নৃপস্য তৎ॥১/৩৪৭-৩৫৩

অর্থাৎ, ঠগবাজ, চোর, দুর্বৃত্ত, ডাকাত, খুনী এদের অত্যাচারে এবং মিথ্যা- জোচ্চুরি-জাল-ফাঁদ-ছলনায় নাস্তানাবুদ হচ্ছে প্রজা। রাজার উচিত তাদের রক্ষা করা। যে রাজা রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি প্রজার পুণ্যের ছয়ভাগের একভাগ প্রাপ্ত হন। আর যিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেন না, তিনি পান তার পাপের চার ভাগের একভাগ। প্রজাপীড়নের সন্তাপ থেকে যে আগুন জন্মায়, রাজার কুলশ্রী, প্রাণ ছাই করে তবে শান্ত হয়। যার কেউ নেই তার আছে রাজা, নেত্রহীনের রাজা দু নয়ন, রাজাই তাদের জনক-জননী। রাজা যদি সফলতা চান, তাহলে দান-মান ইত্যাদি দিয়ে সযত্নে প্রজাপালন করবেন, মালী যেমন অঙ্কুরগুলি পালন করে জল দিয়ে। বীজের ছোট্ট একটি অঙ্কুর যেমন সযত্নে রক্ষা করলে ভবিষ্যতে ফল দেয়, তেমনিভাবে প্রজাকেও সুরক্ষিত রাখতে হবে । ধন-রত্ন, সোনা-দানা নানারকমের যানবাহন-এসব ছাড়া আর যা কিছু সবই রাজা পান প্রজাদের কাছ থেকে। অপরপক্ষে রাজাকে প্রজাদের দুঃখ-কষ্টের কথা শোনার মতো মন-মানসিকতা থাকতে হবে। রাজা যদি দুঃখ-কষ্ট সমাধানের ব্যবস্থা নাও করেন শুধু একটু শোনেন তাতেও প্রজাদের মনে প্রশান্তি আসে, দুঃখ হালকা হয়। যেমন –

সুহৃদি নিরন্তরচিত্তে গুণবতি ভৃতেঽনুবুর্তনি কলত্রে।

স্বামিনি শক্তিসমেতে নিবেদ্য দুঃখং সুখী ভবতি॥১/৩৪৫

অর্থাৎ, অভিন্ন হৃদয় বন্ধু, গুণবান ভৃত্য, পতিব্রতা পত্নী আর শক্তিমান রাজা এদের কাছে দুঃখের কথা বললে হালকা হওয়া যায়।

রাজধর্মে বিজ্ঞদের উপদেশ পালন

বিজ্ঞদের উপদেশ পালন রাজধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা রাজা যতি অজ্ঞানতার বশে মূর্খ-নীচ ব্যক্তির উপদেশ অনুসারে কাজ করেন এবং বিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে উপদেশ আমলে না নেন, তাহলে সে রাজাকে নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তাইতো বিষ্ণুশর্মা করটকের উক্তিতে বলেছেন –

নরাধিপা নীচজনানুবর্তিনো বুধোপদিষ্টেন পথা ন যান্তি যে।

বিশন্ত্যতো দুর্গমমার্গনির্গমং সমস্তসম্বাধমনর্থপঞ্জরম্॥১/৩৮৭

অর্থাৎ, যেসব রাজা নীচলোকের অনুবর্তী হয়ে পণ্ডিতদের উপদিষ্ট পথে চলেন না, তাঁরা হাজারো বিপত্তিতে ভর্তি অনর্থের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করেন, যার থেকে বেরোবার রাস্তাও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

বিষ্ণুশর্মা আরও বলেছেন যে, রাজাকে অবশ্যই শ্রদ্ধাবান হতে হবে। যেমন –

বাচ্যং শ্রদ্ধাসমেতস্য পৃচ্ছতশ্চ বিশেষতঃ।

প্রোক্তং শ্রদ্ধাবিহীনস্য অরণ্যরুদিতোপমম্॥১/৩৯৭

অর্থাৎ, সশ্রদ্ধ, বিশেষ করে জিজ্ঞাসু যে, উপদেশ তাকেই দেওয়া উচিত। যার শ্রদ্ধাবোধ নেই তাকে বলতে যাওয়া অরণ্যে রোদন।

রাজধর্মে সমদর্শী

পঞ্চতন্ত্রকার মিত্রভেদ তন্ত্রের উপসংহারে রাজাকে সমদর্শী হতে বলেছেন। কেননা রাজাকে কঠিনে-নরমে সংমিশ্রিত একজন প্রশাসক হতে হয়। রাজা যদি শুধু উদার-দয়াল-কৃপাময় হন তাহলে তাঁর পক্ষে রাজ্য পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এতে

রাজ্যের শান্তি, সংহতি বিনষ্ট হয়। তবে যে রাজা এমন, তাঁকে ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। যেমন –

রাজা ঘৃণী ব্রাহ্মণঃ সর্বভক্ষী স্ত্রী চাবশা দুষ্টমতিঃ সহায়ঃ।
প্রেষ্যঃ প্রতীপেঽধিকৃতঃ প্রমাদী ত্যাজ্যা অমী যশ্চ কৃতং ন বেত্তি॥ ১/৪২৯

অর্থাৎ, কৃপাময় রাজা, স্বাধীন ভার্যা, কিঙ্কর উল্টো চলেন, দায়িত্বশীল পদে আছে তবু অসাবধান, দুষ্টবুদ্ধি সহায়ক আর সর্বভূক্ ব্রাহ্মণ এবং অকৃতজ্ঞ – এদেরকে ত্যাগ করা উচিত।

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

মিত্রভেদে পিঙ্গলক নামে রাজার মন্ত্রী ছিলেন দমনক। তার ভাই করটকের সাথে কথোপকথনে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। দমনক চাকরী হারিয়ে বেকার। তাই সে চাকরী পাওয়ার জন্য রাজার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়। দূর থেকে রাজার কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে এবং ভাবে যদি কোনো কাজ করে রাজাকে খুশি করে হারানো চাকরী ফিরে পাওয়া যায়। করটক এতে রাজি নয় কেননা যার যেটি কাজ না সেটি করতে গেলে বিপদ হতে পারে।[৯] কিন্তু দমনক ভাইকে বোঝালো বুদ্ধি থাকলে রাজার সংস্পর্শে থাকা যায়। ঘরে বসে শুধু একা-একা বাঁচলেই হয় না। জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি সহকারে উচ্চ গুণ সম্পন্ন হয়ে বাঁচার মতো বাঁচাই তো জীবন। সন্তান হয়ে জন্ম গ্রহণ করে যদি পিতা-মাতার মুখ উজ্জ্বল করতে না পারে তাহলে তাতে কোনো দাম নেই। তাইতো পঞ্চতন্ত্রকার দমনকের উক্তিতে নিম্নোক্তভাবে রাজনৈতিক প্রজ্ঞাপ্রসূত মন্তব্য করেছেন। যেমন –

সুহৃদামুপকারকারণাদ্ দ্বিষতামপ্যপকারকারণাৎ।
নৃপসংশ্রয় ইষ্যতে বুধৈর্জঠরং কো ন বিভর্তি কেবলম্॥
যস্মিঞ্জীবতি জীবন্তি বহবঃ সোঽত্র জীবতি।
বযাংসি কিং ন কুর্বন্তি চঞ্চা স্বোদরপূরণম্॥
যজ্জীব্যতে ক্ষণমপি প্রথিতং মনুষ্যৈ-

র্বিজ্ঞানশৌর্যবিভবাযগুণৈঃ সমেতম্ ।
তন্নাম জীবিতমিহ প্রবদন্তি তজজ্ঞাঃ
কাকোঽপি জীবতি চিরং ন বলিং চ ভুঙ্‌ক্তে॥
সুপূরা স্যাৎ কুনদিকা সুপুরো মুষিকাঞ্জলিঃ
সুসন্তুষ্টঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনাপি তুষ্যতি ॥
কিং তেন জাতু জাতেন মাতুর্যৌবিনহারিণা ।
আরোহতি ন যঃ স্বস্য বংশস্যাগ্রে ধ্বজো যথা ॥ ১/২২-২৬
পরিবর্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে ।
জাতস্তু গণ্যতে সোঽত্র যঃ স্ফুরত্যম্বয়াধিকম্ ॥
জাতস্য নদীতীরে তস্যাপি তৃণস্য জন্মসাফল্যম্ ।
যৎ সলিলমজ্জনাকুলজনহস্তালম্বনং ভবতি ॥
স্তিমিতোন্নতসঞ্চারা জনসন্তাপহারিণঃ ।
জায়ন্তে বিরলা লোকে জলদা ইব সজ্জনাঃ॥
নিরতিশয়ং গরিমাণং তেন জনন্যাঃ স্মরন্তি বিদ্বাংসঃ ।
যৎ কর্মপি বহতি গর্ভং মহতামপি যো গুরুর্ভবতি॥
অপ্রকটীকৃতশক্তিঃ শক্তোঽপি জনস্তিরস্ক্রিয়াং লভতে ।
নিবসন্নন্তর্দারুণি লঙ্ঘ্যো বহির্ন তু জ্বলিতঃ॥১/২২-৩১

অর্থাৎ, বুদ্ধিমান লোক রাজার আশ্রয় চায়। বন্ধুর উপকার আর শত্রুর অপকার করতে না পারলে নিজের পেটটুকু কে না ভরাতে পারে। যে বাঁচলে অনেকে বাঁচে তাঁর বাঁচাই সার্থক নইলে একা বাঁচায় সার্থকতা নেই। জ্ঞানীরা বলেন, জ্ঞান, শৌর্য, বৈভব ইত্যাদি ভদ্রলোকের উপযুক্ত গুণসম্পন্ন হয়ে লোকসমাজে প্রশংসিত হয়ে বাঁচা, তার নামই জীবন। নইলে পশু-পাখিরাও বাঁচে বরাদ্দ বলি খেয়ে অর্থাৎ গৃহস্থের ছড়িয়ে দেওয়া খাবার খেয়ে । যেমন, ছোট নদী সহজে ভরে যায়, মুষিকের অঞ্জলি-অল্পেই। কাপুরুষ সামান্য পেলেই খুশি থাকে। যদি পতাকার মতো বংশাগ্রে আরোহণ না করে, মায়ের যৌবন হরণ করতে জন্ম নিয়ে লাভ কি? জগৎ সংসারে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর ঘূর্ণিপাকে থাকে। তবে কুলের মুখ উজ্জ্বল করতে যে পারে তার জন্মই সার্থক । জন্ম সফল তারও, যে-ঘাস গজায় নদীর ধারে। ডুবন্ত লোক ব্যাকুল হয়ে আঁকড়ে ধরে। যাঁদের চাল-চলন ধীর এবং

উন্নত, মানুষের দুঃখ যাঁরা হরণ করেন, সংসারে এমন সজ্জন খুব কমই জন্মান। বিদ্বানেরা বলেন, তাঁর গর্ভধারিণী জননীর মহিমাকে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারে না। জগৎ-সংসারে চেষ্টা না করলে কেবলই হতোদ্যম হতে হবে। কাঠে ঘুমন্ত আগুন সকলে ডিঙোতে পারে। কিন্তু জ্বলন্ত আগুন কয়জন ডিঙোতে পারে?

দমনকের কথা শুনে প্রত্যুত্তরে করটক যা বলল তাতেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। যেমন –

অপৃষ্টৈস্ত্রাপ্রধানো যো ব্রূতে রাজ্ঞঃ পুরঃ কুধীঃ।
ন কেবলমসম্মানং লভতে চ তিরস্ক্রিয়াম্॥
বচস্তত্র প্রযোক্তব্যং যত্রোক্তং লভতে ফলম্।
স্থায়ী ভবতি চাত্যন্তং রাগঃ শুক্লপটে যথা॥১/৩২-৩৩

অর্থাৎ, রাজা যে আমাদের কথা শুনবে এমন উচ্চ পর্যায়ের আমরা কেউ না। রাজা কিছু জিজ্ঞেসও করেননি, তাই রাজার সামনে বলতে যাওয়াটাও বোকামি। শুধু শুধু ভাগ্যে জোটে অপমান, আর অবজ্ঞা। কথা সেখানেই বলা উচিত, যেখানে বলে লাভ হয়। যেমন, সাদা কাপড়ে রঙের মতো অনেক দিন টিঁকে থাকে।

পরবর্তীতে করটকের উক্তিতে বলা হয়েছে রাজবাড়িতে শুধুমাত্র রাজার সাথে ভালো ব্যবহার করলেই হয় না। রাজার আসে-পাশে যেসব ব্যক্তিরা থাকে তাদের সাথেও ভালো ব্যবহার করতে হয়। এটি রাজনৈতিক প্রজ্ঞাপ্রসূত বিষয়। যেমন –

রাজমাতরি দেব্যাং চ কুমারে মুখ্যমন্ত্রিণি।
পুরোহিতে প্রতীহারে সদা বর্তেত রাজবৎ॥১/৫২

অর্থাৎ, রাজমাতা, রাজমহিষী, রাজপুত্র, প্রধানমন্ত্রী, পুরোহিত এবং দারোয়ান এদের সঙ্গে সবসময় রাজার মতোই ব্যবহার করতে হয়।

করটক আবার দমনককে বোঝাতে চেষ্টা করল রাজার মন জয় করা খুবই কঠিন বিষয়। কেননা, প্রবাদে আছে যে, রাজার সামনে হাঁটলেও দোষ পিছে হাঁটলেও দোষ। কিন্তু দমনক বিভিন্নভাবে যুক্তিপূর্ণ কথা বলায় করটক যা বলল তাতে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। মূলত পঞ্চতন্ত্রকার বোঝাতে চেয়েছেন যে, রাজা অত্যন্ত বড় মাপের ব্যক্তি। তাকে সম্মান জানাতে হবে। রাজা উদার, মহান, সমুদ্রের মতো বিশাল। তাঁর সামনে কোনো মিথ্যা বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে রাজাকে দেবতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। যেমন –

অপি স্বল্পমসত্যং যঃ পুরো বদতি ভূভুজাম্।
দেবানাং চ বিনশ্যেত স দ্রুতং সুমহানপি॥
সর্বদেবময়ো রাজা মনুনা সম্প্রকীর্তিতঃ।
তস্মাত্তং দেববৎ পশ্যেন্ন ব্যলীকেন কর্হিচিৎ॥
সর্বদেবময়স্যাপি বিশেষো নৃপতেরয়ম্।
শুভাশুভফলং সদ্যো নৃপাদেবাদ্ভবান্তরে॥
তৃণানি নোন্মূলয়তি প্রভঞ্জনো মৃদুনি নীচৈঃ প্রণতানি সর্বতঃ।
স্বভাব এবোন্নতচেতসাময়ং মহান্ মহৎস্বেব করোতি বিক্রমম্॥
গণ্ডস্থলেষু মদবারিষু বদ্ধরাগ-
মণ্ডভ্রমদ্ভ্রমরপাদতলাহতেঽপি।
কোপং ন গচ্ছতি নিতান্তবলোঽপি নাগ-
স্তুল্যে বলে তু বলবান্ পরিকোপমেতি॥১/১২০-১২৪
পর্যন্তো লভ্যতে ভূমেঃ সমুদ্রস্য গিরেরপি।
ন কথঞ্চিন্নৃহীপস্য চিত্তান্তঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ॥১/১২৬
অমৃতং শিশিরে বহ্নিরমৃতং প্রিয়দর্শনম্।
অমৃতং রাজসম্মানমৃতং ক্ষীরভোজনম্॥১/১২৯
আখেটকস্য ধর্মেণ বিভবাঃ স্যুর্বশে নৃণাম্।
নৃপ্রজাঃ প্রেরয়ত্যেকো হন্ত্যন্যোঽত্র মৃগানিব ॥
যো ন পূজয়তে গর্বাদুত্তমাধমমধ্যমান্।
নৃপাসন্নান্ স মান্যেঽপি ভ্রশ্যতে দন্তিলো যথা॥১/১৩০-১৩১

অর্থাৎ, মস্ত বড়ো দেবতা হও আর যাই হও, রাজার সামনে এতটুকু মিথ্যা বলেছ কি গেছ। মনু বলেছেন রাজা হচ্ছেন সর্বদেবময়। সুতরাং তাঁকে দেবতার মতো দেখবে, তাঁর সঙ্গে চালাকি নয়, ভালো ব্যবহার করতে হয়। তবে রাজা সর্বদেবময় হলেও দেবতার সঙ্গে তাঁর তফাৎ হলো – ভালো-মন্দ ফল দেবতা দেন জন্মান্তরে, আর রাজা দেন হাতে-হাতে। একেবারে মাটিতে নুয়ে পড়া নরম ঘাসকে ঝড় কখনও উপড়োয় না। যাঁদের মনটা উঁচু তাঁদের এমনই উদার স্বভাব যে তাঁরা শুধু বড়োদের উপরেই জোর দেন। হাতি, এত যার গায়ের জোর, সে কি রাগ করে তার গালের মদজলের নেশায় উড়ে উড়ে বসা ভোমরাদের পদাঘাত করে? বলবানের রাগ হয় সমানে-সমানে। পৃথিবীর সীমা আছে। পাহাড়ের, সমুদ্রেরও পার পাওয়া যায়। কিন্তু রাজার মনের আদি অন্ত সেকবে কে কোথায় পেয়েছে। সুন্দর চেহারা দেখতে অমৃত লাগে আর অমৃতের স্বাদ দুগ্ধপানে। শীতে যেমন আগুন অমৃত তেমনি রাজসম্মান। মৃগয়ার নিয়মে চললে মানুষের বিত্ত বৈভব আয়ত্তে আসে । একজন প্রজাদের তাড়া দেবে, আর একজন মারবে-ঠিক পশুর মতো। এটা হয় না। রাজার কাছাকাছি যারা থাকে কেউ বড়ো, কেউ মাঝারি, কেউ ছোট, তাদের আত্মাভিমানবশে যে সম্মান করে না, সে প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও অধিকার হারায়।

মিত্রভেদে 'দন্তিল ও গোরম্ভ' গল্পে (১/৩) রাজনৈতিক নানা ঘটনা বিবৃত হয়েছে। যে ঘটনা থেকে প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন –

বর্ধমান রাজ্যে দন্তিল নামে এক ব্যবসায়ী রাজগৃহের যাবতীয় মালামাল সরবারাহ করত। সে নানান পণ্যের কারবারী হওয়ায় ব্যবসায়ী হিসেবে সমস্ত রাজ্যে বিখ্যাত ছিল। সে রাজার কাজও করত অপরদিকে নগরের কাজও করত। ফলে সে রাজা এবং নগরের সমস্ত জনগণ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। এক কথায় এরকম চতুর লোক পাওয়া বড়ই মুশকিল। তার বিয়ে উপলক্ষে বাড়িতে রাজা-রানি রাজকর্মচারীসহ আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত হয়েছে। রাজবাড়ির ঝাড়ুদার গোরম্ভও এসেছে। কিন্তু সে গিয়ে এমন জায়গায় বসল যেখানে তার বসার কথা নয়। দন্তিল ধৈর্য হারা হয়ে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি

থেকে বের করে দিল। গোরম্ভ তখন প্রতিশোধের নেশায় সুযোগ খুঁজতে লাগল কিভাবে দন্তিলের সর্বনাশ করা যায়। তাই একদিন ভোর বেলা রাজার অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় পালঙ্কের পাশে গোরম্ভ ঝাড়ু দিচ্ছে। হঠাৎ তখন বলে উঠল – 'ইস্ দন্তিলের কী আস্পর্দা, রানিকে আলিঙ্গন করে!' রাজা ধড়মড় করে উঠে বললেন – কি বললি গোরম্ভ? সত্যি না কী? সে জবাব দিল মহারাজ সারারাত জেগে জুয়া খেলেছি, ঘুমের ঝোঁকে কি বলতে কি বলেছি মনে নেই। এই বলে তাড়াতাড়ি রাজগৃহ ত্যাগ করল। কথাটা রাজার মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল কেননা, উভয়েরই অন্তঃপুরে অবাধ যাতায়াত, না দেখলে বলবে কেন? স্ত্রী চরিত্র বোঝা মুশকিল। এমনি ভাবতে ভাবতে রাজার ঘুম হারাম হলো। তাই তিনি দন্তিলের উপর ক্ষেপে রাজবাড়িতে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন। তাতে দন্তিলের তো মাথায় হাত। এতো দিন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করছেন তবে কেন রাজা তাকে এমন শাস্তি দিলেন। পরিশেষে একদিন সাহস নিয়ে এর কারণ জানার জন্য সে রাজবাড়িতে গেল। কিন্তু দারোয়ান বাঁধা দিল। নিকটে দাঁড়িয়ে ছিল গোরম্ভ, দেখে মুচকি হেসে বলল – করছ কী? একে অপমান করলে, গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিবে। দন্তিল তখন বুঝতে পারল এটি তাহলে গোরম্ভের কাজ। দন্তিল তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল – আমার ভুল হয়েছে। রাতে আমার বাড়িতে এসো। তোমার নিমন্ত্রণ। গোরম্ভ দন্তিলের বাড়িতে এলে উত্তম উপচারে তাকে খাবার দিয়ে সাথে এক জোড়া নব বস্ত্র উপহার দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করল। তখন গোরম্ভ বলল – এবার দেখবেন আমার বুদ্ধির জোরে রাজা অবশ্যই আপনার উপর খুশি হবেন। পরের দিন গোরম্ভ রাজবাড়িতে ভোর বেলায় রাজার পালঙ্কের পাশে ঝাড়ু দেবার সময় বলে উঠল – 'রাজার কি আক্কেল! পায়খানায় বসে শশা খায়।' রাজা শুনে বলল – 'কিরে গোরম্ভ কি আবোল-তাবোল বলছিস্। চাকর বিধায় রাজদণ্ড থেকে বেঁচে গেলি।' গোরম্ভ তখন রাজার পায়ে পড়ে বলল – 'মহারাজ ক্ষমা করুন, জুয়ার নেশায় রাত জেগেছি। ঘুমের ঝোকে কি বলতে কি বলেছি।' রাজা তখন ভাবলেন, এ হেন হারামজাদার কথায় বিশ্বাস করে দন্তিলের চাকরি কেড়ে নিয়ে কি ভুলটাই না করেছি। এর প্রতিকার করা উচিত। সাথে সাথে লোক পাঠিয়ে রাজা দন্তিলকে পূর্বের পদে বহাল করলেন।

এই গল্প থেকে শিক্ষা হলো, রাজাদের শোনা কথায় কান দিতে নাই। অপরদিকে নিজে উচ্চ মাপের ব্যক্তি হলেও রাজার কাছের লোককে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। বিষ্ণুশর্মা একথা পূর্বেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলেছেন।

এরপর বিষ্ণুশর্মা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কতগুলো বাস্তব বিষয়ের অবতারণা করেছেন। রাজকর্মচারীরা যেমন রাজা ও রাজ্যের থেকে অনেক সুবিধা পেতে চায় তেমনি জনগণও কিছু চায়। রাজা তাঁর অবস্থান থেকে এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্য করায়ত্ত করতে প্রস্তুত। মূলত যে যার স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যস্ত। এমনি রাজনৈতিক প্রজ্ঞাপ্রসূত বাস্তব বিষয়গুলো নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত হয়েছে –

নরপতিহিতকর্তা দ্বেষ্যতাং যাতি লোকে
জনপদহিতকর্তা ত্যজ্যতে পার্থিবেন্দ্রৈঃ।
ইতি মহতি বিরোধে বর্তমানে সমানে
নৃপতিজনপদানাং দুর্লভঃ কার্যকর্তা॥১/১৩২
কেঽর্থান্ প্রাপ্য ন গর্বিতো বিষয়িনঃ কস্যাপদেঽস্তং গতাঃ
স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো নাম রাজ্ঞং প্রিয়ঃ।
কঃ কালস্য ন গোচরান্তর্গতঃ কেঽর্থী গতো গৌরবং
কো বা দুর্জনবাগুরাসু পতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্ ॥১/১৪৭
দেশানামুপরি ক্ষ্মাপা আতুরাণাং চিকিৎসকাঃ ।
বণিজো গ্রাহকাণাং চ মূর্খাণামপি পণ্ডিতাঃ ॥
প্রমাদিনাং তথা চৌরা ভিক্ষুকা গৃহমেধিনাম্ ।
গণিকা কামুকানাং চ সর্বলোকস্য শিল্পিনঃ ॥
সামাদিসজ্জিতৈঃ পাশৈঃ প্রতীক্ষন্তে দিবানিশম্।
উপজীবন্তি শক্ত্যা হি জলজা জলজানিব ॥ ১/১৫৬-১৫৮

অর্থাৎ, রাজার যে মঙ্গল করে, কল্যাণ করে লোকে তাকে বিষনজরে দেখে। আবার দেশের যে মঙ্গল করে, রাজা তাকে ত্যাগ করেন। এই উভয়সংকটের ফলে তেমন লোক মেলা ভার যে একই সঙ্গে রাজার এবং দেশের কাজ করবে। টাকা পেলে কে না গর্বিত

হয়? এমন কে বিষয়ী আছে যার সব ঝঞ্ঝাট চুকে-বুকে গেছে? কে আছে দুনিয়ায়, মেয়েরা যার মন ভেঙে দেয়নি? রাজার প্রিয়পাত্র কে শুনি? কালের কবলে পড়েনি কে? চেয়ে কার মান বেড়েছে? আর, কে-ই বা দুষ্টলোকের জালে পড়ে ভালোয় ভলোয় ছাড়া পেয়েছে? ওঁৎ পেতে আছে দিনরাত, রাজারা ব্যস্ত নিয়ে সাম-দাম ইত্যাদিসহ রাজ্য ধরতে এবং চিকিৎসকেরা-রোগী ধরতে, বণিকে-ক্রেতা, পণ্ডিতে- বোকাকে, অসাবধানকে-চোর, গণিকা-কামুককে, ভিখিরি-ধনীকে, সকলকে-কারিগর ধরতে ব্যস্ত। যার যেমন ক্ষমতা তেমন এ ওকে খেয়ে বাঁচছে মাৎস্যন্যায়ের মতো।

পরবর্তীতে দমনক ও পিঙ্গলকের কথোপকথনে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজার আশ্রয় সকলেই চায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় কম বুদ্ধিরাই রাজাকে ঘিরে থাকে। তবে কুলীন অকুলীন সকলেই রাজার সান্নিধ্যে থেকে সৌভাগ্যবান হতে পারে। এমনি নানা রাজনৈতিক তত্ত্ব নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত হয়েছে –

ন সোঽস্তি পুরুষো রাজ্ঞাং যো ন কাময়তে শ্রিয়ম্।
অশক্তা এব সর্বত্র নরেন্দ্রং পর্যুপাসতে॥১/২৪৪
যস্মিন্নেবাধিকং চক্ষুরারোপয়তি পার্থিবঃ।
অকুলীনঃ কুলীনো বা স শ্রিয়ো ভাজনং নরঃ॥১/২৪৬
উক্তো ভবতি যঃ পূর্বং গুণবানিতি সংসদি ।
তস্য দোষো ন বক্তব্যং প্রতিজ্ঞাভঙ্গভীরুণা॥১/২৫১

অর্থাৎ, এমন পুরুষ নেই, যে রাজলক্ষ্মীকে চায় না। যারা অপারগ, তারাই সচরাচর রাজাকে ঘিরে থাকে। যার উপর রাজার নজর বেশি পড়ে, সে কুলীনই হোক আর অকুলীনই হোক সৌভাগ্যবান হয়। অপরদিকে কাউকে রাজসভায় গুণবান বলে ঘোষণা করে, পরে তাকে আসামী প্রতিপন্ন করলে, নিজেরই কথার খেলাপ করা হয়, এমন কখনও করতে নেই।

এরপর দমনক ও সঞ্জীবকের কথোপকথনে বোঝা যায় যে, রাজাদের ভালো গুণের পাশাপাশি খারাপ গুণও থাকে এবং সেগুলো মূলত স্বভাবজাত। নিম্নোক্তভাবে পঞ্চতন্ত্রকার তা ব্যক্ত করেছেন –

দুর্জনগম্যা নার্যঃ প্রায়েণাস্নেহবান্ ভবতি রাজা।
কৃপণানুসারি চ ধনং মেঘো গিরিদুর্গবর্ষী চ॥
অহং হি সম্মতো রাজ্ঞো য এবং মন্যতে কুধীঃ।
বলীবর্দঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষাণপরিবর্জিতঃ॥১/২৮১-২৮২
নিমিত্তমুদ্দিশ্য হি যঃ প্রকুপ্যতি ধ্রুবং স তস্যাপগমে প্রশাম্যতি।
অকারণদ্বেষপরো হি যো ভবেৎ কথং নরেঽসৌ পরিতোষমেষ্যতি॥১/২৮৬

অর্থাৎ, জগতে দেখা যায় যে, দুষ্টের হাত ধরে সুন্দরী নারীরা ঘোরে-ফেরে, কৃপণের কাছে টাকাকড়ি থাকে যেমন গিড়ি-দুর্গমে মেঘ বর্ষণ করে তেমনি রাজার স্নেহ-ভালোবাসা থাকে না। যে মনে করে রাজা তাকে ভালোবাসেন, এই কথা যে ভাবে সে আস্ত গাড়ল, সে আস্ত বলীবর্দ, তার শুধু নেই ঐ শৃঙ্গযুগল। যার রাগের কোনো কারণ থাকে, সেই কারণটি চলে গেলেই সে শান্তি হয়। কিন্তু যে অকারণে কাউকে দোষারোপ করে, সে-মানুষ কিসে শান্ত হবে?

মন্ত্রী দমনক ও রাজার মিত্র সঞ্জীবকের কথোপকথনের মধ্যে টিট্টিভের উদ্দীপনামূলক উক্তিতে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। এখানে বলা হয়েছে শক্তিমান, তেজীয়ান হলে আকারে ছোট ও জাতে কিছু আসে যায় না। যেমন –

পুংসামসমর্থানামুপদ্রবায়াত্মনো ভবেৎ কোপঃ।
পিঠরং জ্বলদতিমাত্রং নিজপার্শ্বানেব দহতিতরাম্॥১/৩২৭
বিশেষাৎ পরিপর্ণস্য যাতি শত্রোরমর্ষণঃ।
আভিমুখ্যং শশাঙ্কস্য যথাদ্যাপি বিধুন্তুদঃ॥১/৩২৯
প্রমাণাদধিকস্যাপি গণ্ডশ্যামমদচ্যুতেঃ।
পদং মূর্ধ্নিসমাধত্তে কেসরী মত্তদন্তিনঃ ॥
বালস্যাপি রবেঃ পাদাঃ পতন্ত্যুপরি ভূভৃতাম্।

তেজসা সহ জাতানাং বয়ঃ কুত্রোপযুজ্যতে ॥১/৩২৯-৩৩১

অর্থাৎ, যে-পুরুষের শক্তি-সামর্থ্য নেই, তার নিজের রাগে নিজেরই ক্ষতি হয়। যেমন মাটির তাওয়া যতই গড়ম হয় ততই পুড়তে থাকে। বিশেষত পরিপূর্ণ শত্রুকেই তেজীয়ান্ আক্রমণ করে, যেমন পূর্ণচাঁদের দিকে রাহু ধাবমান হয়। অপরদিকে হাতি আকারে বিশাল হলেও মত্ত সেই সিংহ তাঁর মাথায় ছোবল মারে। শিশু-সূর্যের কিরণে পা পড়ে রাজা-পাহাড়ের গায়ে সমানভাবে। তেমনি তেজ নিয়ে যে জন্মেছে তাদের বয়স কোনো বিষয় নয়।

মিত্রভেদে সঞ্জীবকের উক্তিতে পঞ্চতন্ত্রকার রাজা এবং রাজবাড়িকে ভয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেননা রাজবাড়িতে সামান্য কোনো ত্রুটি কিংবা মিথ্যা অপবাদে জীবন বিপন্ন হয়। সেই সাথে এখানে বিপদের শেষ থাকেনা। যেমন –

অন্তর্লীভুজঙ্গমং গৃহমিব ব্যালাকুলং বা বনং
গ্রহাকীর্ণমিবাভিরামকমলচ্ছায়াসনাথং সরঃ।
নানাদুষ্টজনৈরসত্যবচনাসক্তৈরনার্যৈর্বৃতং
দুঃখেন প্রতিগম্যতে প্রচকিতৈ রাজ্ঞাং গৃহং বার্ধিবৎ॥১/৩৭৯

অর্থাৎ, রাজবাড়িতে মিথ্যাচারী এবং অভদ্র-দুষ্টু লোকে ভর্তি থাকে। ভালো মানুষ সেখানে ভয়ে ভয়েই থাকেন। যেন একটা বিপদ সংকুল সমুদ্র। এমন একটা বাড়ি, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে সাপ আর সাপ। এমন একটা বন, যেখানে হিংস্র জন্তুতে ভর্তি। অপরূপ পদ্ম শোভায় ভরা কিন্তু কিলবিল করছে কুমির।

সামের প্রয়োগ

মিত্রভেদে দেখা যায়, দমনকের কুমন্ত্রণায় পিঙ্গলক ও সঞ্জীবকের মধ্যে যখন যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল তখন করটক দমনককে বলল, যুদ্ধ না বাঁধিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পথ দেখ। সে অর্থশাস্ত্রের চারটি নীতির মধ্যে (সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ) প্রথমটি প্রয়োগের পরামর্শ দিল। কেননা রাজনৈতিক এই নীতিগুলোর মধ্যে সাম হলো আলাপ-

আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পন্থা। তাই রাজনীতিতে সম্ভব হলে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যাওয়ার আগে সাম প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থাৎ মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে বিষ্ণুশর্মা পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন –

সামাদিদণ্ডপর্যন্তো নয়ঃ প্রোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা।
তেষাং দণ্ডস্তু পাপীয়াংস্তং পশ্চাদ্বিনিযোজয়েৎ॥
সাম্নৈব যত্র সিদ্ধির্ন তত্র দণ্ডো বুধেন বিনিযোজ্যঃ।
পিত্তং যদি শর্করয়া শাম্যতি কোঽর্থঃ পটোলেন॥
আদৌ সামপ্রয়োক্তব্যং পুরুষেণ বিজানতা।
সামসাধ্যানি কার্যাণি বিক্রিয়াং যান্তি ন ক্বচিৎ॥
ন চন্দ্রেণ ন চৌষধ্যা ন সূর্যেণ ন বহ্নিনা।
সাম্নৈব বিলয়ং যাতি বিদ্বেষিপ্রভবং তমঃ॥১/৩৮১-৩৮৪

অর্থাৎ, রাজনীতির আদিতে সাম, আর অন্তে দণ্ড। অথবা, রাজনীতি হচ্ছে সাম থেকে শুরু করে দণ্ড পর্যন্ত। তার মধ্যে দণ্ড হচ্ছে সবচেয়ে দোষের। সেটির প্রয়োগ করবে সবার শেষে। সামেই যেখানে কার্যসিদ্ধি হয়, সেখানে দণ্ডের প্রয়োজন নেই। যেমন – শর্করাতেই পিত্ত রোগের উপশম হলে পটলে সারায় কে? আদর্শ রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ আদিতে সাম প্রয়োগ করবে। সামের মাধ্যমে যদি কার্য সিদ্ধি হয়, তাতে কখনো কুফল হয় না। ওষধি দিয়ে না, আগ্নি দিয়ে না, চন্দ্র-সূর্য দিয়েও না। শত্রু থেকে যে বাধা-বিপত্তি আসে তা সাম প্রয়োগেই ধ্বংস করা সম্ভব।

রাজনীতিতে ষড় গুণ ও তার প্রয়োগ

পঞ্চতন্ত্রকার কাকোলূকীয় তন্ত্রে রাজনীতির ছয়টি করণীয় বিষয়ের কথা বলেছেন। যথা – সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় এবং দ্বৈধীভাব। রাজাকে নিরাপদে থাকার জন্য, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য অথবা শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য এগুলোর প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে *পঞ্চতন্ত্রে* এর প্রয়োগের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা প্রয়োজন। কাকরাজ মেঘবর্ণের রাজ্যে চরম

অরাজকতা। তার সাথে পেঁচারাজের পূর্ব শত্রুতার কারণে রোজ রাতে কাকরাজের দুর্গ আক্রমণ করে সামনে যাকে পায় তাকেই মারে। পেঁচারাজের তো সুবিধা। সে রাতে চোখে দেখে আর কাকরাজ তো রাতে চোখে দেখে না। তাই রোজ রাতে মারতে মারতে দুর্গের চার-পাশটা কাকশূন্য হয়ে যায়। এই অবস্থায় কাকরাজ ভাবছেন কিভাবে পেঁচারাজকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যায়। এই দুই রাজার সাথে রাজনৈতিক নানা কলহকে কেন্দ্র করে বিষ্ণুশর্মা রাজনীতিতে ষড় গুণ ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

রাজা মেঘবর্ণ উজ্জীবী, সঞ্জীবী, অনুজীবী, প্রজীবী, চিরঞ্জীবী ও স্থিরজীবী এই ছয় মন্ত্রীকে ডেকে বলল –

> মন্ত্রীগণ, আমাদের তো ভীষণ বিপদ। পেঁচারাজ আমাদের শেষ করে ফেলল। এভাবে চলতে থাকলে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাব। একে তো পেঁচারা বিশালদেহী অপরদিকে সাহসী ও কৌশলী। তার ওপর তারা রাতে আসে। আমরা তো রাতে চোখে দেখি না, আর দিনের বেলা জানিই না পেঁচারাজের দুর্গ কোথায়। সুতরাং এর প্রতিবিধান কী? এ অবস্থায় রাজনীতিতে ছয়টি করণীয় – সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় এবং দ্বৈধীভাব – এর মধ্যে কোনটি বেছে নেওয়া উচিত?[১০]

মন্ত্রীরা বলল, আপনি যখন প্রশ্ন করেছেন তখন আমাদের তো অবশ্যই কিছু বলতে হবে। কেননা যা হিতকর তা প্রিয় হোক অপ্রিয় হোক সেটি আমরা বলব। সদুপদেশ কিন্তু হিতকর তেতো ওষুধের মতো অপ্রিয় হতে পারে। কারণ, যে মন্ত্রীরা কেবল অহিতকর প্রিয় কথা বলে, তাদের মতো শত্রু আর কেউ নেই। মন্ত্রীদের কাথার আশ্বাসে মেঘবর্ণ বলল, তাহলে চলুন অতি নিভৃতে মন্ত্রণা করি।

সন্ধি

সবার প্রথমে মন্ত্রী উজ্জীবী সন্ধি সম্পর্কে বলল। রাজধর্মে সন্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সন্ধি শব্দের অর্থ হলো ভাব। দুটি পক্ষের মধ্যে যখন যুদ্ধ অত্যাসন্ন, এমতাবস্থায় ঐক্য বা শান্তি স্থাপন করাকেই সন্ধি বলে। *পঞ্চতন্ত্রে* বেশ কয়েকটি স্থানে যুদ্ধকে 'না' বলে সন্ধি

করতে বলা হয়েছে। বলবানের সাথে যুদ্ধ করে লাভ হয় না। যেহেতু শত্রুপক্ষ বলবান এবং নিশানা বুঝে মারে, অতএব তাদের সঙ্গে সন্ধি করা উচিৎ । কেননা–

বলীয়সি প্রণমতাং কালে প্রহরতামপি।
সম্পদো নাপগচ্ছন্তি প্রতীপমিব নিম্নগাঃ॥
সত্যাঢ্যো ধার্মিকশ্চার্যো ভ্রাতৃসঙ্ঘাতবান্ বলী।
অনেকবিজয়ী চৈব সন্ধেয়ঃ স রিপুর্ভবেৎ॥
সন্ধিঃ কার্যোঽপ্যনার্যেন বিজ্ঞায় প্রাণসংশয়ম্।
প্রাণৈঃ সংরক্ষিতৈঃ সর্বং যতো ভবতি রক্ষিতম্॥
অনেকযুদ্ধবিজয়ী সন্ধানং যস্য গচ্ছতি ।
তৎপ্রভাবেন তস্যাশু বশং গচ্ছন্ত্যরাতয়ঃ॥
সন্ধিমিচ্ছেৎ সমেনাপি সন্দিগ্ধো বিজয়ো যুধি ।
ন হি সাংশয়িকং কুর্যাদিত্যুবাচ বৃহস্পতিঃ॥
সন্দিগ্ধো বিজয়ো যুদ্ধে জনানামিহ যুধ্যতাম্ ।
উপায়ত্রিতয়াদূর্ধ্বং তস্মাদ্ যুদ্ধং সমাচরেৎ ॥
অসন্দধানো মানান্ধঃ সমেনাপি হতো ভৃশম্।
আমকুম্ভ ইবান্যেন করোত্যুভয়সংক্ষয়ম্॥
সমং শক্তিমতা যুদ্ধমশক্তস্য হি মৃত্যবে ।
দৃষৎকুম্ভং যথা ভিত্ত্বা তাবৎ তিষ্ঠতি শক্তিমান্॥
ভূমির্মিত্রং হিরণ্যং চ বিগ্রহস্য ফলত্রয়ম্।
নাস্ত্যেকমপি যদ্যেষাং বিগ্রহং ন সমাচরেৎ॥
খনন্নাখুবিলং সিংহঃ পাষাণশকলাকুলম্ ।
প্রাপ্নোতি নখভঙ্গং বা ফলং বা মূষকো ভবেৎ॥
তস্মান্ন স্যাৎ ফলং যত্র পুষ্টং যুদ্ধং তু কেবলম্।
ন হি তৎ স্বয়মুৎপাদ্যং কর্তব্যং ন কথঞ্চন॥
বলীয়সা সমাক্রান্তো বৈতসীং বৃত্তিমাশ্রয়েৎ ।
বাঞ্ছন্নভ্রংশিনীং লক্ষ্মীং ন ভৌজঙ্গীং কদাচন॥
কুর্বন্ হি বৈতসীং বৃত্তিং প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্ ।
ভুজঙ্গবৃত্তিমাপন্নো বধমর্হতি কেবলম্॥

কৌর্মসঙ্কোচমাস্থায় প্রহারানপি মর্ষয়েৎ।
কালে কালে চ মতিমানুত্তিষ্ঠেৎ কৃষ্ণসর্পবৎ॥
আগতং বিগ্রহং দৃষ্ট্বা সুসান্ত্না প্রশমং নয়েৎ।
বিজয়স্য হ্যনিত্যত্বাদ্ রভসা ন সমুৎপতেৎ॥
বলিনা সহ যোদ্ধব্যমিতি নাস্তি নিদর্শনম্।
প্রতিবাতং ন হি ঘনঃ কদাচিদুপসর্পতি॥৩/৮-২৩

অর্থাৎ, যারা প্রথমে বলবানের কাছে নত হয়ে পরে সময় বুঝে আঘাত করে, তাদের সম্পদের ক্ষতি হয় না। যেমন নদী উজান বয় না। সত্যধনে ধনী, ধার্মিক, মহৎ-উদার-চরিত্রবান, অনেক ভাই সংঘবদ্ধ, প্রচণ্ডবল, মস্ত জোয়ান, অনেক যুদ্ধে জয়ী, তার সঙ্গে সন্ধি করা উচিত, যদিও সে শত্রু হয়। এমনকি অনার্যের অর্থাৎ যে মহৎ-উদার-চরিত্রবান নয়, তার সঙ্গেও সন্ধি করা উচিত, যদি প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা থাকে। কেননা প্রাণটি রক্ষা পেলে সবই রক্ষা পাবে। অনেক যুদ্ধে যে বিজয়ী, সে যার সঙ্গে সন্ধি করে তার প্রভাবে তার সমস্ত শত্রুরা বশে আসে। এমন কি, সমানে-সমানেও সন্ধি বাঞ্ছনীয়, কেননা যুদ্ধে বিজয় অনিশ্চিত। যুদ্ধে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয় বলেছেন বৃহস্পতি। যুদ্ধ যারা করেছে তাদের জন্যও যুদ্ধে বিজয় অনিশ্চিত। তাই বলছি যুদ্ধ কোরো না। গর্বে অন্ধ হয়ে যে সন্ধি করে না, সমান রিপুরও প্রবল আঘাতে এক কাঁচা কলসীর জোর ধাক্কায় আর এক কাঁচা কলসীর মতো সে নিজেও মরে, তাকেও মারে। শক্তিমানের সঙ্গে যুদ্ধে সর্বদা দুর্বলই মরে। শক্তিমান অনড় দাঁড়িয়ে থাকে, কলসী ভেঙে ফেলে পাথরের মতো। যুদ্ধের তিনটি ফল – জমি, বন্ধু, সোনা। একটিও যদি না পাওয়া যায় তবে যুদ্ধ করো না। টুকরো টুকরো পাথরে ভর্তি ইদুঁরের গর্ত খুঁড়তে খুড়ঁতে সিংহ কী পায়? শুধু নোখটি ভেঙে যায়। কিংবা বড়োজোর একটি ইঁদুর। যেখানে শুধু যুদ্ধই সার, কোনো লাভ নেই, সে-যুদ্ধ নিজে বাধিও না, এমনকি কখনও অংশগ্রহণও কোরো না। অচলা লক্ষ্মী যদি চাও তবে প্রবলের আক্রমণে নত হোয়ো বেতসের মতো। হোয়ো না সাপের মতো উদ্যত-উদ্ধত। বেতসের মতো অচরণে মহাধন পাওয়া যায়। আর যে করে ভুজঙ্গের মতো ব্যবহার করে, সে যেন নিজের মৃত্যুকেই ডেকে আনে। বুদ্ধিমান লোক কচ্ছপের মতো

গুটিয়ে থেকে পড়ে পড়ে মার খাবে। তারপর সময় হলে কালকেউটের মতো উঠে দাঁড়াবে। যুদ্ধ এসে পড়েছে দেখলে শান্ত করতে হয় সু-উপযুক্ত সামের প্রয়োগে। বেপরোয়া আক্রমণ করা ঠিক নয়, কেননা জয় হবে কি হবে না কে জানে? শাস্ত্রেও এমন বিধান নেই যে বলবানের সঙ্গে লড়তে হবে। যেমন মেঘ চলতে চলতে কখনো হাওয়ার উল্টো দিকে যায় না, তেমনি বলবানের সাথে যুদ্ধ করা উচিত নয় ।

এইভাবে উজ্জীবী সন্ধির পরামর্শ দিল, যেভাবে শান্তিময় পরিবেশে সমস্যার সমাধান সম্ভব।

বিগ্রহ

এরপর মন্ত্রী সঞ্জীবী বিগ্রহ সম্পর্কে বলল। রাজধর্মে বিগ্রহ অন্যতম বিষয়। বিগ্রহ শব্দের অর্থ হলো যুদ্ধ। কাকরাজ মেঘবর্ণকে মন্ত্রী সঞ্জীবী বোঝাল, শত্রু যেখানে রাগান্বিত সেখানে সন্ধির মতো সহজ পন্থায় কাজ হয় না। বরং বিগ্রহের মাধ্যমে শত্রুকে বশে আনতে হবে। যেমন –

শত্রুণা ন হি সন্দধ্যাৎ সুশ্লিষ্টেনাপি সন্ধিনা।
সুতপ্তমপি পানীয়ং শময়ত্যেব পাবকম্ ॥
সত্যধর্মবিহীনেন ন সন্দধ্যাৎ কথঞ্চন।
সুসন্ধিতেঽপ্যসাধুত্বাদচিরাদ্ যাতি বিক্রিয়াম্॥
ক্রূরো লুব্ধোঽলসোঽসত্যঃ প্রমাদী ভীরুরস্থিরঃ।
মূঢ়ো যোধোবমন্তা চ সুখোচ্ছেদ্যো ভবেদ্ রিপুঃ॥
চতুর্থোপায়সাধ্যে তু রিপৌ সান্ত্বমপক্রিয়া।
স্বেদ্যমামজ্বরং প্রাজ্ঞঃ কোঽম্ভসাা পরিষিঞ্চতি॥
সমাবাদাঃ সকোপস্য শত্রোঃ প্রত্যুত দীপকাঃ।
প্রতপ্তস্যেব সহসা সর্পিষস্তোয়বিন্দবঃ॥
প্রমণাভ্যধিকস্যাপি মহৎ সত্ত্বমধিষ্ঠিতঃ।
পদং মূর্দ্ধ্নি সমাধত্তে কেসরী মত্তদন্তিনঃ॥
উৎসাহশক্তিসম্পন্নো হন্যাচ্ছত্রুং লঘুর্গুরুম্।

যথা কণ্ঠীরবো নাগং ভারদ্বাজাঃ প্রচক্ষতে॥
মায়য়া শত্রবো বধ্যা অবধ্যাঃ স্যুর্বলেন যে।
যথা স্ত্রীরূপমাস্থায় হতো ভীমেন কীচকঃ॥৩/৩১
মৃত্যোরিবোগ্রদন্তস্য রাজ্ঞো যান্তি বশং দ্বিষঃ।
সর্বংসহং তু মন্যন্তে তৃণায় রিপবশ্চ তম্॥
ন জাতু শমনং যস্য তেজস্তেজস্বিতেজসাম্।
বৃথা জাতেন কিং তেন মাতুর্যৌবনহারিণা॥
যা লক্ষ্মীর্নানুলিপ্তাঙ্গী বৈরিশোণিতকুঙ্কুমৈঃ।
কান্তাপি মনসঃ প্রীতিং ন সা ধত্তে মনস্বিনাম্॥
রিপুরক্তেন সংসিক্তা তৎস্ত্রীনেত্রাম্বুভিস্তথা।
ন ভূমির্যস্য ভূপস্য কা শ্লাঘা তস্য জীবিতে॥৩/২৪-৩৫

অর্থাৎ, বলশালী হলেও শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করা ঠিক নয়। জল যতই গরম করা হোক না কেন, আগুনকে নিভোবেই নিভোবে। যার সত্য নেই, ধর্ম নেই, তেমন লোকের সঙ্গে কখনো সন্ধি করা উচিত নয়। কেননা, সন্ধি যতই সুদৃঢ় হোক, অসাধুর ঘুরে যেতে কতক্ষণ লাগে? নিষ্ঠুর, লোভী, অলস, সত্যের বালাই নেই, অসাবধান, ভীরু, অস্থির, মূঢ় এবং যোদ্ধাদের অবজ্ঞা করে – এমন শত্রুকে সহজেই বিনাশ করা সম্ভব । চতুর্থ উপায় দিয়ে যে-রিপুকে বাগ মানানো যায়, তার ওপর সাম প্রয়োগ করা নিষ্ফল। যে কাঁচা জ্বর ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়, কোন্ বুদ্ধিমান তাতে জল ছিটোয়? শত্রু রেগে থাকলে শান্তিবচন বরং আরো রাগিয়ে তোলে। তপ্ত গরম ঘিয়ের ওপর হঠাৎ জল ফোঁটা পড়লে যেমন হয়। আয়তনে ঢের বড়ো, তবুও মত্ত হাতির মাথায় সিংহ পা রাখে অসীম সাহসে। ভারদ্বাজেরা বলেন, উৎসাহশক্তিসম্পন্ন হলে লঘুব্যক্তিও বলবান শত্রুকে বধ করতে পারে, যেমন সিংহ বধ করে হাতিকে। শত্রুকে বলপ্রয়োগে মারতে না পারলে কৌশলে বা ছলে মারতে হয়। যেমন স্ত্রীলোক সেজে ভীম মেরেছিলেন কীচককে। উগ্রদণ্ডধর যমের মতো যে রাজা কড়া শাস্তি দেন, শত্রুরা সহজে তাঁর বশীভূত হয়। আর যিনি সবই সহ্য করে নেন, শত্রুরা তাঁকে তৃণের মতো তুচ্ছ জ্ঞান করে। যার তেজে তেজস্বীদেরও তেজ ঠাণ্ডা হয়ে যায় না, কী লাভ তার জন্মে? শুধুই মায়ের যৌবন হরণ। শত্রুর রক্তে যে লক্ষ্মী মাখেনি অঙ্গে

কুঙ্কুম-আলপনা, সুন্দরী হলেও সে মনস্বি-মনোরমা নয়, শত্রুর রক্তে, শত্রুরমণীর নয়নের জলে যে মাটি ভেজেনি সে রাজার জীবনে কোনো বাহাদুরি নেই।

এইভাবে সঞ্জীবী দিলেন অত্যন্ত উদ্দীপনামূলক যুদ্ধের পরামর্শ, যেভাবে আক্রমণের মাধ্যমে শত্রুকে পরাস্ত করে সমস্যার সমাধান করা যায়।

যান

এরপর মন্ত্রী অনুজীবী যান সম্পর্কে বলল। রাজধর্মে যান রাষ্ট্রের সংকটে অতীব প্রয়োজনীয়। যান শব্দের অর্থ হলো অভিযান বা পালানো। মন্ত্রী অনুজীবী কাকরাজ মেঘবর্ণকে বলল – মহারাজ অরিমর্দন এমনিতেই পাজী, তার ওপর আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, অপরদিকে ন্যায়-নীতির বালাই নেই, চুক্তিভঙ্গ করবেই। ওর সঙ্গে সন্ধি কিংবা বিগ্রহ কোনোটাই করা ঠিক হবে না। অতএব যান আর্থাৎ পালানোই ভালো। কেননা –

বলোৎকটেন দুষ্টেন মর্যাদারহিতেন চ।
ন সন্ধির্বিগ্রহো নৈব বিনা যানং প্রশস্যতে॥
দ্বিধাকারং ভবেদ্ যানং ভয়ে প্রাণার্থরক্ষণম্।
একমন্যজ্জিগীষোশ্চ যাত্রালক্ষণমুচ্যতে॥
কার্তিকে বাথ চৈত্রে বা বিজিগীষোঃ প্রশস্যতে।
যানমুৎকৃষ্টবীর্যস্য শত্রুদেশে ন চান্যদা॥
অবস্কন্দপ্রদানস্য সর্বে কালাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
ব্যসনে বর্তমানস্য শত্রোশ্ছিদ্রান্বিতস্য চ॥
স্বস্থানং সুদৃঢ়ং কৃত্বা শূরৈশ্চাপ্তৈর্মহাবলৈঃ।
পরদেশং ততো গচ্ছেৎ প্রণিধিব্যাপ্তমগ্রতঃ॥
অজ্ঞাতবীবধাসারতোয়শস্যো ব্রজেৎ তু যঃ।
পররাষ্ট্রং ন ভূয়ঃ স স্বরাষ্ট্রমপি গচ্ছতি॥
তন্ন যুক্তং প্রভো কর্তুং দ্বিতীয়ং যানমেব চ।
ন বিগ্রহং ন সন্ধানং বলিনা তেন পাপিনা॥

যদপসরতি মেষঃ কারণং তৎ প্রহর্তুং
মৃগপতিরপি কোপাৎ সঙ্কুচত্যৎ পতিষ্ণুঃ।
হৃদয়নিহিতভাবা গূঢ়মন্ত্রপ্রচারাঃ
কিমপি বিগণয়ন্তো বুদ্ধিমন্তঃ সহন্তে॥
বলবন্তং রিপুং দৃষ্ট্বা দেশত্যাগং করোতি যঃ।
যুধিষ্ঠির ইবাপ্নোতি পুনর্জীবন্ স মেদিনীম্॥৩/৩৬-৪৪

অর্থাৎ, বেশি শক্তিমান, দুষ্ট এবং ন্যায়-নীতির ঠিক নেই, চুক্তিভঙ্গ করবেই, এমন শত্রুর সঙ্গে সন্ধিও নয়, বিগ্রহও নয়, যানই ভালো। যান দুরকম। একটা হলো সঙ্কটে প্রাণ এবং অর্থ বাঁচানো। অন্যটি হলো বিজয়েচ্ছু রাজার অভিযান। উত্তম শক্তিসম্পন্ন বিজয়েচ্ছু রাজার, কার্তিক অথবা চৈত্রমাসে শত্রুদেশে অভিযান করা ভালো, অন্য সময় নয়। তবে শত্রু যদি বিপন্ন হয়, অথবা তার কোনো দুর্বলতা দেখে, তাহলে যেকোনো সময়েই আক্রমণ করা চলে। শত্রুর রাজ্য আগে থেকেই গুপ্তচরে ছেয়ে ফেলে, বিশ্বাসী মহাবল বীরপুরুষদের দ্বারা নিজের রাজ্য সুরক্ষিত করে, তবে রাজা সেখানে যাবেন। রাজা রসদ, মিত্ররাজ্য, জল এবং শস্য এসব না জেনে যে শত্রুরাজ্যে যায়, সে আর নিজের রাজ্যে ফিরে আসতে পারেনা। প্রভু, তাই বলি ঐ বলবান পাপীটার সঙ্গে যুদ্ধ-সন্ধি কোনটাই উচিত হবে না। যেমন ভেড়া মারবে বলেই পিছু হটে যায়, আবার সিংহ গুটিয়ে গিয়ে ক্রোধে লাফ দিয়ে আক্রমণ করে। বুদ্ধিমানেরা মনোভাব চেপে, লুকিয়ে মন্ত্রণা আর চলাফেরা, একটুও কিছু না বলে গ্রাহ্য করে যান, সব সহ্য করে যান। তাই রিপু বলবান দেখে যে ব্যক্তি দেশ ছেড়ে চলে যান যুধিষ্ঠিরের মতো তিনি বেঁচে থাকেন। পরিশেষে সেই রাজ্য ফিরে পান। বলহীন যদি অহঙ্কারে বলবানের সঙ্গে যুঝতে যায়, যা তাই করে বসে, তাহলে তার কুলক্ষয় ঘটে।

এভাবে অনুজীবী দিলো যানের পরামর্শ, অর্থাৎ আপাতত পালিয়ে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

আসন

এরপর মন্ত্রী প্রজীবী আসন সম্পর্কে বলল। রাজধর্মে আসন রাষ্ট্রের সংকটে অবস্থানুসারে পালনীয়। আসন শব্দের অর্থ হলো বসে থাকা। এ ক্ষেত্রে শক্তভাবে দুর্গ অবলম্বন করে থাকতে হয়। প্রজীবীর মতে – সন্ধি, বিগ্রহ, যান এই তিনটির কোনোটাতেই শত্রুর পতন হবে না। অতএব আসনই শ্রেয়। কেননা –

নক্রঃ স্বস্থানমাসাদ্য গজেন্দ্রমপি কর্ষতি।
স এব প্রচ্যুতঃ স্থানাচ্ছুনাপি পরিভূয়তে॥
অভিযুক্তো বলবতা দুর্গে তিষ্ঠেৎ প্রযত্নবান্ ।
তত্রস্থঃ সুহৃদাহ্বানং প্রকুর্বীতাত্মমুক্তয়ে ॥
যো রিপোরাগমং শ্রুত্বা ভয়সন্ত্রস্তমানসঃ।
স্বস্থানং সন্ত্যজেৎ তত্র ন তু ভূয়ো বিশেচ্চ সঃ॥
দংষ্ট্রাবিরহিতঃ সর্পো মদহীনো যথা গজঃ।
স্থানহীনস্তথা রাজা গম্যঃ স্যাৎ সর্বজন্তুষু ॥
নিজস্থানস্থিতোঽপ্যেকঃ শতং যোদ্ধুং সহেন্নরঃ।
শক্তানামপি শত্রুণাং তস্মাৎ স্থানং ন সন্ত্যজেৎ ॥
তস্মাদ্দুর্গং দৃঢ়ং কৃত্বা সুভটাসারসংযুতম্।
প্রাকারপরিখাযুক্তং যন্ত্রাদিভিরলংকৃতম্॥
তিষ্ঠেন্মধ্যগতো নিত্যং যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।
জীবন্ সম্প্রাপ্স্যতি রাজ্যং মৃতো বা স্বর্গমেষ্যতি॥
বলিনাপি ন বাধ্যন্তে লঘবেঽপ্যেকসংশ্রয়াঃ।
বিপক্ষেণাপি মরুতা যথৈকস্থানবীরুধঃ॥
মহানপ্যেকজো বৃক্ষো বলবান্ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
প্রসহ্য ইব বাতেন শক্যো ঘর্ষয়িতুং যতঃ॥
অথ যে সংহতা বৃক্ষাঃ সর্বতঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।
তে ন রৌদ্রানিলেনাপি হন্যন্তে হ্যেকসংশ্রয়াৎ॥
এবং মনুষ্যমেকং চ শৌর্যেণাপি সমন্বিতম্।
শক্যং দ্বিষন্তো মন্যন্তে হিংসন্তি চ ততঃ পরম্॥৩/৪৬-৫৬

অর্থাৎ, গজরাজকেও টেনে নিয়ে যায় কুমির, যদি সে স্বস্থানে থাকে। আর যদি সে স্থানচ্যুত হয়, তাহলে কুকুরেও তাকে কাবু করে ফেলে। যদি বলবান হামলা করে তাহলে সযত্নে দুর্গ আঁকড়ে থাকতে হয় । উদ্ধার পেতে ওখান থেকেই আহ্বান করতে হবে বন্ধুবর্গকে। শত্রু আসছে শুনেই যে ভয়ে নিজ স্থান ত্যাগ করে, সে স্বস্থানে আর ফিরতে পারে না। দাঁতহীন সাপ, মদমত্ত হাতি যেমন, তেমনি স্থান-ভ্রষ্ট রাজা শক্তিহীন। স্বস্থানে থেকে একাই একশ, তখন সমর্থ শত্রুকে যুঝতে পারা সহজ, অতএব ঠাঁই ছাড়া উচিত নয়। সুতরাং দুর্গ সুদৃঢ় করে ভালো ভালো যোদ্ধা এবং যুদ্ধমিত্রদের রেখে, প্রাকার ও পরিখা দিয়ে ঘিরে, অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে সুসজ্জিত করে, তার মধ্যে সর্বদা যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়ে থাকতে হবে। বাঁচলে রাজ্য, মরলে স্বর্গ। দুর্বল অনেক লোকও একাট্টা হলে প্রবল শত্রুও দমন করতে পারে না। মজবুত বিরাট গাছ, গভীরে শেকড়, তবু যদি একা হয়, তাকে সহজেই ভাঙতে পারে ঝড়। অথচ জড়ো অনেক লতাকে পারে না উপড়ে নিতে প্রতিকূল ঝড়ও। তেমনি বীরপুরুষও যদি একা হয় সংসারে, শত্রু তাকে সহজেই মারে।

এভাবে প্রজীবী দিলো আসনের পরামর্শ, অর্থাৎ নিজ আশ্রয়ে থেকে পরে সুযোগ বুঝে আক্রমণ করলে সমস্যার সমাধান হয়।

সংশ্রয়

এরপর মেঘবর্ণের প্রশ্নের উত্তরে চিরঞ্জীবী সংশ্রয় সম্পর্কে বলল। সংশ্রয় শব্দের অর্থ হলো অন্য কোনো মহান ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ। এ ক্ষেত্রে সুহৃদ ও শক্তিমানদের আশ্রয় করে থাকতে হয়। চিরঞ্জীবীর মতামত হলো সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন এই চারটির কোনোটাই শত্রুর পতন ঘটাবে না। অতএব সংশ্রয়ই শ্রেয়। কেননা –

অসহায়ঃ সমর্থোঽপি তেজস্বী কিং করিষ্যতি।
নির্বাতে জ্বলিতো বহ্নিঃ স্বযমেব প্রশাম্যতি॥
বনানি দহতো বহ্নেঃ সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় কৃশে কস্যাস্তি সৌহৃদম্ ॥

সংঘাতবান্ যথা বেণুনিবিড়ো বেণুভির্বৃতঃ ।
ন হি শক্যো সমুচ্ছেত্তুং দুর্বলোঽপি তথা নৃপঃ॥
মহাজনস্য সম্পর্কঃ কস্য নোন্নতিকারকঃ।
পদ্মপত্রস্থিতং তোয়ং ধত্তে মুক্তাফলশ্রিয়ম্ ॥৩/৫৭-৬০

অর্থাৎ, সামর্থ্যবান তেজীয়ানও একা অসহায়, যেমন আগুন বায়ুর আশ্রয় না পেলে নিভে যায়। আবার দাবানলে যখন বন পুড়ে যায়, বাতাস তখন বন্ধু হয়। সেই তো ক্ষুদ্র প্রদীপকে নিভিয়ে দেয়। তাই দুর্বলের বন্ধু কেউ হয় না। ঘন বাঁশবনে বাঁশে বাঁশে ঘেরা নিবিড় বাঁশ ঝড়ে যেমন নির্মূল করতে পারে না, তেমনই ক্ষীণ রাজা হলেও জোটবদ্ধ থাকলে সমূলে কেউ ধ্বংস করতে পারে না। মহৎজনের সাথে সর্ম্পক স্থাপনেও অবস্থার উন্নতি হয়, যেমন মুক্তার মতো আকার ধরে পদ্মপাতার জল।

এইভাবে চিরঞ্জীবী দিলো সংশ্রয়ের পরামর্শ, অর্থাৎ কোনো মহান ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে পরে সুযোগ বুঝে আক্রমণ করে সমস্যার সমাধান সম্ভব।

দ্বৈধীভাব

এভাবে একে-একে পাঁচজন মন্ত্রীর কথা শোনার পর মেঘবর্ণ বহুকালের মন্ত্রী স্থিরজীবীকে প্রণাম করে বলল, মহাশয়, আপনি সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম। আপনার মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে আমি এসব মন্ত্রীদের মতামত শুনলাম তা কেবল পরীক্ষা করার জন্য। এখন আপনি পর্যালোচনাপূর্বক যা কর্তব্য সে সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করুন। স্থিরজীবী বলল মহারাজ, পাঁচজন মন্ত্রী নীতিশাস্ত্রসম্মত কথাই বলেছে। এদের উপদেশ সবগুলিই ঠিকঠিক সময়ে খাটে বৈকি। তবে এখন সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয়ের সময় নয়, এখন হলো দ্বৈধীভাব অর্থাৎ ছলনার সময়। তাই শুনুন –

অবিশ্বাসং সদা তিষ্ঠেৎ সন্ধিনা বিগ্রহেণ চ।
দ্বৈধীভাবং সমাশ্রিত্য পোপশত্রৌ বলীয়সি॥
উচ্ছেদ্যমপি বিদ্বাংসো বর্ধয়ন্ত্যরিমেকদা।

গুড়েন বর্ধিতঃ শ্লেষ্মা মুখং বৃদ্ধ্যা নিপাত্যতে॥
স্ত্রীণাং শত্রোঃ কুমিত্রস্য পণ্যস্ত্রীণাং বিশেষতঃ।
যো ভবোদকভাবেঽত্র ন স জীবতি মানবঃ॥
কৃত্যং দেবদ্বিজাতীনামাত্মনশ্চ গুরোস্তথা।
একভাবেন কর্তব্যং শেষং দ্বৈধং সমাশ্রিতম্॥
একো ভাবঃ সদা শস্তো যতীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
স্ত্রীলুব্ধানাং ন লোকানাং বিশেষেণ মহীভৃতাম্ ॥৩/৬১-৬৫

অর্থাৎ, শত্রু যদি দুষ্ট আর বলবান হয়, তাহলে মনে এক, মুখে আরেক বলতে হবে। তাকে বিশ্বাস করা যাবে না। সামনে সন্ধি করতে হবে পেছনে বিগ্রহ। যে শত্রুকে মারতে হবে তাকে প্রলোভন দেখিয়ে বিশ্বাস বাড়াতে হবে, যাতে অনায়াসেই ধ্বংস করা যায়। যেমন চিকৎসকেরা ওষুধ প্রয়োগ করে রোগের বৃদ্ধি ঘটান পরে সে ওষুধেই নিবারণ করেন। স্ত্রীলোক, শত্রু, দুষ্টবন্ধু, আর পণ্যাঙ্গনা – এদের যারা অকপটে বিশ্বাস করে, তারা বাঁচতে পারে না। অকপটে কাজ করবে নিজের, দ্বিজের, গুরু, আত্মজ্ঞ সাধু আর দেবতার জন্য। বাকিদের বেলা মনে এক, মুখে আরেক করতে হবে। আর নারীলুব্ধ পুরুষ আর রাজার সঙ্গে অকপটে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

স্থিরজীবী আরও বলল, দ্বৈধীভাব আশ্রয় করলে তুমি স্বস্থানে থাকতে পারবে এবং প্রলোভনের সাহায্যে শত্রুকেও ধ্বংস করতে পারবে। তাছাড়া তার কোনো দুর্বলতা দেখতে পেলে গিয়ে মেরে ফেলতে পারবে।

মেঘবর্ণ বললে, কাকা, সে কোথায় থাকে তা তো জানি না। কী করে তার ছিদ্র জানব?

স্থিরজীবী বলল, ভদ্র, শুধু থাকার জায়গাই নয়, গুপ্তচরের সাহায্যে সমস্ত তথ্য জানা সম্ভব। কেননা শাস্ত্রে আছে –

গন্ধেন গাবঃ পশ্যন্তি বেদৈঃ পশ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানশ্চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ॥
যস্তীর্থানি নিজে পক্ষে পরপক্ষে বিশেষতঃ।
গুপ্তৈশ্চরৈর্নৃপো বেত্তি ন স দুর্গতিমাপ্নুয়াৎ॥৩/৬৬-৬৭

অর্থাৎ, গরু দেখে গন্ধ নিয়ে, বেদ দিয়ে দেখে ব্রাহ্মণ, রাজা দেখে চর দিয়ে আর চোখ দিয়ে দেখে জনসাধারণ। নিজপক্ষে পরপক্ষে যত তীর্থ আছে, যে-রাজা গুপ্তচর দিয়ে তা জেনেছে খুটিয়ে খুটিয়ে, তার কোনোদিন দুর্গতি হয় না ।

মেঘবর্ণ বলল তীর্থ কাকে বলে? কত প্রকার কি কি? এবং গুপ্তচরের অবস্থা সম্পর্কে আমায় খুলে বলুন।

স্থিরজীবী বলল –

> রাজনীতিতে তীর্থ হলো রাজকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ। এ বিষয়ে নারদঠাকুর প্রথম যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন। শত্রুপক্ষের তীর্থ আঠারো প্রকার। যথা – মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ, দৌবারিক (দারোয়ান), আন্তর্বাসিক (অন্তঃপুরের রক্ষক), প্রশাসক (প্রধান পরামর্শদাতা), সমহর্তা (উৎসব অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থাপক), সন্নিধাতা (সভাসদদের পরিচয়দানকারী), প্রদেষ্টা (প্রধান বিচারক), জ্ঞাপক (অনুরোধ-আবেদনের ব্যবস্থাপক), সাধনাধ্যক্ষ (সৈন্যাধ্যক্ষ), গজাধ্যক্ষ, কোশাধ্যক্ষ, দুর্গপাল. করপাল (কালেক্টর), সীমাপাল ও প্রোৎকটভৃত্যবর্গ (পদস্থ কর্মচারিগণ)। গুপ্তচরের দ্বারা এদের পক্ষে আনতে পারলে সেই রাজাকে পরাস্ত করা যায়। আর নিজের পক্ষের তীর্থ হলো পনেরো প্রকার – পাটরানি, রাজমাতা, কঞ্চুকী, মালী, শয্যাপালক, স্পশাধ্যক্ষ (প্রধান গুপ্তচর), সাংবাৎসরিক (দৈবজ্ঞ), ভিষক (চিকিৎসক), জলবাহক, তাম্বুলবাহক (পানবাহক), আচার্য, অঙ্গরক্ষক, স্থানচিন্তক, ছত্রধর এবং বিলাসিনী। এদের শত্রুতায় নিজপক্ষের ধ্বংস অনিবার্য।[১১]

এখন গুপ্তচর সম্পর্কে মন দিয়ে শোনো, রাজনীতিতে গুপ্তচর অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। নিজের পক্ষের গুপ্তচর হলো –

বৈদ্যসাংবৎসরাচার্যাঃ স্বপক্ষেঽধিকৃতাশ্চরাঃ।
তথাহিতুণ্ডিকোন্মত্তঃ সর্বং জানন্তি শত্রুষু॥
কৃত্বা কৃত্যবিদস্তীর্থৈরন্তঃ প্রণিধয়ঃ পদম্।
বিদাংকুর্বন্তু মহতস্তলং বিদ্বিষদম্ভসঃ ॥৩/৬৯-৭০

অর্থাৎ, আচার্য, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য – এরা হলো নিজের পক্ষের গুপ্তচর। এরা অবিশ্বাসী হলে এদের মাধ্যমে নিজের পক্ষের কথা শত্রুর কাছে পৌঁছে যায়। আর সাপুড়ে এবং পাগল

– এরা হলো শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। এদের মাধ্যমে শত্রুর হাঁড়ির খবর জানা যায়। রাজনীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে – শত্রু হলো গভীর জল আর তীর্থ হলো তার সিঁড়ি। নিপুণ চরেরা এই সিঁড়ি বেয়ে গভীরে নেমে ভিতরের খবর সংগ্রহ করে আনে।

এরপর স্থিরজীবী কাকরাজের প্রশ্নের উত্তরে কাক-পেঁচার শত্রুতা সম্পর্কে যে উত্তর প্রদান করল তা অবশ্যই রাজনৈতিক প্রজ্ঞাপ্রসূত বিষয়। যেমন –

যো ন রক্ষতি বিত্রস্তান্ পীড্যমানান্ পরৈঃ সদা।
জন্তূন্ পার্থিবরূপেণ স কৃতান্তো ন সংশয়ঃ॥
যদি ন স্যান্নরপতিঃ সম্যঙ্নেতা ততঃ প্রজা।
অকর্ণধারা জলধৌ বিপ্লবেতেহ নৌরিব॥
ষড়িমান্ পুরষো জহ্যাদ্ভিন্নাং নাবমিবার্ণবে।
অপ্রবক্তারমাচার্যমনধীয়ানমৃত্বিজম্॥
অরক্ষিতারং রাজানং ভার্যাং চাপ্রিয়বাদিনীম্।
গ্রামকামং চ গোপালং বনকামং চ নাপিতম্॥৩/৭১-৭৪

অর্থাৎ, শত্রুর অত্যাচারে সদা তিক্ত, ভীতসন্ত্রস্ত প্রজাকে যে রক্ষা করে না, সে রাজা নিঃসন্দেহে যম সমতুল্য। রাজা প্রজাদের ঠিকপথে না চালালে মাঝিহীন তরীর মতো ডোবে সমুদ্র সলিলে। যেমন যে গুরু ভালো কথা বলেন না, যে ঋত্বিক করে না বেদ অধ্যয়ন, যে রাজা করে না রক্ষা, যে ভার্যার মুখে সদা অপ্রিয়বচন, যে রাখাল ভালোবাসে গ্রাম, আর যে নাপিত ভালোবাসে বন এবং সাগরে ভাঙা নৌকা এসব কিছুই ত্যাগ করা উচিত।

পেঁচারাজের অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। এখানে পঞ্চতন্ত্রকার গণতান্ত্রিক পন্থায় রাজা নির্বাচনের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। গণতন্ত্র হলো সকলের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। পেঁচারাজকে রাজা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও উপস্থিত সকলের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে।[১১] ইতোমধ্যে সভাস্থলে এক কাক এসে উপস্থিত হওয়ায় তার কাছে পেঁচারাজকে রাজ্যের রাজা করার জন্য মতামত জানতে চাওয়ায় সে দ্বিমত পোষণ

করল। তখন সে যুক্তিপূর্ণভাবে যে কথাগুলো বলল তাতে রাজা নির্বাচনের বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। যেমন –

'তদ্ যদ্যপি গুণবান্ ভবতি তথাপ্যেকস্মিন্ স্বামিনি স্থিতে নান্যো ভূপঃ প্রশস্যতে'

এক এব হিতার্থায় তেজস্বী পার্থিবো ভুবঃ।
যুগান্ত ইব ভাস্বন্তো বহবেঽত্র বিপত্তয়ঃ॥
গুরুণাং নামমাত্রেঽপি গৃহীতে স্বামিসম্ভবে।
দুষ্টানাং পুরতঃ ক্ষেমং তৎক্ষণাদেব জায়তে ॥৩/৭৯-৮০

অর্থাৎ, এক রাজা থাকতে আরেক রাজা ভালো নয়, যতই গুণবান হন না তিনি। তেজস্বী এক রাজাই রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যথেষ্ট। বহুতে বিপদ, যেমন অনেক সূর্যে প্রলয় বাঁধে। রাজা যদি প্রভাবশালী লোক হন, তাহলে দুর্জনের সামনে শুধু তাঁর নামটি উচ্চারণ করলেই হয়, সঙ্গে সঙ্গে সুফল মেলে।

এরপর স্থিরজীবী পেঁচারাজকে পরাস্ত করার জন্য ষড়গুণ ছাড়া আরো একটি বড় উপায়ের কথা বলল। সেটি হলো সাম-দাম-ভেদ-দণ্ড ছাড়িয়ে পঞ্চম উপায়ে কিভাবে শত্রু জয়লাভ করা যায়, মূলত ঠকিয়ে অর্থাৎ মিথ্যা বলে কূটকৌশলে–চাতুর্যের মাধ্যমে হত্যা করা। স্থিরজীবীর উক্তিতে, যেমন –

'তমঙ্গীকৃত্য স্বয়মেবাহ তদ্বিজয়ায় যাস্যামি। রিপুন্ বঞ্চয়িত্বা বধিষ্যামি। উক্তং চ যতঃ – বহুবুদ্ধিসমাযুক্তা সুবিজ্ঞাতা বলোৎকটান্'।[১২]

অর্থাৎ, সেই উপায় অবলম্বন করে আমি নিজে যাব শত্রুজয় করতে। ওদের ঠকিয়ে হত্যা করব। কথায় বলে – রীতিমতো যারা বলবান তাদেরকেও পাকা হুঁশিয়ার ফন্দিবাজেরা ঠকাতে পারে।

এ প্রসঙ্গে স্থিরজীবী উদাহরণস্বরূপ একটি গল্প বলে, যেমন – 'মিত্রশর্মা ও তিন ধূর্ত' গল্পে ব্রাহ্মণ মিত্রশর্মা যজমানের কাছ থেকে একটি ছাগল পেয়ে মাথায় নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হন। পথে তিন ধূর্ত ছাগলটিকে বাগিয়ে নেওয়ার জন্য ছলনা করে পথের মধ্যে তিন জন তিন স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে তিন ধরনের কথা বলে। প্রথম ধূর্ত বলে, নোংরা

কুকুরটাকে ঘাড়ে নিয়ে চলেছ, দ্বিতীয় ধূর্ত বলে মরা বাছুর ঘাড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তৃতীয় ধূর্ত বলে, গাধা ঘাড়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাতে ব্রাহ্মণ ঘাবরে গিয়ে ভয় পেয়ে ছাগলটিকে ফেলে দিয়ে দৌড়ে তাড়াতাড়ি স্বস্থান ত্যাগ করেন। ধূর্তরা ছাগলটি পেয়ে মনের আনন্দে ভক্ষণ করে। রাজনীতিতেও এভাবে কৌশলে বিরোধী পক্ষকে পরাস্ত করা যায়।

পরবর্তীতে স্থিরজীবীর সেই রাজনৈতিক কৌশলটি নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন –

> তন্মাং বিপক্ষভূতং কৃত্বাতিনিষ্ঠুরবচনৈর্নির্ভৎস্য যথা বিপক্ষপ্রণিধীনাং প্রত্যয়ো ভবতি তথা সমাহৃত-রুধিরৈরালিপ্যাস্যৈব ন্যগ্রোধস্যাধস্তাৎ প্রক্ষিপ্য গম্যতাং পর্বতমৃষ্যমূকং প্রতি। তত্র সপরিবারস্তিষ্ঠ যাবদহং সমস্তান্ সপত্নান্ সুপ্রণতিেন বিধিনা বিশ্বাস্যাভিমুখান্ কৃত্বা কৃতার্থো জ্ঞাতদুর্গমধ্যো দিবসে তানন্ধতাং সুপ্রণীতেন বিধিনা বিশ্বাস্যাভিমুখান্ কৃত্বা কৃতার্থো জ্ঞাতদুর্গমধ্যে দিবসে তানন্ধতাং প্রাপ্তাংস্ত্বাং নীত্বা ব্যাপাদয়িষ্যামি। জ্ঞাতং ময়া সম্যক্। নান্যথাস্মাকং সিদ্ধিরিতি। যতো দুর্গমেতদপসাররহিতং কেবলং বধায় ভবিষ্যতি। উক্তং চ যতঃ –
>
> অপসারসমাযুক্তং নয়জ্ঞৈদুর্গমুচ্যতে।
> অপসারপরিত্যক্তং দুর্গব্যাজেন বন্ধনম্॥৩/১২১[১৩]

অর্থাৎ, তুমি আমার সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করে অত্যন্ত নিষ্ঠুর সব কথা বলে ভীষণভাবে বকাঝকা করে, বিপক্ষের চরদের বিশ্বাস করানোর জন্য রক্ত মাখিয়ে এই বটের তলায় আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঋষ্যমূক পাহাড়ে চলে যাবে। অতঃপর দলবল নিয়ে সেখানেই থাকবে, যতদিনে আমি সুকৌশলে সমস্ত শত্রুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমার উপর প্রসন্ন না করি, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে, দুর্গের ভিতরে কি আছে জানা হয়ে যাবে। তারপর দিনের বেলা তারা যখন চোখে না দেখে, সেই সময় তোমাকে ডেকে এনে হত্যা করব। আমি ভালো করেই বুঝেছি, এ ছাড়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির আর কোনো উপায় নেই। কেননা তাদের দুর্গ থেকে পালানোর কোনো রাস্তা নেই। সেখানে থাকলে তারা শুধু মরবে।

এভাবে কাকরাজ ও মন্ত্রী স্থিরজীবী মন্ত্রণা মোতাবেক কপট-কলহ করে। তখন শত্রু পক্ষের চর কৃকালিকা প্রধানমন্ত্রী স্থীরজীবীর সেই করুণ অবস্থা এবং কাকরাজের পলায়নের খরব পেঁচারাজকে দেওয়ার সাথে সাথেই মন্ত্রীদের নিয়ে পেঁচারাজ ঘটনাস্থানে উপস্থিত হয়। স্থিরজীবী সকলের উদ্দেশে আক্রমণের কথা বললে, যা সত্যিই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রসূত উক্তি। যেমন –

শত্রোঃ প্রচলনে ছিদ্রমেকমন্যচ্চ সংশ্রয়ম্।
কুর্বাণো জায়তে বশ্যো ব্যগ্রত্বে রাজসেবিনাম্॥
ন চ ছিদ্রং বিনা শক্রর্দেবানাপি সিধ্যতি।
ছিদ্রং শক্রেণ সাম্প্রপ্য দিতের্গর্ভো বিদারিতঃ॥৩/১২৪-১২৫

অর্থাৎ, শত্রুর পলায়ন- এ হলো তার এক নম্বর ছিদ্র অর্থাৎ দুর্বল অবস্থান, আক্রমণের উপযুক্ত সময়। অন্যটি হলো তার আশ্রয় গ্রহণ। এসব করতে করতেই তাকে বশীভূত করা যায়, কেননা রাজ-ভৃত্যেরা তখন গোলমালের মধ্যে থাকে। বিনা ছিদ্রতে দেবতারাও শত্রু জয় করতে পারেন না। যেমন ছিদ্র পেয়েই ইন্দ্র দিতির উদর বিদির্ণ করেছিলেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কপট-কলহে নিয়োজিত স্থিরজীবী, যাতে তাদের বিরোধী পেঁচারাজ সন্দেহ না করতে পারে সেজন্য স্বপক্ষের রাজা কাকরাজকে শয়তান বলে গালাগাল দিয়ে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য নানাভাবে দোষারোপ করতে থাকে। সেইসাথে নীতিশ্লোক আউড়ে রাজনৈতিক কথা বলল। যেমন –

বলীয়সা হীনবলো বিরোধং ন ভূতিকামো মনসাপি বাঞ্ছেৎ।
ন বধ্যতে বেতসবৃত্তিরত্র ব্যক্তং প্রণাশোঽস্তি পতঙ্গবৃত্তেঃ॥
বলবন্তং রিপুং দৃষ্ট্বা সর্বস্বমপি বুদ্ধিমান্।
দত্ত্বা হি রক্ষয়েৎ প্রাণান্ রক্ষিতৈস্তৈর্ধনং পুনঃ॥৩/১২৮-১২৯

অর্থাৎ, নিজের ভালো চাইলে দুর্বল লোকও মনে মনে চাইবে না শক্তিমানের সঙ্গে বিরোধ। যেমন বেতস লতার মতো হলে তার মৃত্যু নেই। আর পতঙ্গবৎ আচরণ করলে বিনাশ হবেই। শত্রু যদি বলবান হয় তাহলে সর্বস্ব দিয়ে হলেও সন্ধি করতে হয়। কারণ যদি প্রাণ থাকে, ধন একদিন পুনরায় হবেই ।

স্থিরজীবী আরও বলল, কিছু দুষ্টু লোক উসকে দেওয়ার পর আমাকে মেঘবর্ণ সন্দেহ করে। মেঘবর্ণ বোধহয় ভাবছে আমি আপনার দিকে। তখন আমার এই দশা করে। এখন আপনার শ্রীচরণ দুটিই আমার ভরসা। যদি অভয় দেন তাহলে সেরে উঠে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে নিয়ে তার বাসায় গিয়ে স্ববংশে ধ্বংস করব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পেঁচারাজ অরিমর্দন তার পাঁচ জন কুলমন্ত্রী – রক্তাক্ষ, ক্রূরাক্ষ, দীপ্তাক্ষ, বক্রনাস আর প্রাকারকর্ণদের নিয়ে মন্ত্রণায় বসল। এই মন্ত্রীরা যার যার অবস্থান থেকে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রসূত কথা বলল।

প্রথমে রক্তাক্ষকে জিজ্ঞাসা করল। ভদ্র এখন আমাদের কি করা উচিত? সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলল – এতে চিন্তাভাবনার কিছু নাই। একে নির্বিচারে হত্যা করুন। কেননা –

হীনঃ শত্রুনিহন্তব্যো যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ।
প্রাপ্তস্বপৌরুষবলঃ পশ্চাদ্ ভবতি দুর্জয়ঃ॥৩/১৩০

কিঞ্চ স্বয়মুপাগতা শ্রীস্ত্যজ্যমানা শপতীতি লোকে প্রবাদঃ। উক্তং চ –

কালো হি সকৃদভ্যেতি যন্নরং কালকাঙ্ক্ষিণম্ ।
দুর্লভঃ স পুলস্তেন কালকর্মাচিকীর্ষতা॥৩/১৩১

অর্থাৎ, বলবান হওয়ার আগেই শত্রু যখন দুর্বল থাকে তখনই তাকে মারতে হয়। পরে যখন শত্রু নিজের পৌরুষে শক্তি অর্জন করে তখন তাকে আর মারা যায় না। সুযোগের আশায় অতি লোভ করে বসে আছে, এমন মানুষের কাছে সুযোগ একবারই আসে। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে সে যদি গা না করে, তাহলে সে-সুযোগ আবার পাওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়।

রক্তাক্ষের কথা কেউ শুনল না। সে ছাড়া সকলেই স্থিরজীবীকে আশ্রয় দেওয়ার পক্ষে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রক্তাক্ষ আরও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রসূত কথা বলল, যেমন –

অপূজ্যা যত্র পূজ্যন্তে পূজ্যানাং তু বিমাননা।

ত্রীণি যত্র প্রবর্তন্তে দুর্ভিক্ষং মরণং ভয়ম্॥৩/১৮৭-১৮৮

অর্থাৎ, যেখানে মানীর মান নেই, সেখানে তিনটি ঘটে – দুর্ভিক্ষ, মরণ, ভয়। হিতবাক্য ছেড়ে যারা উল্টো আচরণ করে বিচক্ষণেরা বলেন বন্ধুরূপে তারাই শত্রু।

এরপর পেঁচারাজ স্থিরজীবীকে অত্যন্ত সমাদর করে দুর্গে নিয়ে গেল। তখন স্থিরজীবী মনে মনে রক্তাক্ষের প্রশংসা করে বলল –

হন্যতামিতি যেনোক্তং স্বামিনো হিতবাদিনা।
স এবৈকোঽত্র সবেংষাং নীতিশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ॥৩/১৯০

অর্থাৎ, এদের সবার মধ্যে একজনই শুধু রাজনীতি শাস্ত্রের অর্থ এবং তত্ত্বকথা বোঝে, যে বলল 'মারুন'। সেই রাজার হিত চেয়েছে।

পেঁচারাজ স্থিরজীবীকে তার পছন্দমতো জায়গায় থাকার জন্য বলল। তখন সে উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য পেঁচারাজকে বলল –

'পরমহমপি নীতিজ্ঞস্তে ঽহিতশ্চ। যদ্যপ্যনুরক্তঃ শুচিস্তথাপি দুর্গমধ্য অবাসো নার্হঃ। তদহমত্রৈব দুর্গদ্বারস্থঃ প্রত্যহং ভবৎপাদপদ্মরজঃপরিত্রীকৃততনুঃ সেবাং করিষ্যামি।'[১৪]

অর্থাৎ, আমি রাজনীতি জানি। আমি হচ্ছি আপনার শত্রুপক্ষের লোক। যদিও এখন আপনার ভক্ত-অনুরক্ত, তবু দুর্গের মধ্যে আমাকে থাকতে দেওয়া উচিত হবে না। আমি দুর্গদ্বারেই থাকব, এখান থেকেই প্রত্যেক দিন আপনার সেবা করে শ্রীকমল-চরণের ধূলিতে শরীর পবিত্র করব।

এমনিভাবে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে কপট-কলহে নিয়োজিত স্থিরজীবী পেঁচাদের হত্যা করার জন্য কৌশল হিসেবে প্রতিদিন একটি করে কাঠ সংগ্রহ করতে থাকে গুহায় আগুন ধরিয়ে তাদের পুড়িয়ে মারার জন্য।

এর কিছুদিন পড়ে স্থিরজীবী দৌড়ে গিয়ে ঋষ্যমূক পাহাড়ে গিয়ে মেঘবর্ণকে বলল, মহারাজ শত্রুর গুহা জ্বালাবার আয়োজন প্রস্তুত। আসুন সকলে জলন্ত কাঠ নিয়ে গুহার

মুখে আমার সংগৃহীত কাঠে ফেললেই কুম্ভিপাক নরকের যন্ত্রণা ভোগ করেই পেঁচারা মারা পড়বে।

এরপর স্থিরজীবী শত্রুপক্ষের দুর্বল দিক সম্পর্কে কাকরাজকে যা বললেন তাতেও রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করা যায়। যেমন –

'ন চ মহাপ্রাজ্ঞমনেকশাস্ত্রেস্ব প্রতিহতবুদ্ধিং রক্তাক্ষং বিনা ধীমান্। যৎকরণং তেন মদীয়ং চিত্তম্ জ্ঞাতম্। যে পুনরন্যে মন্ত্রিণস্তে মহামূর্খা মন্ত্রিমাত্রব্যপদেশোপজীবিনো-ঽতত্ত্বকুশলা।'[১৫]

অর্থাৎ, একমাত্র রক্তাক্ষ ছাড়া পেঁচারাজের সকল মন্ত্রীরাই একেবারে এত মূর্খ, যা আমি আর কোথাও দেখিনি। রক্তাক্ষই মহাপ্রাজ্ঞ বহুশাস্ত্রে অপ্রতিহত বুদ্ধি। সেই জেনেছিল আমার মনের সত্যিকার অবস্থা। অন্য যে-সব মন্ত্রী প্রত্যেকেই এক-একটি গণ্ডমূর্খ। মন্ত্রী এই নামটুকুই তাদের সম্বল। রাজনীতির 'র'-ও তারা জানে না'। এছাড়া এটুকুও তারা জানত না যে –

অরিতেঽভ্যাগতো ভৃত্যো দুষ্টস্তৎসঙ্গতৎপরঃ।
অপসর্পঃ স ধর্মত্বান্নিত্যোদ্বেগী চ দূষিতঃ॥
আসনে শয়নে যানে পানভোজনবস্তুষু।
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা প্রমত্তেষু প্রহরন্ত্যরয়েঽরিষু॥৩/২০৮-২০৯

অর্থাৎ, শত্রুপক্ষ থেকে তাদের পক্ষে আগ্রহী হয়ে যোগ দিতে এসেছে যে সেবক, সে হচ্ছে গুপ্তচর। এরা সর্বদা উদ্বেগের কারণ। আসন, শয়ন, যান, পান, ভোজনের ব্যাপারে চোখ রাখতে রাখতে যেই দেখে অসাবধান, অমনি শত্রুকে আক্রমণ করে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য এরকম কপট কলহের দরকার রয়েছে। পঞ্চতান্ত্রিক যুগের পরেও আমরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কপট কলহ দেখতে পাই। তাই এভাবে কপট কলহের মাধ্যমে শত্রুদের ধ্বংস করার পন্থা সম্পর্কে আরও

অনেক মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রকার স্থিরজীবীর উক্তিতে বলেছেন। শুধু শৌর্যেই কাজ হয় না, প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি দিয়ে শত্রু জয় করা যায়। যেমন –

শস্ত্রৈর্হতা ন হি হতা বিপবো ভবন্তি প্রজ্ঞাহতাস্তু রিপবঃ সুহতা ভবন্তি।
শস্ত্রং নিহন্তি পুরুষস্য শরীরমেকং প্রজ্ঞা কুলং চ বিভবং চ যশশ্চ হন্তি॥
ত্যাগিনি শূরে বিদুষি চ সংসর্গরুচির্জনো গুণী ভবতি।
গুণবতি ধনং ধনাচ্ছীঃ শ্রীমত্যাজ্ঞা ততো রাজ্যম্॥৩/২২৩-২২৪
মানোৎসেকপরাক্রমব্যসনিনঃ পারং ন যাবদ্গাতাঃ।
সামর্ষে হৃদয়েঽবকাশবিষয়া তাবৎ কথং নিবৃতিঃ॥৩/২২৯

অর্থাৎ, রাজার অস্ত্রের আঘাতে কখনও রিপু মরেও মরে না। তবে প্রজ্ঞার আঘাতে রিপু মরবেই। অস্ত্র মারে শুধুমাত্র পুরুষের দেহ। কুল, যশ, ঐশ্বর্য এসব মারতে প্রজ্ঞা প্রয়োজন। ত্যাগী, শূর, বিদ্বানের সঙ্গ যে পছন্দ করে, তার গুণ বাড়ে। গুণ হলে ধন আসে, ধনেতে প্রভুত্ব, প্রভুত্ব হলে আজ্ঞা, তারপরে রাজ্য পাওয়া য়ায়। গুণবান, নীতিবান, সাহসী, আত্মাভিমানী, পরাক্রমী নৃপতিরা আরাধ্য কাজ শেষ না করা পর্যন্ত মনে আনন্দ পান না।

স্থিরজীবীর দূরদর্শিতায় নিষ্কণ্টক রাজ্য পাওয়ার পর সে কাকরাজকে রাজনৈতিক বিষয়ে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিলো, যা রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে খুবই মঙ্গলজনক। এ প্রসঙ্গে স্থিরজীবীর উক্তিতে পঞ্চতন্ত্রকার বলতে চেয়েছেন – এখন থেকে প্রজাপালনে তৎপর হয়ে পুত্রপৌত্রাদিসহ নিস্কণ্টকরাজ্য ভোগ করবে, সেই সাথে এই রাজ্যশ্রী যাতে অচলা থাকে সেজন্য মূল্যবান পরামর্শ মেনে চলবে। যেমন –

প্রজা ন রঞ্জয়েদ্ যস্তু রাজা রক্ষাদিভির্গুণৈঃ।
অজাগলস্তনস্যেব তস্য রাজ্যং নিরর্থকম্॥
গুণেষু রাগো ব্যসনেষ্বনাদরো রতিঃ সুভৃত্যেষু চ যস্য ভূপতেঃ।
চিরং স ভুঙ্‌ক্তে চলচামরাংশুকাং সিতাতপত্রাভরণং নৃপশ্রিয়ম্॥৩/২৩০-৩৩১

অর্থাৎ, রক্ষণাদি গুণে যে রাজারা প্রজাদের মনোরঞ্জন করতে না পারেন মিথ্যা সে রাজার রাজ্য, অপরদিকে গুণে অনুরাগী, নেশায় বিরাগ, সুভৃত্যে ভালোবাসা যে রাজারা দেখান, সে রাজারা চলৎ চামর, শ্বেতছত্র আভরণ তথা রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে আমরণ থাকেন।

পঞ্চতন্ত্রকার স্থিরজীবীর উক্তিতে রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে আরও মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে তা রক্ষা করা যেমন কঠিন, তেমনি নিষ্কণ্টকরাজ্য পাওয়াই বড় কথা নয়, প্রজাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন তথা শান্তিপূর্ণভাবে রাজ্য শাসন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি অনুধাবন করে কাজ করাই রাজনীতি। যেমন –

> যৎকারণং চলা হি রাজ্ঞো বিভূতয়ো বংশারোহণবদ্ রাজ্যলক্ষ্মীর্দুরারোহা ক্ষণবিনিপাতরতা প্রযত্নশতৈরপি ধার্যমাণা দুর্ধরা প্রশস্তারাধিতাপ্যন্তে বিপ্রলম্ভিনী বানরজাতিরিব বিদ্রুতানেকচিত্তা পদ্মপত্রোদকমিবাঘটিতসংশ্লেষা পবনগতিরিবাতিচপলা নার্যসঙ্গতিরিবাস্থিরা আশীবিষ ইব দুরুপচারা সন্ধ্যাভ্রলেখেব মুহূর্তরাগা জলবুদ্বুদাবলীব স্বভাবভঙ্গুরা শীরপ্রকৃতিরিব কৃতঘ্না স্বপ্নলব্ধদ্রব্যরাশিরিব ক্ষণদৃষ্টনষ্টা।[১৬] এছাড়াও রয়েছে –
>
> যদৈব রাজ্যে ক্রিয়তেঽভিষেকস্তদৈব বুদ্ধির্ব্যসনেষু যোজ্যা।
> ঘটা হি রাজ্ঞামভিষেককালে সহাম্ভসৈবাপদমুদ্গিরন্তি॥৩/২৩২

অর্থাৎ, রাজ্য পেয়ে গেছি মনে করে ঐশ্বর্যগর্বে প্রতারণা করবে না। কেননা রাজার সম্পদ ক্ষণস্থায়ী, বাঁশে চড়ার মতোই শক্ত হলো রাজলক্ষ্মীকে পাওয়া। এই আছে তো এই নেই। ধরে রাখার জন্যে হাজার চেষ্টা করেও অনেক ক্ষেত্রে তাকে ধরে রাখা যায় না। যতই ভালো করে এর রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করা হোক না কেন তারপরেও পরাস্ত হতে হয়। রাজলক্ষ্মী হচ্ছে বানরের মনের মতো অতি চঞ্চল, পদ্মপাতার জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, একটু অসাবধান হলেই পড়ে যাবে। বাতাসের বেগের মতো গতিমান, অনার্যের বন্ধুত্বের মতো, এই আছে এই নাই। ইহা সাপের মতো দুরুপচার, যার দংশনের বিষ ওষুধ দিয়ে সারানো শক্ত, একে সেবা করে তুষ্ট করা কঠিন। ইহা সন্ধ্যার

মেঘমালার ন্যায় মুহূর্তের জন্যে রঙ ধরে, তেমনি রাজলক্ষ্মীর ভালোবাসা এক মুহূর্তের জন্য। জলের বুদ্বুদশ্রেণির মতো এ লক্ষ্মী স্বভাবে ভঙ্গুর। সাপের স্বভাবের মতো কৃতঘ্ন। এ যেন স্বপ্নে পাওয়া দ্রব্য রাশির মতো, দেখা মাত্র ম্লান হয়ে যায়। তাই তো পৃথিবীর ইতিহাসে বিখ্যাত রাজাদের জীবনেও এমনটি পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন – অভিষেকের দিন রামকে বনবাসে যেতে হলো। দৈত্যরাজ বলিকে পাতালে প্রবেশ করতে হলো। পঞ্চপাণ্ডবকে বনবাসে যেতে হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশও ধ্বংস হলো। নিষধরাজ নলকেও রাজ্যভ্রষ্ট হতে হলো। মহাপরাক্রমশালী রাবণের পতন হলো। ভুবনবিখ্যাত রাজা দশরথ, মাহারাজ সগর, ত্রিভুবন বিজয়ী মান্ধাতা, দেবরাজ নহুষ এদের কারোরই রাজ্যলক্ষ্মী স্থায়ী হয়নি। কাজেই মত্তহস্তীর মতো রাজ্যশ্রীকে ধরে রাখতে হলে ন্যায়শাস্ত্রে একনিষ্ঠ হয়ে রাজার কর্তব্য-কর্ম করতে হয় সুচারুরূপে।

লব্ধ-প্রণাশ তন্ত্রে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু রাজনৈতিক আলোচনা পাওয়া যায়। 'ব্যাঙ ও কেউটে' গল্পে ব্যাঙ রাজ গঙ্গদত্তকে দেখা যায়। সে ব্যাঙদের রাজা হিসেবে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কেউটেকে ডেকে এনে তার বিরোধী পক্ষকে ধ্বংস করে। এই গল্পে পঞ্চতন্ত্রকার বুঝাতে চেয়েছেন শত্রুর দ্বারা শত্রুকে ধ্বংস করার কৌশল। তবে এখানে সে খাল কেটে কুমির এনেছে। যদি সে শত্রুর দ্বারা শত্রুকে ধ্বংস করে নিজে নিরাপদ থাকতে পারত, তবে তার রাজনীতি সার্থক হতো। যেমন –

শত্রুভির্যোজয়েচ্ছত্রুং বলিনা বলবত্তরম্।
স্বকার্যায় যতো ন স্যাৎ কাচিৎ পীড়াত্র তৎক্ষয়ে॥
শত্রুমুন্মূলয়েৎ প্রাজ্ঞস্তীক্ষ্ণং তীক্ষ্ণেন শত্রুণা।
ব্যথাকরং সুখার্থায় কণ্টকেনেব কণ্টকম্॥৪/১৮-১৯

অর্থাৎ, নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুকে লাগিয়ে দেবে, বলবানের বিরুদ্ধে আরো বলবানকে। কেননা তাদের ধ্বংসে কিছুই এসে যায় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন পীড়াদায়ক ছুঁচলো কাঁটা আরেকটি ছুচোঁলো কাঁটা দিয়ে তুলে ফেলে আরাম পায়,

তেমনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পীড়াদায়ক প্রবল শত্রুকে আরেক প্রবল শত্রু দিয়ে উচ্ছেদ করে স্বস্তি পায়।

রাজনীতিতে সাম, দাম, ভেদ, দণ্ড সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। লব্ধ-প্রণাশ তন্ত্রে 'মরা হাতি শেয়াল' গল্পে শুধুমাত্র ভেদ নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন –

ন যত্র শক্যতে কর্ত্তুং সামদানমথাপি বা।
ভেদস্তত্র প্রয়োক্তব্যো যতঃ স বশকারকঃ॥৪/১০৭
উত্তমং প্রণিপাতেন শূরং ভেদেন যোজয়েৎ।
নীচমল্পপ্রদানেন সমশক্তিং পরাক্রমৈঃ ॥ ৪/১১০

অর্থাৎ, যেখানে চলে না সাম কিংবা দাম এমন কিছু, সেখানে প্রয়োগ করতে হবে ভেদনীতি। তাতেই শত্রু পরাস্ত হবে। উত্তমকে দিতে হবে প্রণিপাত আর অধমকে অল্প অল্প দান। শূরের প্রতি প্রয়োগ করতে হবে ভেদনীতি এবং পরাক্রম দেখাতে হয় সমপর্যায়ের শত্রুদের সাথে।

অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে 'তাঁতি ও মন্থরক' গল্পে তাঁতি রাজা হবে আর মন্থরক মন্ত্রী হবে। তারা দুজন রাজা ও মন্ত্রী হয়ে পরম আনন্দে রাজ্য ভোগ করবে এবং পরলোকেও সুখ ভোগ করবে। মন্থরকের উক্তিতে, যেমন –

রাজা ন্যায়পরো নিত্যমিহ কীর্তিমবাপ্য চ।
তৎপ্রভাবাৎ পুনঃ স্বর্গে স্পর্ধতে ত্রিদশৈঃ সহ॥৫/৫৯

অর্থাৎ, সর্বদা ন্যায়পরায়ণ রাজা ইহলোকে খ্যাতি লাভ করে। পরবর্তীতে তারাই স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের সঙ্গে পাল্লা দেয়।

একেই গল্পে তাঁতির স্ত্রীর উক্তিতে রাজা হওয়ার যে বিরম্বনা পঞ্চতন্ত্রকার সে বিষয়েও ধারণা দিয়েছেন। তবে পূর্বে রাজনীতিতে দ্বৈধীভাব প্রসঙ্গে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। যেমন –

যদৈব রাজ্যে ক্রিয়তেঽভিলাষস্তদৈব যাতি ব্যসনেষু বুদ্ধিঃ।
ঘটা নৃপাণামভিষেককালে সহাম্ভসৈবাপদমুদ্গিরন্তি॥
রামস্য ব্রজনং বলের্নিয়মনং পাণ্ডোঃ সুতানাং বনং
বৃষ্ণীনাং নিধনং নলস্য নৃপতে রাজ্যাৎ পরিভ্রংশনম্।
সৌদাসং তদবস্থমর্জুনবধং সঞ্চিন্ত্য লঙ্কেশ্বরং
দৃষ্ট্বা রাজ্যকৃতে বিড়ম্বনগতং তস্মান্ন তদ্ বাঞ্ছয়েৎ॥
যদর্থ ভ্রাতরঃ পুত্রা অপি বাঞ্ছন্তি যে নিজাঃ।
বধং রাজ্যকৃতে রাজ্ঞাং তদ্ রাজ্যং দূরতস্ত্যজেৎ ॥৫/৬৫-৬৭

অর্থাৎ, রাজ্যাভিলাষ হওয়া মানেই বিপদ ডেকে আনা। যেমন যখন অভিষেকের জলের কলস ঢালা হয়, সেই জলের সঙ্গেই বিপদ আসে। রামের বনবাস, বলির বন্দীদশা, পাণ্ডুসুতদের বনগমন, বৃষ্ণিবংশের সমূলে ধ্বংস, নলরাজার রাজ্যভ্রংশ, সৌদাসের সেই দশাটা, কার্তবীর্যাজুনের খুন, দশাননের সেই বিড়ম্বনা। এসব কিছুর কারণ তো রাজ্যই! ও কেউ চায় ! ভাই, এমন কি ছেলে, তথা আত্মীয়স্বজন যার জন্যে রাজাদের খুন করতে চায়, সে-রাজ্যকে দূর থেকে ত্যাগ করা উচিত।

পরবর্তীতে 'রাজা চন্দ্র ও বানরদলপতি' গল্পে পঞ্চতন্ত্রকার বোঝাতে চেয়েছেন, যে খারাপ রাজা সে তার রাজ্য জাহান্নামে নিয়ে যায় এবং সে রাজার যশ-খ্যাতি থাকে না। যেমন –

কলহান্তানি হর্ম্যাণি কুবাক্যান্তং চ সৌহৃদম্ ।
কুরাজান্তানি রাষ্ট্রাণি কুকর্মান্তং যশো নৃণাম্ ॥৫/৭২

অর্থাৎ, কু-রাজার রাজত্বে দেশ জাহান্নামে পতিত হয় এবং সেকারণে রাজ্যে কোনো সুনাম থাকে না । যেমন কলহের কারণে বড়ো বড়ো বাড়ি-দালানকোঠা শেষ হয়। তেমনি কুবাক্যেও বন্ধুত্ব-ভাব নষ্ট হয়ে যায়।

একই গল্পে রাজা চন্দ্র রত্নমালার লোভে পরে বানর সর্দারের মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে সপরিবারে তা সংগ্রহ করতে যায়। পরে তার পরিবারের চরম

ক্ষতি সাধিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চতন্ত্রকার রাজা হলে তাঁদের লোভ কিভাবে বাড়তে থাকে, সে সম্পর্কে নিম্নোক্ত শ্লোকটির অবতারণা করেছেন। যেমন –

ইচ্ছতি শতী সহস্রং সহস্রী লক্ষমহতে ।
লক্ষাধিপস্তথা রাজ্যং রাজ্যস্থঃ স্বর্গমীহতে ॥৫/৭৮

অর্থাৎ, শত যার আছে, সে চায় হাজার। হাজারী- সে লাখ চায়। লাখপতি চায় রাজ-রাজত্ব। রাজা- সে স্বর্গ চায়।

এভাবে পঞ্চতন্ত্রকার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কি-কি নীতি প্রয়োগ করতে হয় সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে তিনি ষড় গুণ – সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব এবং সাম, দাম, ভেদ, দণ্ড সম্পর্কে যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এই আধুনিক যুগেও এ সমস্ত নীতির প্রয়োগ করলে রাষ্ট্র অনেকটাই নিষ্কণ্টক থাকবে।

মন্ত্রীর ধর্ম

পঞ্চতন্ত্র নীতিশিক্ষামূলক রাজনৈতিক গ্রন্থ হিসেবে এর প্রত্যেক তন্ত্রেই মন্ত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। মহামতি বিষ্ণুশর্মা মন্ত্রীদের কি করণীয়, কি দায়িত্ব-কর্তব্য, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তিনি রাজধর্মে মন্ত্রীদের উপদেশ বা মন্ত্রণা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। মিত্রভেদের প্রথমেই দেখা য়ায় দমনক ও করটক দুই জনই মন্ত্রিপুত্র। মন্ত্রী হিসেবে যারা রাজকার্যে কর্মরত ছিল। পরে চাকরি হারিয়ে বেকারভাবে কাটায়। তারা চেষ্টা করছে কীভাবে রাজাকে সন্তুষ্ট করে পূর্বের পদ ফিরে পাওয়া যায়। তখন বুদ্ধির জোরে দমনক মন্ত্রিত্ব ফিরে পেল। মন্ত্রীদের গুরুত্ব প্রকাশ করতে পঞ্চতন্ত্রকার বলেছেন – যে রাজা নীচ ব্যক্তির অনুবর্তী হয়ে মন্ত্রীদের উপদেশ শোনেন না, তিনি নানা বিপত্তিতে পড়েন, ফলে রাজ্যে নানা অনর্থের সৃষ্টি হয়। তারপরও রাজারা বস্তুত সংকটে না পড়লে মন্ত্রীদের উপদেশ শোনেন না। বিষ্ণুশর্মা এ প্রসঙ্গে দমনকের উক্তিতে নিম্নোক্ত কথা বলেছেন –

ন কৌলীন্যান্ন সৌহার্দান্নৃপো বাক্যে প্রবতর্তে।
মন্ত্রিণাং যাবদাপ্তং ন ব্যসনং শোক এব চ॥১/১১৭

অর্থাৎ, হাজার কুলীন হোক, হাজার বন্ধু হোক, রাজা মন্ত্রীর কথা কানে নেন না। নেন তখন, যখন বিপদে পড়েন, কিংবা দুঃখ পান।

বিপরীতভাবে মন্ত্রীরাও রাজারা বিপদে পড়লে মনে মনে আনন্দ পান, কেননা তখনই তাদের সম্মান বেড়ে য়ায়। রাজার সুখের দিনে তাদের কদর কম। তাই বলা হয়েছে –

সদৈবাপদ্গতো রাজা ভোগ্যো ভবতি মন্ত্রিণাম্
অতএব হি বাঞ্ছন্তি মন্ত্রিণঃ সাপদং নৃপম্॥
যথা নেচ্ছতি নীরোগঃ কদাচিৎ সুচিকিৎসকম্।
তথাপদ্রহিতো রাজা সচিবং নাভিবাঞ্ছতি ॥১/১১৮-১১৯

অর্থাৎ, রাজা বিপদে হাবুডুবু খেলেই মন্ত্রীদের মজা। তাই মন্ত্রীরা চায়, রাজা বিপদে পড়ুক। যার রোগ নেই সে কখনোই ভালো ডাক্তার চায় না। আর যে রাজার বিপদ নেই, তারই বা ভালো মন্ত্রীর কী প্রয়োজন।

মিত্রভেদ তন্ত্রে দমনক যখন পিঙ্গলককে সঞ্জীবকের সম্পর্কে তথ্য দিয়ে অভয় দিল, তখন পিঙ্গলক মন্ত্রিত্বের প্রশংসাস্বরূপ নিম্নোক্ত উক্তিটি ব্যক্ত করে –

অন্তঃসারৈরকুটিলৈরচ্ছিদ্রৈঃ সুপরীক্ষিতৈঃ।
মন্ত্রিভির্ধার্যতে রাজ্যং সুস্তম্ভৈরিব মন্দিরম্ ॥
মন্ত্রিণাং ভিন্নসন্ধানে ভিষজাং সান্নিপাতিকে ।
কর্মণি ব্যজ্যতে প্রজ্ঞা স্বস্থে কো বা ন পণ্ডিতঃ॥১/১২৭-১২৮

অর্থাৎ, ভালো করে পরীক্ষা করা শক্তিশালী সোজা সোজা সুন্দর সুন্দর থাম যেমন ধরে থাকে একটা বাড়িকে, তেমনি রাজ্যকে ধরে থাকে সেইসব মন্ত্রী, যাদের ভেতরটা অটল, যারা বাঁকা নয়, যাদের ভেতর কোনো ছিদ্র নেই বা দুর্বলতা নেই এবং যাদের ভালো করে যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীর বিচক্ষণতার পরীক্ষা তখনই হয় যখন সন্ধি ভাঙে। বৈদ্যের পরীক্ষা সান্নিপাতিকে। তবে সব ঠিকঠাক থাকলে কে না পণ্ডিত ?

'দন্তিল ও গোরম্ভ' গল্পে মন্ত্রিভ্রাতা করটক বলছে রাজার কাজ-কর্মে রাজ্যে যদি অনর্থ হতে চলে তখন মন্ত্রীর পরামর্শ শুনতে রাজী না হলেও নিজের থেকেই মন্ত্রীর উচিত রাজাকে পরামর্শ দেওয়া । তা না হলে দোষ গিয়ে মন্ত্রীর উপরই বর্তায়। যেমন –

অশৃণ্বন্নপি বোদ্ধব্যো মন্ত্রিভিঃ পৃথিবীপতিঃ।
যথা স্বদোষনাশায় বিদুরেণাম্বিকাসুতঃ॥
মদোন্মত্তস্য ভূপস্য কুঞ্জরস্য চ গচ্ছতঃ।
উন্মার্গং বাচ্যতাং যান্তি মহামাত্রাঃ সমীপগাঃ॥১/১৬১-১৬২

অর্থাৎ, রাজা যদি কর্ণপাত নাও করেন, তবু মন্ত্রীদের বলতে হয়, যাতে মন্ত্রীর ওপর দোষ না পড়ে, যেমন বিদুর বলতেন অম্বিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে। মদোন্মত্ত রাজা এবং হাতি যখন উল্টো রাস্তায় চলে, তখন দোষ হয় যারা কাছাকাছি থাকে সেই সব মন্ত্রীদের এবং মাহুতদের।

রাজা মন্ত্রীদের সাথে যে মন্ত্রণা করবেন তা কখনও ফাঁস করা উচিত নয়। কেননা তিনি যদি মন্ত্রণা ফাঁস করে দেন তাহলে সে নরকগামী হবেন এবং সেই মন্ত্রীকে পঞ্চতন্ত্রকার ঘাতক বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন –

যো মন্ত্রং স্বামিনো ভিন্দ্যাৎ সচিবো সংনিয়োজিতঃ।
স হত্বা নৃপকার্যং তৎ স্বয়ং চ নরকং ব্রজেৎ॥
যেন যস্য কৃতো ভেদঃ সচিবেন মহীপতেঃ।
তেনাশস্ত্রবধস্তস্য কৃত ইত্যাহ নারদঃ॥১/২৭৫-২৭৬

অর্থাৎ, মন্ত্রীর পদে বসে কেউ যদি প্রভুর মন্ত্রণা ফাঁস করে দেয়, তাহলে সে রাজার কাজ তো নষ্ট করলই, উপরন্তু নিজেকেও নরকগামী করল। মন্ত্রী রাজার মন্ত্রণা ফাঁস করলে, তা হয় মূলত বিনা অস্ত্রে হত্যা করার শামিল।

সর্বদা মন্ত্রীদের উচিত যুদ্ধ এড়িয়ে বুদ্ধিবলে কার্য সাধন করা। দমনক যখন মিথ্যা বলে সঞ্জীবক ও পিঙ্গলকের সাথে বন্ধুত্ব ভেঙে দিতে চাইছে, তখন করটকের উক্তিতে বিষ্ণুশর্মা শান্তিপূর্ণভাবে মন্ত্রীদের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথা বলেছেন। যেমন –

কার্যাণ্যুত্তমদণ্ডসাহসফলন্যায়সসাধ্যানি যে
বুদ্ধ্যা সংশময়ন্তি নীতিকুশলাঃ সাম্নৈব তে মন্ত্রিণঃ।
নিঃসারাল্পফলানি যে ত্ববিধিনা বাঞ্ছন্তি দণ্ডোদ্যমৈ-
স্তেষাং দুর্নয়চেষ্টিতৈর্নরপতেরারোপ্যতে শ্রীস্তুলাম্ ॥১/৩৮০
মন্ত্রিণাং ভিন্নসন্ধানে ভিষজাং সান্নিপাতিকে।
কর্মণি ব্যজ্যতে প্রজ্ঞা স্বস্থে কো বা ন পণ্ডিতঃ॥১/৩৮৫

অর্থাৎ, অনায়াসে যা হবার নয়, রীতিমতো অস্ত্রব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি নিতে হয়, এ কথা ঠিক কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেও যে সব রাজনীতিকুশল ব্যক্তিরা বুদ্ধিবলে অহিংস উপায়ে মীমাংসা করেন, তাঁরাই হলেন বুদ্ধিমান মন্ত্রী। আর যেসব ক্ষেত্রে ফল অতি অল্প বা সামান্য, সেগুলি যাঁরা ভুল নীতি প্রয়োগ করে সহিংসভাবে সিদ্ধ করতে চান, তাঁদের সেই কুনীতি-প্রসূত কাজকর্মের ফলে রাজার লক্ষ্মী চিরতরে বিদায় নেয়। মূলত রাজ্যে যখন সন্ধি ভাঙ্গে তখন মন্ত্রীর বিচক্ষণতার পরীক্ষা হয়। যেমন বৈদ্যের পরীক্ষা হয় রোগের চিকিৎসায়। তা না হলে সব ঠিকঠাক থাকলে কে না পণ্ডিত।

যে রাজার অসৎ মন্ত্রী থাকে সে রাজা গুণবান হলেও লোকে সে রাজ্যে যেতে চায় না। মন্ত্রীদের সততার উপর দেশের সুনাম নির্ভর করে। সৎনীতি যে মন্ত্রীরা পরিহার করে তারা শত্রুরূপধারী। নিম্নোক্তভাবে পঞ্চতন্ত্রকার করটকের উক্তিতে বলেছেন –

গুণালয়েঽপ্যসন্মন্ত্রী নৃপতির্নাধিগম্যতে।
প্রসন্নস্বাদুসলিলো দুষ্টগ্রাহো যথা হ্রদঃ॥১/ ৩৮৮
মন্ত্রিরূপা হি রিপবঃ সম্ভাব্যাস্তে বিচক্ষণৈঃ।
যে সন্তং নয়মুৎসৃজ্য সেবন্তে প্রতিলোমতঃ॥৩/১৯৭

অর্থাৎ, যে রাজার মন্ত্রীরা অসৎ, তিনি গুণের আধার হলেও তাঁর কাছে যাওয়া যায় না। যেমন পরিষ্কার সুস্বাদু জল হলেও দুষ্ট কুমির থাকলে সে হ্রদে যাওয়া যায় না। অপরপক্ষে যে মন্ত্রীরা সৎ নীতি পরিহার করে বিপরীতভাবে রাজার স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করে, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তাদেরকে মুখোশধারী শত্রু বলে মনে করবেন।

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, এখানে মন্ত্রীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কাকরাজ মেঘবর্ণ বিশাল রাজত্ব পাওয়ার পরও তার মনে সুখ নেই, কেননা পেঁচারাজ প্রতিরাতে তার দুর্গে আক্রমণ করে কাকশূন্য করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় কাকরাজ তার পাঁচ মন্ত্রীদের নিয়ে মন্ত্রণায় বসল। পেঁচারাজও তার পাঁচ মন্ত্রীদের সাথে মন্ত্রণা করে। নিম্নোক্তভাবে পঞ্চতন্ত্রকার কাকোলূকীয় তন্ত্রে মন্ত্রীদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। যেমন –

অপৃষ্টেনাপি বক্তব্যং সচিবেনাত্র কিঞ্চন।
পৃষ্টেন ত্বরিতং পথ্যং বাচ্যং চ প্রিয়মপ্রিয়ম্॥
যো ন পৃষ্টো হিতং ব্রুতে পরিণামে সুখাবহম্।
মন্ত্রী চ প্রিয়বক্তা চ কেবলং স রিপুঃ স্মৃতঃ॥
সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥
তস্মাদেকান্তমাসাদ্য কার্যো মন্ত্রো মহীপতে।
যেন তস্য বয়ং কুর্মো নিয়মং কারণং তথা ॥৩/৪-৭

অর্থাৎ, রাজ্যে সঙ্কটকালে রাজা কিছু না শুধালেও মন্ত্রীর কিছু বলা উচিত। শুধালে তো অপ্রিয় বা প্রিয় যা হিতকর যে বক্তব্যই হোক বলবেন। পৃষ্ট হয়েও যে বলে না যা হিতকর, অপরদিকে যে মন্ত্রীরা কেবল অহিতকর প্রিয় কথা বলে, তাদের মতো শত্রু আর নেই। প্রিয় কথা বলা লোক ঢের পাওয়া যায়। কিন্তু সদুপদেশ, হিতকর তেতো ওষুধের মতো অপ্রিয় কথা কয়জন বলেন। তাই চলুন রাজন্, যাই নিভৃতে, যুক্তি করি- সবাই মিলে, কেমন করে এ আক্রমণ ঠেকানো যায় ।

এমনিভাবে রাষ্ট্রের সংকটে মন্ত্রীদের যা হিতকর প্রিয় হোক, অপ্রিয় হোক তা বলতে হবে। মূলত রাজাকে খুশি করার জন্য অহিতকর কথা বলা যাবে না।

একই তন্ত্রে পেঁচারাজের মন্ত্রী রক্তাক্ষের উক্তিতে পঞ্চতন্ত্রকার মন্ত্রীকে দূরদর্শী হওয়ার কথা বলেছেন –

ন দীর্ঘদর্শিনো যস্য মন্ত্রিণঃ স্যুর্মহীপতেঃ।

ক্রমায়াতা ধ্রুবং তস্য ন চিরাৎ স্যাৎ পরীক্ষয়ঃ॥৩/১৯৬

অর্থাৎ, যে রাজার কুলমন্ত্রীরা দূরদর্শী নয়, তিনি অচিরেই বিনষ্ট হন, তাতে আর সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী স্থিরজীবীর পরামর্শে রাজা মেঘবর্ণ যখন শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করে পরস্পর আলোচনা করতে বসল, তখন স্থিরজীবী শত্রুপক্ষের মন্ত্রীদের মূর্খতা ও অসাবধানতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করলেন –

সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন রোগা
দুর্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি ন নীতিদোষাঃ ।
কং শ্রীর্ন দর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ
কং স্বীকৃতা ন বিষয়াঃ পরিপীড়য়ন্তি॥
লুব্ধস্য নশ্যতি যশঃ পিশুনস্য মৈত্রী
নষ্টক্রিয়স্য কুলমর্থপরস্য ধর্মঃ।
বিদ্যা চ কুব্যসনিনঃ কৃপণস্য সৌখ্যং
রাজ্যং প্রমত্তসচিবস্য নরাধিপস্য॥৩/২১১-২১২

অর্থাৎ, অপথ্য খেলে যেমনি রোগযন্ত্রণা বাড়ে তেমনি বুদ্ধিহীন, অসৎ মন্ত্রীর দ্বারা রাজার রাজ্য ভালো থাকেনা। সমৃদ্ধি সকলকে গর্বিত করে, মৃত্যু সকলকে যেভাবে মারে, তেমনি সম্পদের যন্ত্রণা সকল বিষয়ীর থাকে। নেশায় আসক্ত ব্যক্তির বিদ্যা-বুদ্ধি থাকে না, কৃপণের মনে সুখও থাকে না, লোভীর সুনাম থাকে না, খলের বন্ধুত্ব হয় না, তেমনি ক্রিয়াহীন লোকের কুল ও ধর্ম থাকে না। এমনিভাবে যে রাজার মন্ত্রী অসাবধান তার রাজ্য থাকে না।

শত্রুতা

মিত্রভেদে পঞ্চতন্ত্রকার শত্রুদের থেকে সাবধান হতে বলেছেন। রাজার শত্রু থাকবে এটাই স্বাভাবিক, তবে শত্রুকে কখনও ছোট করে দেখা ঠিক নয়। শত্রুর ভিতরের খবর জেনে সেভাবে মোকাবেলা করতে হয়। যেমন –

উপক্ষিতঃ ক্ষীণবলোঽপি শত্রুঃ প্রমাদদোষাৎ পুরুষৈর্মদান্ধৈঃ।
সাধ্যোঽপি ভূত্বা প্রথমং ততোঽসাবসাধ্যতাং ব্যাধিরিব প্রয়াতি॥
অবিদিত্বাত্মনঃ শক্তিং পরস্য চ সমুৎসুকঃ।
গচ্ছন্নভিমুখো বহ্নৌ নাশং যাতি পতঙ্গবৎ॥১/২৩৮-২৪০

অর্থাৎ, দুর্বল শত্রুকেও মদান্ধ পুরুষ যদি ও কিছু নয় ভেবে ভুল করে অগ্রাহ্য করে, তাহলে সে প্রথমে আয়ত্তের মধ্যে থাকলেও পরে অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়, ছোটো-খাটো রোগকে প্রাথমিকভাবে উড়িয়ে দিলে যা হয়। নিজের এবং শত্রুর শক্তি না জেনেই যে তড়াহুড়ো করে শত্রুর সামনে ধেয়ে যায়, সে আগুনে পতঙ্গের মতো মরা যায়।

কাকোলূকীয় তন্ত্রে শত্রুতার বিষয়ে বিভিন্ন গল্পে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। কাল বিলম্ব না করে শত্রুকে ধ্বংস করতে হয়। শত্রুর গুপ্তচরের থেকে সাবধান হয়ে এবং প্রজ্ঞা দ্বারা শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়। যেমন –

জাতমাত্রং ন যঃ শত্রুং ব্যাধিং চ প্রশমং নয়েৎ।
মহাবলোঽপি তেনৈব বৃদ্ধিং প্রাপ্য স হন্যতে ॥ ৩/৩
অরিতোঽভ্যাগতো ভৃত্যো দুষ্টস্তৎসঙ্গতৎপরঃ।
অপসর্পঃ স ধর্মত্বান্নিত্যোদ্বেগী চ দূষিতঃ॥৩/২০৮
শস্ত্রৈর্হতা ন হি হতা রিপবো ভবন্তি প্রজ্ঞাহতাস্তু রিপবঃ সুহতা ভবন্তি।
শস্ত্রং নিহন্তি পুরুষস্য শরীরমেকং প্রজ্ঞা কুলং চ বিভবং চ যশশ্চ হন্তি॥৩/২২২

অর্থাৎ, জন্মমাত্র শত্রু কিংবা ব্যাধিকে নির্মুল না করলে, সে-ই বেড়ে শক্তিশালী হয়ে পরবর্তীতে আক্রমণ করে। শত্রুর পক্ষ থেকে তাদের পক্ষে আগ্রহী হয়ে যোগ দিতে এসেছে যে সেবক, সে হচ্ছে গুপ্তচর, তার কাজই হচ্ছে ওই। সে লোক ভালো নয়, সবসময়ই উদ্বেগের কারণ। অস্ত্রের আঘাতে রিপু মরেও মরে না। প্রজ্ঞার আঘাতেই রিপু মরে। অস্ত্র মারে শুধুমাত্র পুরুষের দেহ। কুল যশ ঐশ্বর্য সব মারে প্রজ্ঞা।

লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে 'ব্যাঙ ও কেউটে' গল্পে শত্রুর আক্রমণে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে প্রাণ যায়যায় অবস্থা। তখন শত্রুকে রাগান্বিত না করে প্রাণে বাঁচার জন্য বিষ্ণুশর্মা অল্প অল্প উপহার দিয়ে হলেও খুশি করার কথা বলেছেন। যেমন –

সর্বস্বহরণে যুক্তং শত্রুং বুদ্ধিযুতা নরাঃ।
তোষয়ন্ত্যল্পদানেন বাড়বং সাগরো যথা॥৪/২৬

অর্থাৎ, শত্রু সমুদ্যত হলে সর্বস্বহরণে বুদ্ধিমান তাকে অল্প অল্প দানে তুষ্ট করেন, যেমন সাগর বাড়ব-অনল অল্প অল্প জল দিয়ে তোষে।

রাষ্ট্রনীতিতেও এই পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যখন শক্তি-সামর্থ্য কম, জীবন সংকটাপন্ন এমতাবস্থায় শত্রুকে যেকোনোভাবে বশীভূত করতে হয়, পরবর্তীতে শক্তি সঞ্চয় করে যথার্থভাবে মোকাবেলা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

যুদ্ধ

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে যখন চরম মতানৈক্য বিরাজ করে তখন যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। যুদ্ধে চরম সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও প্রাণহানিও ঘটে থাকে। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পঞ্চতন্ত্রে বহুগল্পে এ রকম ঘটনা রয়েছে। মিত্রভেদে দমনক বনের রাজা পিঙ্গলক ও সঞ্জীবকের সাথে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রথমে বন্ধুত্ব করে দিয়ে পরে কুপরামর্শ দিয়ে বন্ধুত্ব ভেঙে দেয়। যার জন্য পিঙ্গলক ও সঞ্জীবকের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাঁধে। তাতে সঞ্জীবকের মৃত্যু হয়। পঞ্চতন্ত্রকার এ রকম যুদ্ধের পরিস্থিতি বিভিন্ন গল্পে দেখিয়েছেন। দমনক ও করটকের রাজনৈতিক আলোচনায় নিম্নোক্তভাবে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। যেমন–

চিত্রাস্বাদকথৈর্ভূত্যৈরনায়াসিতকার্মুকৈঃ।
যে রমন্তে নৃপাস্তেষাং রমন্তে রিপবঃ শ্রিয়া॥১/৩৮৯

অর্থাৎ, যে রাজা বিচিত্র স্বাদের বিবিধ রকম খাদ্যে এবং কথায় ওস্তাদ, কিন্তু কখনো ধনুকটিকে কষ্ট দেয়নি অর্থাৎ, শুধুমাত্র ভোজনরসিক, যুদ্ধরসিক নয়, সে সব ভৃত্যদের নিয়ে আনন্দে থাকে, তার শ্রী-সম্পদ নিয়ে শত্রুরা আনন্দ করে ।

তবে যুদ্ধে যদি লাভ না হয় সে যুদ্ধ পরিহারের কথাও তিনি বলেছেন। যেমন –

ভূমির্মিত্রং হিরণ্যং চ বিগ্রহস্য ফলত্রয়ম্।
নাস্ত্যেকমপি যদ্যেষাং ন তং কুর্যাৎ কথঞ্চ॥
যত্র ন স্যাৎ ফলং ভূরি যত্র চ স্যাৎ পরাভবঃ।
ন তত্র মতিমান্ যুদ্ধং সমুৎপাদ্য সমাচরেৎ॥১/২২৯-২৩০

অর্থাৎ, যুদ্ধ করলে যদি জমি-বন্ধু-সোনাদানা এই তিনটির একটিও না মেলে তবে যুদ্ধ করে লাভ নেই। অপরদিকে যেখানে বেশি লাভের আশা নেই, শুধু অপদস্থ হতে হবে সেখানে বুদ্ধিমান যুদ্ধ অপ্রয়োজনীয় মনে করেন।

কাকোলূকীয় তন্ত্রে বলা হয়েছে, যুদ্ধ শুরুর আগে প্রতিপক্ষের শক্তি জেনে নিতে হয়। প্রতিপক্ষ যদি বেশি শক্তিমান হয়ে থাকে তাহলে যুদ্ধে নামা ঠিক নয়। তাহলে দুর্বলকেই মরতে হয়। যেমন –

সমং শক্তিমতা যুদ্ধমশক্তস্য হি মৃত্যবে।
দৃষৎকুম্ভং যথা ভিত্ত্বা তাবৎ তিষ্ঠতি শক্তিমান্॥৩/১৫

অর্থাৎ, শক্তিমানের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্বলই মরে। শক্তিমান অনড় দাঁড়িয়ে থাকে, কলসী ভেঙে ফেলে পাথরের মতো শক্তি দিয়ে।

লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে 'সিংহ সিংহী ও শেয়াল বাচ্চা' গল্পে বিভিন্ন সমর কৌশলের উল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চতন্ত্রকারের মতে যুদ্ধের সময়ে মনোবল ঠিক রাখাই আসল কথা। এজন্য একজনকে হলেও নেতৃত্ব দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। যদি এমনটি করা হয় তাহলে অন্য যোদ্ধারাও উৎসাহিত হয়। আর একজন ছত্রভঙ্গ দিলে পরাজয় নিশ্চিত। অপরদিকে যে ভয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে পিছু হটে তাকে বর্জন করতে হবে। এছাড়া তিনি আরও বলেছেন যুদ্ধে জয় পরাজয় যা হোক না কেন তাতে ক্ষতি নেই। কেননা যুদ্ধে জয়ী হলে সম্পত্তি পাবে আর মারা গেলে স্বর্গ সুখ ভোগ করবে।

যেমন –

একেনাপি সুধীরেণ সোৎসাহেন রণং প্রতি।
সোৎসাহং জায়তে সৈন্যং ভগ্নে ভঙ্গমবাপ্নুয়াৎ॥
অত এব হি বাঞ্ছন্তি ভূপা যোধান্ মহাবলান্।
শূরান্ ধীরান্ কৃতোৎসাহান্ বর্জয়ন্তি চ কাতরান্ ॥৪/৪২-৪৩
হতস্ত্বং প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জীবন্ গৃহমথোপি বা।
যুধ্যমানস্য তে ভাবি গুণদ্বয়মনুত্তমম্॥৪/১০৪

অর্থাৎ, একজনও যদি যুদ্ধে উৎসাহিত হয়ে ধীরস্থির থাকে, তাহলে সমস্ত সৈন্যই উৎসাহ পায়। আর একজন ছত্রভঙ্গ দিলেই সব বিনষ্ট হয়ে যায়। এ জন্যই রাজারা মহাবল, বীর, ধীর, উৎসাহী যোদ্ধাদের চান এবং ভীরুদের বর্জন করেন। মরলে স্বর্গ পাবে, আর যদি বাঁচ তবে ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ পাবে। যুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী দুটি লাভ হয় – এর চেয়ে অধিক আর কি দরকার।

পরবর্তীতে পঞ্চতন্ত্রকার সাম-দাম-দণ্ড -ভেদ নীতির কথা বলেছেন। তবে তাঁর আগে চাণক্য এ নীতির কথা বলেছেন। সাম-দাম-দণ্ড -ভেদ যুদ্ধের এই কৌশল পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করতে হয়। উত্তমকে সাম নীতির মাধ্যমে বশে আনতে হয়, অধমের প্রতি দাম আর শূরের প্রতি ভেদ নীতি দরকার। কেননা শত্রু যদি শক্তিশালী হয় তাহলে সাম, দামে কাজ হয়না, সেখানে ভেদনীতি প্রয়োগ করতে হয়। যেমন –

উত্তমং প্রণিপাতেন শূরং ভেদেন যোজয়েৎ।
নীচমল্পপ্রদানেন সমং তুল্যপরাক্রমৈঃ॥৪/১০৫

অর্থাৎ, উত্তমকে প্রণিপাত করে বশ করতে হয় এবং অধমকে অল্পদান দিয়ে আর শূরের প্রতি ভেদনীতি প্রয়োগ করে সমান পরাক্রম দেখাতে হয়।

মূলত এগুলো হলো যুদ্ধে জয়ী হওয়ার কৌশল।

বিশ্বাস-অবিশ্বাস

পঞ্চতন্ত্রে রাজনৈতিক বিষয় আলোচনায় বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে বিষ্ণুশর্মা নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি কখনও বিশ্বাস করার কথা বলেছেন, আবার কখনও বিশ্বাস করা ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। মিত্রভেদ নামক তন্ত্রে বনের রাজা পিঙ্গলক সঞ্জীবককে দেখে মনে অনেক ভয় পেল এ অবস্থায় তার ভয় নিরসনের জন্য দমনক এগিয়ে এল। দমনকের কথা সে কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছে না। দমনক ছলে-বলে-কৌশলে বিশ্বাস করিয়েই ছাড়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্তভাবে পঞ্চতন্ত্রকার বিশ্বাস না করার কথা বলেছেন। যেমন –

ন বধন্তে হ্যবিশ্বস্তা বলিভির্দুর্বলা অপি।
বিশ্বস্তাস্ত্বেব বধ্যন্তে বলবন্তোঽপি দুর্বলৈঃ॥১/১১৪
ন বিশ্বাসং বিনা শক্রর্দেবানামপি সিধ্যতি।
বিশ্বাসাৎ ত্রিদশেন্দ্রেণ দিতের্গর্ভো বিদারিতঃ॥১/১১৬

অর্থাৎ, যারা যাকে-তাকে বিশ্বাস করে, তারা বলবান হলেও দুর্বলরা তাদের মেরে ফেলে। যে বিচক্ষণ ব্যক্তি সুখ সমৃদ্ধি আয়ু চায়, সে বৃহস্পতিকেও বিশ্বাস করবে না। অপরদিকে শত্রুকে বাগে আনতে হলে অবশ্যই তাকে বিশ্বাস অর্জন করাতে হবে। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র বিশ্বাস অর্জন করে তবেই দিতির গর্ভ বিদীর্ণ করেছিলেন।

আবার মিত্রপ্রাপ্তি নামক তন্ত্রে 'হরিণ কচ্ছপ ইঁদুর কাক' গল্পে বিষ্ণুশর্মা বিশ্বাসকেই অনেক বড় করে দেখিয়েছেন। বিপরীত গোত্রের দুটি প্রাণী কাক ও ইঁদুরের সাথে পরস্পর বিশ্বাসের মাধ্যমে বন্ধুত্ব দেখিয়েছেন এবং সে বন্ধুত্ব অটুটও ছিল। এখানে বিশ্বাসই বড় সম্পদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন –

বিশ্বাসঃ সম্পদাং মূলং তেন যূথপতির্গজঃ।
সিংহো মৃগাধিপতেঽপি ন মৃগৈঃ পরিবার্যতে॥২/২৩

অর্থাৎ, সকল সম্পদের মূলে বিশ্বাস, হাতি তাই যূথের সর্দার। সিংহ পশুরাজ, তবু পশু তাকে ঘিরে থাকে কই আর?

পরবর্তীতে বিষ্ণুশর্মা বুঝিয়েছেন কখনোই কাউকে বিশ্বাস করবে না। কেননা বিশ্বাস থেকেই ভয় আসে। যেমন –

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তেঽপি ন বিশ্বসেৎ।
বিশ্বাসাদ্ ভয়মুৎপন্নং মূলান্যপি নিকৃন্ততি॥২/৪৩
ন বধ্যতে হ্যবিশ্বস্তো দুর্বলোঽপি বলোৎকটৈঃ।
বিশ্বস্তাশ্চাশু বধ্যন্তে বলবন্তোঽপি দুর্বলৈঃ॥২/৪৪
মহতাপ্যর্থসারেণ যো বিশ্বসিতি শত্রুষু ।
ভার্যাসু সুবিরক্তাসু তদন্তং তস্য জীবিতম্ ॥২/৪৬
ন বিশ্বসেৎ পূর্ববিরোধিতস্য শত্রোশ্চ মিত্রত্বমুপাগতস্য।
দগ্ধাং গৃহাং পশ্য উলূকপূর্ণাং কাকপ্রণীতেন হুতাশনেন ॥৩/১

অর্থাৎ, অবিশ্বস্তকেও বিশ্বাস করবে না, বিশ্বস্তকেও বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস থেকেই ভয়ের কারণ উৎপন্ন হয়ে মূলসুদ্ধ কেটে দেয়। যে কাউকে বিশ্বাস করে না, সে দুর্বল হলেও প্রচণ্ড বলবানরাও তাকে ধ্বংস করতে পারে না। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে তারা বলবান হলেও দুর্বলের হাতে ধ্বংস হয়। যে ব্যক্তি শত্রুকে কিংবা যার প্রেম একেবারেই চুকে গেছে এমন ভার্যাকে বিশ্বাস করে, অঢেল টাকা থাকলেও তার জীবন ঐখানেই শেষ। অপরদিকে যার সঙ্গে আগে বিরোধ হয়েছে তাকে বিশ্বাস করা ঠিক না, কিংবা শত্রু যদি মিত্র হয়ে থাকে তাকেও না। যেমন করে পেঁচায়-ভর্তি গৃহা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল কাক।

লব্ধ-প্রণাশ তন্ত্রে বিশ্বাসঘাতকতার চরম দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমে রক্তমুখ ও করালমুখের মধ্যে পরম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। একে অপরের গভীর বিশ্বাসে পরমানন্দে দিন কাটাতে থাকে। পরে করালমুখ একদিন স্ত্রীর প্ররোচনায় রক্তমুখের কলজে খেতে চাইল। তাই হত্যার উদ্দেশ্যে গভীর সমুদ্রে নিয়ে চলল। সেখান থেকে বুদ্ধির জোরে রক্তমুখ নিজেকে রক্ষা করল। পরবর্তীতে আবার ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। তখন রক্তমুখ তাকে ধমক দিল এবং স্ত্রীকে বিশ্বাস করতে নিষেধ করে নিম্নোক্ত মন্তব্য করল –

সকৃদুষ্টং চ যো মিত্রং পুনঃ সন্ধাতুমিচ্ছতি।
স মুত্যুমুপগৃহ্নাতি গর্ভমশ্বতরী যথা॥৪/১৫
যদর্থং স্বকুলং ত্যক্তং জীবিতার্ধং চ হারিতম্ ।
সা মাং ত্যজতি নিঃস্নেহা কঃ স্ত্রীণাং বিশ্বসেন্নরঃ॥৪/৯৮

অর্থাৎ, একবার বিশ্বাস ভেঙেছে যে, সে-বন্ধুর সঙ্গে চায় আবার মিলন- সে ধরে মৃত্যুকে আঁকড়ে, অশ্বতরী গর্ভকে যেমন। যার জন্যে কুল, আত্মীয়স্বজন এবং যাকে অর্ধেক জীবন দান করেও ভালোবাসা পাওয়া গেল না, তাহলে সে স্ত্রীলোককে কে আর বিশ্বাস করবে?

বুদ্ধি

রাজনীতিতে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পঞ্চতন্ত্রকার রাজকুমারদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিকাশের জন্য বিভিন্ন গল্প ও নীতি শ্লোকের প্রয়োগ করেছেন। মিত্রভেদের প্রথমেই উল্লেখ করেছেন বুদ্ধিতে হয় না এমন কোনো কাজ নেই। বুদ্ধিমান বিদ্বানেরা চিন্তা করে যে নীতি উদ্ভাবন করেন, তা কখনো ব্যর্থ হয় না।[১৭] দমনকের উক্তিতে যেমন –

ন তচ্ছস্ত্রৈর্ন নাগেন্দ্রৈর্ন হয়ৈর্ন পদাতিভিঃ।
কার্যং সংসিদ্ধিমভ্যেতি যথা বুদ্ধ্যা প্রসাধিতম্॥১/১২৫

অর্থাৎ, সেরা সেরা হাতি, ঘোড়া, পদাতিক ও অস্ত্রশস্ত্রবলে যে কাজ হয় না, বুদ্ধিবলে তা অনায়াসেই করা যায়।

দমনক পিঙ্গলক ও সঞ্জীবকের সাথে বন্ধুত্ব করিয়ে দেয়, পরবর্তীতে দমনক দেখে এর ফলে তার কোনো লাভ হচ্ছে না। বরং তাদের গভীর সখ্য দেখে সে হিংসায় জ্বলে ওঠে। তাই তাদের বন্ধুত্ব ভাঙার জন্য নানা ধরনের বুদ্ধি আটে। যেমন –

একং হন্যান্ন বা হন্যাদিষুর্মুক্তো ধনুষ্মতা।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতোৎসৃষ্টা হন্তি রাষ্ট্রং সরাজকম্॥১/২০৯

অর্থাৎ, ধানুকী যখন তীর ছোঁড়ে, তখন কেউ মরতে পারে, নাও পারে, ঠিক নেই। কিন্তু বুদ্ধিমানে বুদ্ধি ছাড়লে সাবাড় হবে রাজাসহ সমস্ত রাজ্য।

মিত্রভেদে 'কাকী কেউটে ও সোনার হার' গল্পে পঞ্চতন্ত্রকারের মতে বুদ্ধি বা কৌশল জানলে আকারে ছোট হলেও বীরের কাছেও পরাজিত হতে হয় না। যেমন –

উপায়েন জয়ো যাদৃগ্ রিপোস্তদৃগ্ ন হেতিভিঃ।
উপায়জ্ঞেঽল্পকায়োঽপি ন শূরৈঃ পরিভূয়তে॥১/২১২

অর্থাৎ, কৌশলের দ্বারা যেভাবে শত্রুজয় করা যায়, তা অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারাও করা যায় না। কৌশল জানলে ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও বীরের কাছে হারতে হয় না।

'সিংহ শেয়াল ও উট' গল্পে চতুরক নামে এক শেয়াল কৌশলে উটকে মারে। পরে সিংহ ও নেকড়েকে ফাঁকি দিয়ে বুদ্ধির জোরে উটকে একা ভক্ষণও করে। এ প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকার দেখিয়েছেন বুদ্ধির জোরে সবকিছুই সম্ভব হয়। যেমন –

অবধ্যং চাথবাগম্যমকৃত্যং নাস্তি কিঞ্চন ।
লোকে বুদ্ধিমতাং বুদ্ধেস্তস্মাৎ তাং বিনিযোজয়েৎ॥১/৩৭৩

অর্থাৎ, দুনিয়ায় বুদ্ধিমানের বুদ্ধির কাছে অবাধ্য, অগম্য, অকৃত্য কিছুই নেই। অতএব, সব কাজেই বুদ্ধি খাটাতে হয়।

'বক ও বেজি' গল্পে কাজ উদ্ধার করার জন্য বুদ্ধির জোরে শত্রুকে বিভ্রান্ত করে পরাজিত করে কীভাবে জয়ী হওয়া যায় পঞ্চতন্ত্রকার তা নিম্নোক্তভাবে দেখিয়েছেন। যেমন –

নবনীতসমাং বাণীং কৃত্বা চিত্তং সুনির্দয়ম্।
তথা প্রবোধ্যতে শত্রুঃ সান্বয়ো ম্রিয়তে তথা॥১/৪১১

অর্থাৎ, কৌশল হিসেবে মুখের বাণী ননীর মতো করতে হয়, অপরদিকে হৃদয়ের ভেতরটা সুনির্দয় ও সুকঠিন রাখতে হয় , তাহলেই শত্রুকে সমূলে বিনাশ করা যায়।

কাকোলূকীয় তন্ত্রে মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ স্থিরজীবী বুদ্ধির লক্ষণ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। তার মতে বুদ্ধি খাটিয়ে কঠিন কাজও করা যায়। যেমন –

অনারম্ভো হি কার্যাণাং প্রথমং বুদ্ধিলক্ষণম্।
প্রারব্ধস্যান্তগমনং দ্বিতীয়ং বুদ্ধিলক্ষণম্ ॥ ৩/১২৭

অর্থাৎ, বুদ্ধির প্রথম লক্ষণ হলো কাজ শুরু না করা। আর বুদ্ধির দ্বিতীয় লক্ষণ হলো, শুরু করলে কাজটি দ্রুত শেষ করা।

দুর্গ

দুর্গ প্রতিটি রাষ্ট্র সুরক্ষিত রাখার অপরিহার্য কাঠামো। মূলত দুর্গ হলো নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুর্গ নির্মাণ করা হয়। প্রাচীন কাল থেকেই দুর্গ তৈরির প্রচলন দেখা যায়। রাজার রাজ্যসীমা সুরক্ষিত রাখার জন্য দুর্গ নির্মাণ করত। যে রাষ্ট্রের দুর্গ ব্যবস্থা যত উন্নত সে রাষ্ট্র ততো বেশি সুরক্ষিত। এজন্য বিষ্ণুশর্মা রাজকুমারদের রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য দুর্গ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন। মিত্রভেদ নামক তন্ত্রে দুর্গ কে-কখন তৈরি করেন, দুর্গ থাকার সুফল, দুর্গ থাকলে রাজা কতটা সুরক্ষিত, দুর্গ বিহীন রাজার অবস্থা কেমন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন –

ন গজানাং সহস্রেণ ন লক্ষেণ বাজিনাম্।
যৎ কৃত্যং সাধ্যতে রাজ্ঞাং দুর্গেণৈকেন সিধ্যতি॥
শতমেকোঽপি সন্ধত্তে প্রাকারস্থো ধনুর্ধরঃ।
তস্মাদ্দুর্গং প্রশংসন্তি নীতিশাস্ত্রবিচক্ষণাঃ॥
তেনাপি চ বরো দত্তো যস্য দুর্গং স ভূপতিঃ।
বিজয়ী স্যাত্ততো ভূমৌ দুর্গাণি স্যুঃ সহস্রশঃ॥
দংষ্ট্রাবিরহিতো নাগো মদহীনো যথা গজঃ।
সর্বেষাং জয়তে বশো দুর্গহীনস্তথা নৃপঃ॥১/২৩১-২৩৫

অর্থাৎ, রাজাদের যে কাজ সহস্র হাতি-ঘোড়া দিয়ে সম্ভব হয় না, সে কাজ এক দুর্গ দিয়ে সফল করা সম্ভব। নীতিশাস্ত্রকারগণ বলেছেন – একশজনের মহড়া দিয়ে যা সম্ভব নয় এক ধনুর্ধর সহজেই তা করতে পারেন। রাজার ক্ষেত্রে তাই দুর্গ অপরিহার্য। পুরাকালে হিরণ্যকশিপুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশ্বকর্মার বরে বৃহস্পতির উপদেশে ইন্দ্র দুর্গ বানিয়ে ছিলেন। দুর্গ থাকলে সে রাজরই জয়। কেননা যুদ্ধে দুর্গ থাকা যেন আশীর্বাদ। অতঃপর বসুধায় হাজার হাজার দুর্গ তৈরি হয়। মদহীন হাতি আর দাঁতহীন সাপের যে অবস্থা, তেমনি দুর্গবিহীন রাজাকে সবারই অধীনে অধীর থাকতে হয়।

'অনাগতবিধাতা, প্রত্যুপন্নমতি ও যদ্‌ভবিষ্য' গল্পে বিপদের সময় দুর্গই একমাত্র আশ্রয়। এ সম্পর্কে পঞ্চতন্ত্রকার মত দিয়েছেন। কেননা নিজের শক্তি কম, শত্রু শক্তিমান, মনে প্রচণ্ড রকমের ভয় এ সময় কেবল দুর্গই রক্ষা করতে পারে। যেমন –

অশক্তৈর্বলিনঃ শত্রোঃ কর্তব্যং প্রপলায়নম্।
সংশ্রিতব্যেঽথবা দুর্গো নান্যা তেষাং গতির্ভবেৎ॥১/৩২২

অর্থাৎ, শত্রু শক্তিশালী হলে ভয়ে পলায়ন করতে হয় কিংবা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। দুর্বল যারা এ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

দুর্গের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনায় পুনরায় দ্বিতীয় তন্ত্র মিত্রপ্রাপ্তির প্রথমে পঞ্চতন্ত্রকার মহিলারোপ্য নগরে হিরণ্যকের সুরঙ্গ দুর্গের কথা বলেছেন। এ দুর্গের হাজারো মুখ। কোনো দিক থেকে কোনো ভয় নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি দুর্গের অপরিহার্য দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। দুর্গ বিহীন রাজার কেমন অবস্থা হয়, দুর্গ থাকলে প্রতিরক্ষায় অন্যান্য ব্যয় না হওয়া, রাষ্ট্রব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান লাভের কথা বলা হয়েছে। যেমন –

দংষ্ট্রাবিরহিতঃ সর্পো মদহীনো যথা গজঃ।
সর্বেষাং জায়তে বশ্যো দুর্গহীনস্তথা নৃপঃ॥২/১৩
ন গজানাং সহস্রেণ ন চ লক্ষেণ বাজিনাম্।

তৎ কর্ম সিধ্যতে রাজ্ঞাং দুর্গেণৈকেন যদ্ রণে॥২/১৪

শতমেকোঽপি সন্ধত্তে প্রাকারস্থো ধনুর্ধরঃ।

তস্মাদুর্গং প্রশংসন্তি নীতিশাস্ত্রবিদো জনাঃ॥২/১৫

অর্থাৎ, মদহীন হাতি যেমন, দাঁতহীন সাপ যেমন তেমনি দুর্গবিহীন রাজা সবারই অধীন থাকে। সহস্র হাতি, লক্ষ ঘোড়া দিয়ে যুদ্ধে রাজার যে কাজ হয় না, সে-কাজ এক দুর্গ দিয়ে অনায়াসে সম্ভব হয়। একশ জনের মহড়ার সমান যেমন এক ধনুকধারী, তেমনি দুর্গ থাকলে রাজার আর কিছুই প্রয়োজন হয় না। আর এ সমস্ত বিষয়ে তাঁরাই অভিজ্ঞ, যাঁরা রাষ্ট্রনীতি-শাস্ত্র জানেন।

কাকোলূকীয় তন্ত্রে বলা হয়েছে দুর্গে আশ্রয় নিলে তাকে কেউ মারতে পারে না। মারতে হলে দুর্গে ঢোকার আগেই মারতে হয়। তাই শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার মূল উপায় হলো দুর্গ। এ প্রসঙ্গে অরিমর্দনের উক্তিতে পঞ্চতন্ত্রকার বলেছেন। যেমন –

বৃত্তিমপ্যাশ্রিতো শত্রুরবধ্যঃ স্যাজ্জিগীষুণা।

কিং পুনঃ সংশ্রিতো দুর্গং সামগ্র্যা পরয়া যুতয়া ॥ ৩/১২৬

অর্থাৎ শত্রু বেড়ার আড়লে লুকোলেও যেমন বিজয়েচ্ছু মারতে পারে না, তেমনি সামগ্রী ভরা দুর্গে আশ্রয় নিলে তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না।

ধৈর্যশীলতা

ধৈর্য একটি মহৎ গুণ একথা সর্বজনবিদিত। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত যারা সফল হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেই ধৈর্যশীল ছিলেন। রাজনীতিতে প্রত্যেক মানুষের প্রতিকূল পরিস্থিতি আসবে এটাই স্বাভাবিক। এগুলো ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করাই আসল কথা। *পঞ্চতন্ত্রে* রাজকুমারদের রাজনৈতিক জ্ঞান লাভের জন্য বিষ্ণুশর্মা গল্পের মধ্যে নীতিশ্লোকে ধৈর্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন –

অত্যুৎকটে চ রৌদ্রে চ শত্রৌ প্রাপ্তে ন হীয়তে।

ধৈর্যং যস্য মহীনাথো ন স যাতি পরাভবম্॥১/১০৩

ভয়ে বা যদি বা হর্ষে সম্প্রাপ্তে যো বিমর্ষয়েৎ।

কৃত্যং ন কুরুতে বেগান্ন স সন্তাপমাপ্নুয়াৎ॥১/১০৯

ত্যাজ্যং ন ধৈর্যং বিধুরেহপি কালে ধৈর্যাৎ কদাচিদ্ গতিমাপ্নুয়াৎ সঃ।

যথা সমুদ্রেঽপি চ পোতভঙ্গে সাঞ্যাত্রিকো বাঞ্ছতি তর্তুমেব॥১/৩১৯

অর্থাৎ, অতি ভয়ঙ্কর শত্রুর আক্রমণেও যে রাজার ধৈর্য টলে না, তাঁর পরাজয় নেই। ভয় বা আনন্দ যাই হোক না কেন, ব্যাপারটা যে তলিয়ে দেখে এবং চট করে কিছু করে বসে না, তাকে কখনও অনুতাপ করতে হয় না। সঙ্কটকালেও ধৈর্য ত্যাগ করতে নেই। ধৈর্য ধরলে একটা উপায় হলেও হতে পারে। যেমন সমুদ্রে যদি জাহাজ ডুবিও হয়, তবু যাত্রীরা ধৈর্য ধরে, চেষ্টা করে সাঁতরে পার হতে পারে।

বন্ধুত্ব

বন্ধুত্ব নিয়ে *পঞ্চতন্ত্রে* ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃত বন্ধুর ভালোবাসা নিখাদ ও অকৃত্রিম। বন্ধুত্বের লক্ষণ সম্পর্কে বিষ্ণুশর্মা বলেছেন – 'গোপনকথা বলে, শুধোয়, কিছু দেয়, কিছু গ্রহণ করে, খায় এবং খাওয়ায় – এই ছয়টি।'[১৮] প্রথম তন্ত্রের মিত্রভেদ নাম হলেও নামটির মধ্যে মিত্রতা রয়েছে। এখানে মিত্রতা ভাঙা বুঝালেও মিত্রতা তৈরি না হলে তো মিত্রতা ভাঙার প্রশ্ন আসে না। পঞ্চতন্ত্রকার বিপরীত গোত্রের দুটি প্রাণীর সাথে প্রথমে বন্ধুত্ব দেখিয়েছেন, পরে আবার দুষ্টের কুমন্ত্রণায় কিভাবে বন্ধুত্ব শেষ হলো তাও দেখিয়েছেন। অর্থাৎ বনের রাজা পিঙ্গলক ও সঞ্জীবকের সাথে অত্যন্ত ভালো বন্ধুত গড়ে ওঠে। পরে মন্ত্রী দমনকের কুমন্ত্রণায় তা ভেঙে যায়। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুশর্মা রাজনৈতিক আবেশ সৃষ্টি করেছেন এবং বন্ধুত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে –

অপি ব্রহ্মবধং কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তেন শুধ্যতি ।

তদর্হেণ বিচীর্ণেন ন কথঞ্চিৎ সুহৃদ্দ্রুহঃ ॥১/২৭৮

অর্থাৎ, ব্রহ্মহত্যা করলেও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হওয়া যায়। কিন্তু বন্ধুদ্রোহীর প্রায়শ্চিত্ত নেই।

দমনক যখন মিথ্যাভাবে দুই জনকে দুই কথা বলে পিঙ্গলক ও সঞ্জীবকের মধ্যে শত্রুতা তৈরী করল তখন পঞ্চতন্ত্রকার সঞ্জীবকের উক্তিতে বন্ধুত্ব কাদের সাথে করতে হয় সে সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন। যেমন–

যয়োরেব সমং বিত্তং যয়োরেব সমং কুলম্।
তয়োর্মৈত্রী বিবাহশ্চ ন তু পুষ্টবিপুষ্টয়োঃ॥১/২৮৪
মৃগা মৃগৈঃ সঙ্গমনুব্রজন্তি গাবশ্চ গোভিস্তুরগাস্তুরঙ্গৈঃ।
মূর্খাশ্চ মূর্খৈঃ সুধিয়ঃ সুধীভিঃ সমানশীলব্যসনেষু সখ্যম্॥১/২৮৫

অর্থাৎ, সমান অর্থ এবং সমান বংশ হলে তবেই দুজনের মধ্যে মৈত্রী অথবা বিবাহ চলে, সবলে-দুর্বলে বা শাঁসালো- ছোপোষায় নয়। যেমন হরিণ হরিণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, গরু গরুর সঙ্গে, ঘোড়া ঘোড়ার সঙ্গে, মূর্খ মূর্খের সঙ্গে এবং সুধী সুধীর সঙ্গে। যাদের স্বভাবচরিত্র আর নেশা এক,
তাদেরই বন্ধুত্ব হয়।
এরূপভাবে মিত্রপ্রাপ্তি তন্ত্রেও বন্ধুত্ব করতে হলে কি কি নিয়ম মানতে হয় সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন –

যো মিত্রং কুরুতে মূঢ় আত্মনোঽদৃশং কুধীঃ।
হীনং বাপ্যধিকং বাপি হাস্যতাং যাত্যসৌ জনঃ॥ ২/২৯

অর্থাৎ, নিজের থেকে যে অধিক হীন এবং ঘোর বেমানান যে তার সাথে বন্ধুত্ব করে, সে বুদ্ধিহীন, মূর্খ এবং হাসির পাত্রে পরিণত হয়।

মিত্রপ্রাপ্তির ছয়টি গল্পেই বন্ধুত্ব নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রথমেই দেখা যায় পায়রারাজ চিত্রগ্রীব হাজার অনুচরসহ ব্যাধের জালে আটকা পড়ে। জীবন-মরণ সংকটে তারা বন্ধুর সহায়তায় বিপদ মুক্ত হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। তাই জাল সমেত উড়ে দূর পাহাড়ের কাছে নিরাপদ সুরঙ্গ দুর্গে বসবাস করে তাদের পরম বন্ধু হিরণ্যকের কাছে যায়। সে সবার বাঁধন কেটে বিপদ মুক্ত করে। এ প্রসঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্কে পঞ্চতন্ত্রকার পায়রারাজ চিত্রগ্রীবের উক্তিতে বলেছেন –

সর্বেষামেব মর্ত্যানাং ব্যসনে সমুপস্থিতে।

বাঙ্মাত্রেণাপি সাহায্যং মিত্রাদন্যো ন সন্দধে॥২/১২

অর্থাৎ, মানুষের সবচেয়ে বিপদের সময়ে প্রকৃত বন্ধু ছাড়া কেউ মুখের কথা দ্বারাও সাহায্য করে

না।

পরবর্তীতে পায়রারাজ চিত্রগ্রীব যখন হিরণ্যকের দুর্গদ্বারে গিয়ে তারস্বরে ডাক দিয়ে বলল, হে বন্ধু হিরণ্যক! মহাসঙ্কটে পড়েছি তাড়াতাড়ি এসো, তখন হিরণ্যকের আনন্দে আর ধরে না, বন্ধুর আগমনে শিহরণে তার শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। বাস্তবে বন্ধুত্বের নির্ভেজাল ভালোবাসায় এ রকমই হয়। এ প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকার বলেছেন –

সুহৃদঃ স্নেহসম্পন্না লোচনানন্দদায়িনঃ।

গৃহে গুহবতাং নিত্যমাগচ্ছন্তি মহাত্মনাম্॥

সুহৃদো ভবনে যস্য সমাগচ্ছন্তি নিত্যশঃ।

যৎ সৌখ্যং তস্য চিত্তে স্যান্ন তৎ স্বর্গেঽপি জায়তে॥২/১৬-১৭

অর্থাৎ, বন্ধু-বান্ধব হচ্ছে চোখের উৎসব, দেখলেই মনটা আনন্দে ভরে ওঠে, প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মহাত্মা যারা বন্ধুর টানে তারা যখন-তখন গৃহে চলে আসে। শুধু তাই নয়, বন্ধু আসলে মনে যে আনন্দ জাগে, সে আনন্দ স্বর্গের রাজধানী অমরাবতীতেও পাওয়া যায় না।

পরবর্তীতে পঞ্চতন্ত্রকার বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই মৈত্রীময় সম্পর্ক কি করে হতে পারে? তাঁর মতে, জগতে ভালো-মন্দ দুই-ই রয়েছে। যে মন্দ বিবেচিত হয় তার সাথে বন্ধুত্ব করা ঠিক নয়। অপরদিকে যে অধিক বীর্যবান তার সাথেও বন্ধুত্ব করা ঠিক নয়। এরূপ হলে সে নিজ হাতেই বিষ ভক্ষণ করে।[১৯] আর ভালো প্রকৃতির যাঁরা, তাঁরা সজ্জন ব্যক্তি। তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব অনায়াসেই হতে পারে। যেমন –

উপকারাচ্চ লোকানাং নিমিত্তান্মৃগপক্ষিণাম্।

ভয়াল্লোভাচ্চ মূর্খাণাং মৈত্রী স্যাদ্দর্শনাত্যতাম্॥২/৩৫

আরম্ভগুর্বী ক্ষয়িণী ক্রমেণ লঘ্বী পুরা বৃদ্ধিমতী চ পশ্চাৎ।

দিনস্য পূর্বার্ধপরার্ধভিন্না ছায়েব মৈত্রী খলসজ্জনানাম্॥২/৩৮

সতাং সাপ্তপদং মৈত্রমিত্যাহুর্বিবুধা জনাঃ।

তস্মাৎ ত্বং মিত্রতাং প্রাপ্তো বচনং মম তচ্ছৃণু॥২/৪৭

অর্থাৎ, মানুষে মানুষে মৈত্রী হয় উপকারে, পশু-পাখিতে মৈত্রী হয় বিশেষ কারণে, মূর্খদের মৈত্রী হয় ভয়ে কিংবা লোভে, সজ্জনে সজ্জনে মৈত্রী হয় কেবল দর্শনের ফলে। এমনিভাবে খলের ও সজ্জনের মৈত্রী যথাক্রমে ছায়ার মতো ক্রমশ বিলীন হয় আর ক্রমবর্ধমান হয়। দিনের পথমভাগে ছায়া যেমন আগে লম্বা হয়ে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে পরে, অপরার্ধে তেমনি আগে ক্ষীণ তারপর ক্রমে ক্রমে বাড়ে। সজ্জনদের মৈত্রী হয় সাত কথায় বা সাত পা একসঙ্গে চললে। সুতরাং সজ্জনরা এভাবে একে অপরের বন্ধু হয়। তখন বন্ধু যা বলে তাই শোনে।

লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে প্রথমেই বলা হয়েছে যারা শুধু নিজের চিন্তা করে তথা স্বার্থপরের মতো কাজ করে। তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ঠিক নয়। যেমন –

বর্জয়েৎ কৌলিকাকারং মিত্রং প্রাজ্ঞতরো নরঃ।

আত্মনঃ সম্মুখং নিত্যং য আকর্ষতি লোলুপঃ॥৪/১২

অর্থাৎ, তাতিঁর মতো যে-স্বার্থপর, সে কেবল নিজের দিকেই টানে, তেমন বন্ধুকে বুদ্ধিমানের বর্জন করা উচিত।

অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে নিষ্ঠুর বন্ধুর প্রকৃতি এবং তার পরিণাম সম্পর্কে পঞ্চতন্ত্রকার উল্লেখ করেছেন। যেমন –

যস্ত্যক্ত্বা সপাদং মিত্রং যাতি নিষ্ঠুরতাং সুহৃৎ।

কৃতঘ্নস্তেন পাপেন নরকে যাত্যসংশয়ম্॥৫/৮২

অর্থাৎ, নিষ্ঠুরভাবে যে-বন্ধু বিপন্ন বন্ধুকে ফেলে চলে যায়, সে নিশ্চিতভাবে পাপিষ্ঠ, সে নিমকহারাম, তার স্থান নরকে।

এছাড়া পঞ্চতন্ত্রকার মাৎস্যন্যায়, ন্যায়বিচার, মৃত্যুদণ্ড, যুদ্ধবর্জন, অহিংসা প্রভৃতি রাজনৈতিক বিষয় তুলে ধরেছেন।

অতএব উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, একটি রাষ্ট্র কিভাবে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হতে পরে তার সামগ্রিক পরিচয় *পঞ্চতন্ত্রে* তুলে ধারা হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রকার তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে একটি সফল রাষ্ট্রের সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে। বিশেষত রাজসেবা, রাজধর্ম, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ষড়গুণ তথা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, রাষ্ট্রীয় নীতি-পদ্ধতি, বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি তথা মন্ত্রীদের ধর্ম, শত্রুতা, যুদ্ধ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, দুর্গ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ক্রিয়াকলাপ, রাজকর্মচারীদের ভূমিকা ও মতামতের যৌক্তিকতা প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এ সমস্ত বিষয় আজকের রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশেষভাবে শিক্ষণীয়।

তথ্যসূত্র

১. পঞ্চতন্ত্রকং নাম নৃপনীতিশাস্ত্রং বালাবোধনার্থং ভূতলে প্রবৃত্তম্।

প্রসূন বসু সম্পাদিত, বিষ্ণুশর্মা, *পঞ্চতন্ত্রম্, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* ১৫দশ খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩,পৃ. ২৩৬

২. নৃপসেবয়া, নৃপো নোচিতমহো।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৩৭

৩. যঃ সম্মানং সদা ধত্তে ভৃত্যানাং ক্ষিতিপোঽধিকম্।

বিত্তাভাবেঽপি তং দৃষ্ট্বা তে ত্যজন্তি ন কর্হিচিৎ॥

সদাচারেষু ভৃত্যেষু সংসীদৎসু চ যঃ প্রভুঃ ।

সুখী স্যান্নরকং যাতি পরত্রেহ চ সীদতি॥২/২২-২৪

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৯৫

৪. অথ কদাচিৎ পিঙ্গলকো নাম সিংহঃ সর্বমৃগপরিবৃতঃ পিপাসাকুল উদকগ্রহণার্থে যমুনাতটমবতীর্ণঃ সঞ্জীবকস্য গম্ভীরতরশব্দং দূরাদেবাশৃণোৎ। তং শ্রুত্বাতীবব্যাকুলহৃদয়ঃ সসাধ্বসমাকারং প্রচ্ছাদ্য বটতলং চতুর্মণ্ডলাবস্থানেনাবস্থিতঃ।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৩৮

৫. চতুর্মণ্ডলাবস্থানং ত্বিদম্- সিংহঃ সিংহানুযায়িনঃ কাকরবাঃ কিংবৃতা ইতি।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৩৮

৬. এতদর্থং কুলীনানাং নৃপাঃ কুর্বন্তি সংগ্রহম্।
আদিমধ্যাবসানেষু ন তে গচ্ছন্তি বিক্রিয়াম্॥১/৩০০

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৭৩

৭. যস্মিন্ কৃত্যং সমাবেশ্য নির্বিশঙ্কেন চেতসা।

আস্যতে সেবকঃ স স্যাৎ কলত্রমিব চাপরম্॥১/৮৫

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৪৩

৮. যঃ কৃত্বা সুকৃতং রাজ্ঞো দুষ্করং হিতমুত্তমম্।

লজ্জয়া বক্তি নো কিঞ্চিত্তেন রাজা সহায়বান্॥১/৮৬

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৪৩

৯. অব্যাপারেষু ব্যাপারং যো নরঃ কর্তুমিচ্ছতি।

স এব নিধনং যাতি কীলোৎপাটীব বানরঃ॥১/২১

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৩৮

১০. ভোঃ উৎকটস্তাবদস্মাকং শত্রুরুদ্যমসম্পন্নশ্চ কালবিচ্চ নিত্যমেব নিশাগমে সমেত্যাস্মৎপক্ষকদনং করোতি। তৎ কথমস্য প্রতিবিধাতব্যম্। বয়ং তাবদ্ রাত্রৌ ন পশ্যামঃ ন চ তস্য দিবা দুর্গং বিজানীমো যেন গত্বা প্রহরামঃ। তদত্র কিং যুজতে সন্ধি-বিগ্রহ-যান-আসন-সংশ্রয়-দ্বৈধীভাবানাং মধ্যাৎ।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩১৮

১১. তদস্যোলূকস্য বিহঙ্গারাজ্যাভিষেকো নিরুপিতস্তিষ্ঠতি সমস্তপক্ষিভিঃ। তৎ ত্বমপি স্বমতং দেহি।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩২৪

১২. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩২৯

১৩. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩৩০

১৪. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩৩৯

১৫. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩৪২

১৬. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩৪৫-৩৪৫

১৭. হিতৈঃ সাধুসমাচারৈঃ শাস্ত্রজ্ঞৈর্মতিশালিভিঃ।
কথঞ্চিন্ন বিকল্পন্তে বিদ্বদ্ভিশ্চিন্তিতা নয়াঃ॥১/৩৪৩

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৭৮

১৮. দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥২/৪৯

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ২৯৮

১৯. যোঽমিত্রং কুরুতে মিত্রং বীর্যাভ্যধিকমাত্মনঃ।
স করোতি ন সন্দেহঃ স্বয়ং হি বিষভক্ষণম্॥৪/২৫

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* পৃ. ৩৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

পঞ্চতন্ত্রে নীতিশিক্ষা

পঞ্চম অধ্যায়ে *পঞ্চতন্ত্রে* রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে *পঞ্চতন্ত্রে* নীতিশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করা হবে। নৈতিকতা এমন একটি বিষয় যা মানুষকে ভালো কাজ করতে উজ্জীবিত করে। নীতিবান মানুষেরা তাঁদের সৎ কর্মের মাধ্যমে সমাজ এগিয়ে নিয়ে যান। মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে হলে বেশি বেশি নৈতিকতার চর্চা করা উচিত। এজন্য জীবনকে আনন্দদায়ক করতে এবং নৈতিক জীবনাচরণের ক্ষেত্রে *পঞ্চতন্ত্র*-এর নীতিশিক্ষা অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। নৈতিক উপদেশে বারিধি সমতুল্য *পঞ্চতন্ত্র* সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য স্থান দখল করে আছে। এ গ্রন্থে চিত্তবিনোদন ও শিশু-কিশোরদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গল্প রচিত হয়েছে। গল্প পড়ে শিশু যাতে তার নীতিকথাটি সহজে মনে রাখতে পারে সে উদ্দেশ্যে নীতিশ্লোক সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মানব জীবনে নৈতিকতার শিক্ষা সবচেয়ে বড় ও মহান শিক্ষা। বস্তুত শিশু-কিশোরদের জন্য গ্রন্থটি রচিত হলেও সকল বয়সের মানুষের জন্য এটি জ্ঞানগর্ভ পাঠ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নৈতিকতা সম্পর্কে গ্রন্থকার বিষ্ণুশর্মা বলেছেন –

অপায়সন্দর্শনজাং বিপত্তিমুপায়সন্দর্শনজাং চ সিদ্ধিম্।
মেধাবিনো নীতিগুণপ্রযুক্তাং পুরঃ স্ফুরন্তীমিব দর্শয়ন্তি॥১/৬১

অর্থাৎ, এই নীতি প্রয়োগ করলে এই অসুবিধা এবং তার ফলে কার্যসিদ্ধি হবে না, এবং এই নীতি প্রয়োগ করলে এই সুবিধা এবং তার ফলে কার্যসিদ্ধি হবে – এটা প্রাজ্ঞবান ব্যক্তিরা এমনভাবে দেখিয়ে দেন যেন তা চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

বিষ্ণুশর্মা সহজ-সরল ভাষায় সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, মানুষের আচার-ব্যবহার, নারী চরিত্রের বিচিত্র রূপের বিবরণ, প্রকৃতির নানা বিষয়, রোমাঞ্চ, ধর্মশিক্ষা, মানবতা, মনস্তত্ত্ব, আদর্শজীবন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে নৈতিক

শিক্ষাটি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিস্তৃত আলোচনা থেকে জীবন-জগৎ সম্পর্কে যা নিবিড়ভাবে জড়িত তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো –

‘যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ’

মূর্খরা সারা জীবন জ্বালাতন করে।

এই নীতিকথার মাধ্যমে পঞ্চতন্ত্রকার বোঝাতে চেয়েছেন, জীবনে মূর্খতা কখনও কাম্য নয়। শিক্ষা অর্জনই সবচেয়ে বড় অর্জন। মূর্খ সন্তানরা সারা জীবন হাড় পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেয়। মূর্খ সন্তানদের পিতা-মাতার দুঃখ-কষ্টের শেষ থাকে না। সন্তানদের নিয়ে শান্তিতে থাকতে হলে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। তাদের কেবল শিক্ষাই পারে জীবনকে আলোকিত করতে। দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তি সেটি যথার্থভাবে অনুধাবন করে তাঁর অমনোযোগী তিন মূর্খ পুত্রকে শিক্ষিত করার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য অন্তর থেকে খুব তাগিদ বোধ করেন। তাই তিনি মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য নিম্নোক্ত নীতিকথাগুলো বলেন –

বরং গর্ভস্রাবো বরমৃতুষু নৈবাভিগমনং
বরং জাতঃ প্রেতো বরমপি চ কন্যৈব জনিতা।
বরং বন্ধ্যা ভার্যা বরমপি চ গর্ভেষু বসতি-
র্ন চাবিদ্বান্ রূপদ্রবিণগুণযুক্তোঽপি তনয়ঃ॥
কিং তয়া ক্রিয়তে ধেন্বা যা ন সূতে ন দুগ্ধদা।
কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ভক্তিমান্॥ (১/কথা ৪-৫)

অর্থাৎ, অবিদ্বান ছেলের চেয়ে বন্ধ্যা স্ত্রীও ভালো। কালে-অমিলন সেও ভালো অথবা উদরে বিনাশ, উদরে বসতি, মৃত ছেলে-মেয়েতেও আপত্তি নেই, না থাক রূপগুণ, না করুক অর্থ উপার্জন – তবুও অশিক্ষিত ছেলের দরকার নেই। কারণ এর দুঃখ একবার আর মূর্খ পুত্র দুঃখ দেয় সারা জীবন। গরু পোষা হয় দুধ এবং বাছুরের জন্য। গরু তা না

দিলে তাহলে সে গরুর কি দরকার? তেমনি কি হবে সে মূর্খ ছেলে দিয়ে, যদি না থাকে বিদ্যা, না হয় ভক্তিমান।

সন্তানরা জ্ঞানী-গুণী শিক্ষিত হলে পিতা-মাতারও সম্মান বেড়ে যায়। তারাই পিতা-মাতার আলো। আর মূর্খ হলে তারা সমাজে মুখ দেখাতে পারেনা এবং সমাজের লোকেরা তাদের গণনার মধ্যে ধরে না। এ প্রসঙ্গে অমরশক্তির উক্তিতে বিষ্ণুশর্মা বলেছেন –

গুণিগণ-গণনারম্ভে ন পততি কঠিনী সসম্ভ্রমা যস্য।
তেনাম্বা যদি সুতিনী বদ বন্ধ্যা কীদৃশী ভবতি॥ ১/কথা-৫ক

অর্থাৎ, সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে যদি না থাকা যায়, গুণীগণের হিসেবে তারা যদি গণ্য না হয়, তাহলে সে সন্তানের বাবা-মা হওয়ার চেয়ে না হওয়াই ভালো। বোকা পুত্রের মাতার চেয়ে বন্ধ্যা থাকাও ভালো।

মিত্রভেদ তন্ত্রে দমনকের উক্তিতে বিষ্ণুশর্মা বলতে চেয়েছেন মূর্খতা ত্যাগ করে মাথা উঁচু করে, উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে বাঁচাই সত্যিকারের বাঁচা। যেমন –

যস্মিঞ্জীবতি জীবন্তি বহবঃ সোঽত্র জীবতি।
বয়াংসি কিং ন কুর্বন্তি চঞ্চ্বা স্বোদরপূরণম্॥
যজ্জীব্যতে ক্ষণমপি প্রথিতং মনুষ্যৈর্বিজ্ঞানশৌর্যবিভবার্যগুণৈঃ সমেতম্।
তন্নাম জীবিতমিহ প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ কাকেঽপি জীবতি চিরং চ বলিং চ ভুঙ্‌ক্তে॥ ১/২৩-২৪

অর্থাৎ, সার্থক তাঁর বাঁচা যে বাঁচলে মানুষের উপকার হয়, তা না হলে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা কাক-বকের শামিল। জ্ঞানী-গুণীদের মতে – জ্ঞান, শৌর্য, বৈভব ইত্যাদি ভদ্রলোকের উপযুক্ত গুণসম্পন্ন হয়ে লোকসমাজে প্রশংসিত হয়ে বাঁচার নামই বাঁচা। এরূপ না হলে তো কাক-বক-শিয়াল-কুকুরও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খাবার খেয়ে বাঁচে।

পূর্বে অন্য প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত নীতিশ্লোক দুটি আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু নৈতিকতার দিক থেকে এই উপদেশসমুহ আরও অনেক বেশি প্রেরণাদায়ক। কেননা কাপুরুষতা, মূর্খতা, কূপমণ্ডুকতা কখনও কাম্য নয় । যেমন -

সুপূরা স্যাৎ কুনদিকা সুপূরো মুষিকাঞ্জলিঃ।
সুসন্তুষ্টঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনাপি তুষ্যতি॥
কিং তেন জাতু জাতেন মাতুর্যৌবনহারিণা।
আরোহতি ন যঃ স্বস্য বংশস্যাগ্রে ধ্বজো যথা॥ ১/২৫-২৬

অর্থাৎ, ছোট নদী যেমন সহজেই ভরে যায়, তেমনি মূষিকের অঞ্জলি অল্পতেই পূর্ণ হয়। কাপুরুষ খুশী হয় স্বল্পতেই। পতাকার মতো যে বংশের শীর্ষে আরোহণ না করে, সে মূলত মায়ের যৌবন হরণ করতে জন্ম নেয়।

মূর্খ লোকেরা সাধারণত অন্যের শোনা কথায় চলে এবং দম্ভ-অহংকার দেখিয়ে যে কোনো অন্যায় করে বসে। পঞ্চতন্ত্রকার এদের থেকে সতর্ক হতে বলেছেন। তাই তিনি নীতি বাক্যে বলেছেন –

কর্ণবিষেণ চ ভগ্নঃ কিং কিং ন করোতি বালিশো লোকঃ।
ক্ষপণকতামপি ধত্তে পিবতি সুরাং নরকপালেন॥১/৩০৬

অর্থাৎ, অন্যের কথা শুনে মূর্খ লোকেরা যে কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে। এই মূর্খেরা ঔদ্ধত্য দেখিয়ে পূজ্যপাদ সন্ন্যাসীর মতো আচরণ করে বটে, কিন্তু তারা বিবেক-বোধ বিসর্জন দিয়ে মৃত মানুষের মাথার খুলিতে মদ খায়। এছাড়া মূর্খ ব্যক্তি বন্ধু হলেও কোনো উপকারে আসে না। অপরদিকে শিক্ষিত ব্যক্তি শত্রু হলেও একেবারে নীতিহীনভাবে ক্ষতি করবে না। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি না বুঝে উপকার করতে গিয়েও চরম ক্ষতি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুশর্মা মিত্রভেদের ‘রাজা ও বানর’ গল্পের (১/২২) অবতারণা করেছেন –

> এক রাজার অঙ্গ সেবা করত এক বানর। সেবাপরায়ণতার জন্য রাজা বানরটিকে খুব বিশ্বাস করতেন। একদিন রাজা ঘুমালে বানরটি পাখা দিয়ে বাতাস দিচ্ছিল। এমন সময় একটি মাছি রাজার শরীরে বসছে আর উড়ছে। রাজার ঘুমে ব্যাঘাত হবে তাই বানরটি মাছিটিকে মারার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না। বানরের আর ধৈর্য ধরছে না। এমতাবস্থায় মাছিটিকে মারার জন্য শাণিত এক তরবারি এনে

উঁচিয়ে ধরল। ঠিক ঐ মুহূর্তে মাছিটি রাজার গলার উপর পড়ল। অমনি বানরটি দিল এক কোপ। সাথে সাথে রাজার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। তাই মূর্খ অনুচর রাখা কখনও কাম্য নয়। এখানে নীতিশ্লোকে করটকের উক্তিতে বলা হয়েছে। যেমন –

পণ্ডিতেঽপি বরং শত্রুর্নমূর্খো হিতকরাকঃ।

বানরেণ হতো রাজা বিপ্রাশ্চৌরেণ রক্ষিতাঃ॥১/৪২১

অর্থাৎ, হিতকারী মূর্খের চেয়ে জ্ঞানী শত্রুও অনেক ভালো। যেমন, হিতকারী মূর্খ বানর রাজাকে মারল অপরদিকে বিদ্বান বণিক চোর হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ব্রাহ্মণদের জীবন রক্ষা করল।

পঞ্চতন্ত্রকার মিত্রভেদ তন্ত্রে 'বানররা ও সূচীমুখ' গল্পে বলেছেন – মুর্খদের কখনও উপদেশ দিতে নেই। যারা শিক্ষিত, শ্রদ্ধাবান, ভক্তিমান তাঁদের উপদেশ দিলে ফল হয়, কিন্তু মুর্খদের হিতের জন্য উপদেশ দিলেও শোনেতো নাই বরং উল্টো উপদেশ দাতাকে দুঃখ দেয়, কখনও চরম ক্ষতিসাধনও করে বসে। যেমন –

উপদেশো হি মুর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্॥ ১/৩৯৩

অর্থাৎ, সৎ উপদেশ মূর্খদের কখনও শান্ত করে না, বরং ক্রোধই বাড়িয়ে দেয়। দুধ খেয়ে যেমন সাপের বিষই শুধু বৃদ্ধি পায়।

তাই আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি অর্জন করে এবং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মূর্খতা বিদূরিত করতে হবে।

‘ন হি তদ্ বিদ্যতে কিঞ্চিদ্ যদ্ অর্থেন ন সিধ্যতি’

এমন কিছু নেই যা টাকায় সিদ্ধ হয় না।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা অর্থ সম্পর্কে যে নীতি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, আজও তার গুরুত্ব ঠিক একই রকম রয়েছে। পূর্বেও সমাজনীতি প্রসঙ্গে অর্থের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু *পঞ্চতন্ত্রে* নীতিকথা প্রসঙ্গেও আলোচনা করা প্রয়োজন। বিষ্ণুশর্মা কথামুখে সব কিছু বাদ দিয়ে মন-প্রাণ ঢেলে অর্থ উপার্জনের কথা বলেছেন।[১] সবগুলো তন্ত্রেই তিনি অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি সৎপথে থেকে টাকা উপার্জনের কথা বলেছেন। টাকা থাকলে কোনো গুণ না থাকলেও লোকের চোখে সে গুণী। তার পক্ষে সব কাজই করা সম্ভব। বিত্তশালীর সঙ্গে চরম শত্রুও বন্ধুর মতো আচারণ করে। মামা-কাকা, মাসী-পিসি, আত্মীয়-স্বজনের অভাব হয় না। জগতে যা অসম্ভব, টাকা থাকলে তা অনায়াসে সম্ভব হয়। পঞ্চতন্ত্রকারের উক্তিতে –

অর্থেভ্যোঽপি হি বৃদ্ধেভ্যঃ সংবৃত্তেভ্যস্ততঃস্ততঃ।
প্রবর্তন্তে ক্রিয়াঃ সর্বাঃ পর্বতেভ্য ইবাপগাঃ॥ ১/৬
অশনাদিন্দ্রিয়াণীব স্যুঃ কার্যাণ্যখিলান্যপি।
এতস্মাৎ কারণাদ্ বিত্তং সর্বসাধনমুচ্যতে॥ ১/৮

অর্থাৎ, পর্বতের উপর থেকে ঢাল বেয়ে যেমন আপনি-আপনি ঝরনা নামে, তেমনি জগতে টাকা থাকলে অনায়াসে সমস্ত কাজ হয়ে যায়। পেটে কিছু খাবার গেলে যেমন ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয়, তেমনি কিছুই আটকে থাকে না টাকা থাকলে। তখন সব দিকই খোলা থাকে। তাই মহাজন টাকাকে বলেছেন সর্বসাধন।

বিষ্ণুশর্মা টাকাকে যাদুকরের শক্তির সাথে তুলনা করেছেন। মোটেও মান-সম্মান পাওয়ার মতো মানুষ নয় তবুও মান পায়। যাওয়ার মতো না, তবু লোকে যায়। অতি অখাদ্য, তবু লোকে বাহ্ বাহ্ করে! বিত্তবানদের যে গুণ নেই সেটি বলেও লোকে তাদের প্রসংশা করে। যেমন –

গতবয়সামপি পুংসাং যেষামর্থা ভবন্তি তে তরুণাঃ।

অর্থেন তু যে হীনা বৃদ্ধাস্তে যৌবন্হেপি স্যুঃ॥ ১/১০

অর্থাৎ, বয়সে বৃদ্ধ হলেও টাকা থাকলে লোকে তাকে জোয়ান বলে। টাকা না থাকলে যৌবনেও বুড়ো বলে কটাক্ষ করে।

মিত্রপ্রাপ্তি তন্ত্রে 'হিরণ্যকের আত্মকথা' গল্পে (২/১) পঞ্চতন্ত্রকার অর্থের অপরিমেয় শক্তির কথা ব্যক্ত করেছেন –

মহিলারোপ্য নগরে তাম্রচুর নামে এক পরিব্রাজকের অতি কৌশলে ঝুলিয়ে রাখা খাবার রোজ রোজ একটি ইঁদুর খেয়ে ফেলে। সাধ্যমতো পাহারা দিয়েও রক্ষা করতে পারেন না। ইঁদুর নিয়মিতভাবে খাবার খেয়েই যাচ্ছে। পরিব্রাজক তাম্রচুর হতাশ হয়ে পড়েছেন। একদিন বৃহৎস্ফিক্ নামে তাঁর এক বন্ধু বেড়াতে এলেন। রাতে দুজন বিছানায় শুয়ে ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করছেন। এমন সময় ইঁদুর লাফ দিয়ে উঠে পাত্রের খাবার খেতে থাকে। বাঁশ দিয়ে আঘাত করতে থাকলেও ইঁদুরটিকে দমানো গেল না। এমন কি বড়-বড় বিড়াল পর্যন্ত হার মেনে যায় ইঁদুরের কাছে। তখন বৃহৎস্ফিক্ বললেন – ' নূনং নিধানস্যোপরি তস্য বিলম্। নিধানোষ্মণা প্রকূর্দতে।'[২] অর্থাৎ, ওর গর্তটা নিশ্চই টাকার উপরে। টাকার গরমেই ও এত লম্ফ-ঝম্প করছে। তখন ইঁদুরটির গর্ত অনুসন্ধান করে প্রচুর ধনরত্ন-টাকা-পয়সা পাওয়া গেলে। সেগুলো হরণ করার সাথে সাথে ইঁদুর দুর্বল হয়ে পড়ল।

এ থেকে প্রমাণিত হয় এ জগতে যার যত টাকা তার দর্প-অহংকারও তত বেশি। সে কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করতে কখনও দ্বিধা করে না। তৎকালীন সময়ে এ বিষয়টি যেমন ছিল, বর্তমান সময়ে এ বিষয়টি আরও প্রবল আকার ধারণ করেছে। যেমন –

যদ্যুৎসাহী সদা মর্ত্যঃ পরাভবতি যজ্জনাৎ।

যদুদ্ধতং বদেদ্বাক্যং তৎ সর্বং বিত্তজং বলম্॥

অর্থেন বলবান্ সর্বো অর্থযুক্তঃ স পণ্ডিতঃ।

পশ্যৈনং মূষকং ব্যর্থং স্বজাতেঃ সমতাং গতম্॥২/৮৬-৮৭

অর্থাৎ, এই জগতে যার টাকা আছে, তার শক্তিই অন্য রকম। সেসব লোক সর্বদাই উৎসাহে টগবগ করে, অন্যকে দূর ছাই করে দিয়ে দম্ভ করে বেড়ায়। মূলত এসবই করে টাকার জোরে। টাকা থাকলেই লোকে বলবান, টাকা থাকলেই পণ্ডিত। যেমন ইঁদুরটা টাকা হারানো মাত্র জাত ভাইদের সঙ্গে সমান হয়ে গেল।

পঞ্চতন্ত্রকার টাকা উপার্জনের উপায় সম্পর্কে যেমন পরামর্শ দিয়েছেন তেমনি উপার্জিত টাকা কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় সে বিষয়েও মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তবে তিনি সংরক্ষণ বলতে বুঝিয়েছেন, জীবন চলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেটুকু রেখে বাকিটুকু দান করা। আর এতেই জীবনে শান্তি মেলে। এ প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকার ধনবানদের অর্থ মহৎ উদ্দেশ্যে দান করতে পরামর্শ দিয়েছেন । যেমন –

অগ্নিহোত্রফলা বেদাঃ শীলবিত্তফলং শ্রুতম্।
রতিপুত্রফলা দারা দত্তভুক্তফলং ধনম্॥
গৃহমধ্যনিখাতেন ধনেন ধনিনো যদি।
ভবামঃ কিং ন তেনৈব ধনেন ধনিনো বয়ম্॥২/১৫০-১৫১

অর্থাৎ, বেদের ফল অগ্নিহোত্র। পড়াশুনার ফল ধন-চরিত্র। পত্নীর ফল প্রেম ও সন্তান । টাকার ফল ভোগ আর দান। বাড়িতে টাকা পুঁতে রেখে যদি ধনী লোক হওয়া যায়, তবে সে টাকাতে সকলেই বড় লোক হতে পারত।

প্রকৃত ধনী বা মহান হতে হলে ভোগের সঙ্গে সঙ্গে দানও করতে হয়।

‘হিরণ্যকের আত্মকথা’ গল্পটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রসঙ্গানুসারে বলা যায় – হিরণ্যক শুধু টাকা সঞ্চয়ই করেছে, সে নিজে ভোগও করেনি দানও করেনি। তাই তার অর্থের তৃতীয় গতিই হয়েছে। অর্থাৎ নাশ হয়েছে। অর্থ অপরের স্বার্থে ত্যাগ করে দিয়েই বড়ো হওয়া যায়। রাজা হয়ে যদি দান না করেন তবে রাজার কোনো মান নেই। কুবেরের মতো ধন যে শুধু পাহারা দেয় মহেশ্বর তাকে অবিদ্বান বলেছেন।[৩] তখন তার অর্থ নষ্ট হবে বা ধ্বংস হবে এটাই বাস্তবতা। বিষ্ণুশর্মার উক্তিতে –

উপার্জিতানামর্থানাং ত্যাগ এব হি রক্ষণম্।

তড়াগোদরসংস্থানাং পরীবাহ ইবাম্ভসাম্॥
দাতব্যং ভোক্তব্যং ধনবিষয়ে সঞ্চয়ো ন কর্তব্যঃ।
পশ্যেহ মধুকরীণাং সঞ্চিতমর্থং হরন্ত্যন্যে॥
দানং ভোগো নাশস্তিস্রো গতয়ো ভবন্তি বিত্তস্য।
যো ন দদাতি ন ভুঙক্তে তস্য তৃতীয়া গতির্ভবতি॥২/১৫২-১৫৪

অর্থাৎ, উপার্জিত অর্থ দানই হলো মূল রক্ষণ। জলাশয়ের মধ্যেকার জল নালা দিয়ে বের করে দিলে তবেই বিশুদ্ধ থাকে। তেমনি টাকা ভোগ করলে, দান করলেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। সঞ্চয়ে কোনো পরম প্রাপ্তি নেই। যেমন মধুমক্ষিকাদের সঞ্চিত মধু অন্যেরা চুরি করে নিয়ে যায়। দান, ভোগ আর নাশ – এই তিনটি হলো টাকার গতি। যে দান করে না, ভোগও করে না, বিনাশই তার একমাত্র গতি।

তবে কাকোলূকীয় তন্ত্রে 'হাতির দল ও খরগোসেরা' গল্পে অর্থ বিপদ-আপদে কাজে লাগতে পারে, তাই কিছু হলেও সঞ্চয় করতে হবে। বিশেষ করে নিজেকে এবং পত্নীকে বাঁচানোর জন্য টাকা ব্যয়ের দিকে তাকানো যাবে না। তবে নিজের বিপদে পত্নীকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজেকে সর্বাগ্রে রক্ষা করতে হবে। মানব জীবনে যা অতি বাস্তব। যেমন –

আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্ দারান্ রক্ষেদ্ ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি॥৩/৮৫

অর্থাৎ, বিপদের জন্য টাকা সঞ্চয় করবে। পত্নীকে বাঁচাবে তাতে টাকা যায় যাক। পত্নী যাক টাকা যাক, নিজেকে সর্বদা বাঁচাবে।

লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রের উপসংহারে বিষ্ণুশর্মা বলেছেন দৈবের উপর বিশ্বাস না করে পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনেই সার্থকতা রয়েছে। যেমন –

অকৃত্বা পৌরুষং যা শ্রীঃ কিং তয়াপি সুভোগ্যয়া।
জরদ্গবেঽপি চাশ্নাতি দৈবাদুপগতং তৃণম্॥৪/১১৪

অর্থাৎ, পৌরুষে অর্জিত নয় যে অর্থ কি হবে তা সুখে ভোগ করে? যেমনি বুড়ো গরু দৈবের দান খেয়ে বাঁচে, তাতে গৌরব কি?

অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে কীভাবে অর্থ উপার্জন করতে হবে সে সম্পর্কেও পঞ্চতন্ত্রকার গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন –

দুষ্প্রাপ্যাণি বহুনি চ লভ্যন্তে বাঞ্ছিতানি দ্রবিণানি।
অবসরতুলিতাভিরলং তনুভিঃ সাহসিকপুরুষাণাম্॥৫/২৮

অর্থাৎ, দুঃসাহসী পুরুষেরা যখন যা প্রয়োজন সেভাবেই দেহকে খাটায়। পরিশ্রমের মাধ্যমেই অনেক দুষ্পাপ্য এবং বাঞ্ছিত ধন পাওয়া সম্ভব।

'লোভাৎ পাপং পাপাৎ মৃত্যুঃ'

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

লোভ মানব চরিত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু। মানুষ লোভের বশীভূত হয়ে যে কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মানুষ ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। লোভের পরিণতি কত করুণ, কত ভয়ঙ্কর হতে পারে সে সম্পর্কে বিষ্ণুশর্মা অত্যন্ত চমৎকারভাবে আলোকপাত করেছেন। 'ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি' গল্পে (১/১৯) এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

ধর্মবুদ্ধি পাপবুদ্ধি দুই বন্ধু মিলে বিদেশ গিয়ে অনেক অর্থ উপার্জন করে। পাপবুদ্ধি গচ্ছিত সকল অর্থ চুরি করে নিয়ে অস্বীকার করে। উপরন্তু অন্যায়ভাবে ধর্মবুদ্ধির উপর চুরির দায় চাপায় যেন চোরের মার বড় গলা। কৌশলে পাপবুদ্ধি নিজের বাবাকে গাছের কোটরে লুকিয়ে রেখে তাকে দিয়ে ধর্মবুদ্ধিকে চোর বলে ঘোষণা করে। তখন ধর্মবুদ্ধি মিথ্যা অপবাদ সহ্য করতে না পেরে সহজদাহ্য জিনিস দিয়ে গাছের কোটরে আগুন ধরিয়ে দেয়। অমনি পাপবুদ্ধির পিতা আগুনে জ্বলতে জ্বলতে পুত্রের চুরির কীর্তি-কলাপ বর্ণনা করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বিচারে পাপবুদ্ধিকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়।

এখানে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু – এই নীতিবাক্য যথার্থ প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। একই গল্পে বিষ্ণুশর্মা বন্ধুর বিরুদ্ধাচরণকারীদের মৃত্যুর পর নরক বাসের কথা বলেছেন। যেমন –

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ।

তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥১/৪২৫

অর্থাৎ, বন্ধু হয়ে যদি বন্ধুর বিরুদ্ধাচরণ করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তারা চন্দ্র সূর্য যতদিন আছে পাপ হেতু নরকে যাবেই যাবে।

একই তন্ত্রে বিষ্ণুশর্মা 'ব্রাহ্মণ ও বণিক' গল্পেও লোভের পরিণতি মৃত্যু দেখিয়েছেন। ব্রাহ্মণ যুবক একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হয়েও পরের ধনের প্রতি লোভ করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বণিকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। গল্পের শুরুতে পঞ্চতন্ত্রকার এ জাতীয় মানুষের চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন –

অসতী ভবতি সলজ্জা ক্ষারং নীরং চ শীতলং ভবতি।

দম্ভী ভবতি বিবেকী প্রিয়বক্তা ভবতি ধূর্তজনঃ॥১/৪২২

অর্থাৎ, জগতে দেখা যায় যে, চরিত্রহীনরা বেশি লজ্জাবতী, খরজল ঠাণ্ডা বেশি, ভণ্ডরা বেশি বিবেচকের মতো কথা বলে, ঠগেরা মিষ্টি ভাষায় কথা বলে মন ভরিয়ে দেয়।

এরকম ঠগ চরিত্রের ব্রাহ্মণ যুবক লোভের বশবর্তী হয়ে বণিকদের পিছু নিয়ে বিষ খাইয়ে তাঁদের হত্যা করে অর্থ ছিনিয়ে নিবে স্থির করল, কিন্তু পথিমধ্যে কিরাতের আক্রমণে বণিকদের সাথে সেও ধরা পড়ল। ঘটনাক্রমে কিরাতের হাতে তাকেই মরতে হলো। অবশ্য বণিকরা তার কারণে মুক্তি পেল। এটাই হলো লোভের পরিণতি।

মিত্রপ্রাপ্তি তন্ত্রে 'অতিলোভী শিয়াল' গল্পে (২/৩) প্রারম্ভিক আলোচনায় লোভের খারাপ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। যেমন –

অতিতৃষ্ণা ন কর্তব্যা তৃষ্ণাং নৈব পরিত্যজেৎ।

অতিতৃষ্ণাভিভূতস্য চূড়াং ভবতি মস্তকে।২/৭৮

অর্থাৎ, অতিরিক্ত লোভ করা ঠিক নয়। অতি লোভ খুবই খারাপ। লোভ বাড়তে বাড়তে জীবনে করুণ পরিণতি নেমে আসে।

এ প্রসঙ্গে গল্পটি হলো – বনের মধ্যে ব্যাধ একটি শুকর দেখে তিরে বিদ্ধ করল। শুকরটিও আহত অবস্থায় ক্রুদ্ধ হয়ে ধারালো দাঁত দিয়ে ব্যাধকে হত্যা করে নিজেও

পঞ্চত্ব পেল। সেই সময় এক শিয়াল অতি লোভের বশবর্তী হয়ে ব্যাধ ও শুকর দুটো এক সঙ্গে দেখে অনেক দিন খাবে বলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রথমে ধনুতে লাগানো স্নায়ু খেতে শুরু করে। অমনি তালুতে তির বিদ্ধ হয়ে শিয়ালটি মারা গেল। এটাই অতি লোভের ফল।

কাকোলূকীয় তন্ত্রে 'হরিদত্ত ও ক্ষেত্রদেবতা' গল্পে (৩/৫) – হরিদত্ত ক্ষেতের উঁচু ঢিবিতে মস্ত বড় এক সাপ দেখে শরায় করে প্রতিদিন দুধ দিয়ে পূজা করত। সাপ দুধ খেয়ে রোজ রোজ একটি করে দীনার দিত। একদিন হরিদত্তের অনুপস্থিতে তার ছেলে দুধ দিয়ে দীনার তুলে নিয়ে ভাবল নিশ্চয়ই ঢিবিটার মধ্যে সোনার দীনারে ভর্তি, তাই সে সাপটাকে লাঠি দিয়ে মারল এক ঘা। সাপটি আহত অবস্থায় এমনভাবে দংশন করল, ছেলেটি সাথে সাথে মারা গেল।

মূলত অতি লোভ থেকেই ছেলেটির মৃত্যু হলো।

লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ও পঙ্গু' (৪/১৩)গল্পে –

এক ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য তাঁর অর্ধেক আয়ু দান করলেন। সেই স্ত্রী লোভের বশীভূত হয়ে স্বামীকে মারার জন্য কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে পঙ্গুর প্রেমে মজে তাকে নিয়ে অন্য নগরে পাড়ি দিল। ব্রাহ্মণ এক সাধুর সহায়তায় কুয়ো থেকে উদ্ধার পেয়ে স্ত্রীকে খুঁজে বের করল। স্ত্রী তখন রাজার কাছে অভিযোগ দিল, এই লোকটি আমার স্বামীর শত্রু। রাজা সঙ্গে সঙ্গে তাকে মারার নির্দেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ বলল, মহারাজ তার আগে আমার একটি নিজস্ব জিনিস ও নিয়েছে, সেটি ফেরত দিতে বলুন। রাজা নির্দেশ দিলেন তার আয়ু ফেরত দিতে । রাজার ভয়ে স্ত্রী যখন বলল, আয়ু ফেরত দিলাম, সাথে সাথে স্ত্রী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

এখানে পঞ্চতন্ত্রকার পরপুরুষ লোভী নারীর পরিণতি মৃত্যু দেখিয়েছেন।

অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রের শুরুতেই দেখা যায় যে, মণিভদ্র নামে এক বণিক স্বপ্নে দেখলেন, পরের দিন এক জৈন সন্ন্যাসী তার বাড়িতে আসবে। তার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করলে যে অক্ষয় সোনা হয়ে থাকবে। ঠিক সকাল বেলায় স্বপ্নে যা দেখেছিল

তেমনি এক সন্ন্যাসীকে দেখল। বণিক মহানন্দে হাতের কাছে এক লাঠি পেয়ে তাঁকে আঘাত করল, অমনি সে সোনা হয়ে মঠিতে পড়ে গেল। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলো এক নাপিত। সেও একইভাবে সন্ন্যাসীদের বিহারে গিয়ে নিমন্ত্রণ দিল, কিন্তু সন্ন্যাসীরা কেউ আসতে চাইল না। পরে যখন দামী কাপড় উপহারের কথা বলা হলো অমনি তারা রাজি হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ন্যাসীরা সুড়সুড় করে চলে এলো আর নাপিতও প্রস্তুত। ঘরের মধ্যে ঢোকার সাথে সাথেই দরজা বন্ধ করে মাথায় আঘাত করতে থাকল। কিন্তু তাতে কোনো কাজই হলো না। উপরন্তু সন্ন্যাসীদের আর্তনাদ আর চিৎকারে পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল। ততক্ষণে থানার রক্ষীরাও চলে এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। বিচারে তাকে শূলে চড়ানো হলো। এভাবে অতি লোভের ফলে যেমন সন্ন্যাসীদের জীবন গেলো, অপরদিকে নাপিতকেও মরতে হলো। এভাবে পঞ্চতন্ত্রকার লোভের পরিণতি পাপ আর পাপ থেকে মৃত্যু দেখিয়েছেন।

নীতিবাক্যে বিষ্ণুশর্মা বলেছেন –

একাকী গৃহসন্ত্যক্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ।
সোঽপি সংবাহ্যতে লোকে তৃষ্ণয়া পশ্য কৌতুকম্॥
জীর্যন্তে জীর্যতঃ কেশা দন্তা জীর্যন্তি জীর্যতঃ।
অশ্রুঃ শ্রোতে চ জীর্যেতে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে॥৫/১৫-১৬

অর্থাৎ, ঘর নেই সংসার নেই দিগম্বর বেশে থাকে, তারপররেও এই জগৎ-সংসারে লোভের জোয়ারে ভেসে চলে, যেমন বুড়ো হলেও মানুষের দাঁত, চুল, চোখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তি কমে গেলেও কামনার আগুনে হৃদয় জ্বলতে থাকে।

‘যস্য বুদ্ধির্বলং তস্য’

যার বুদ্ধি তারই বল।

জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধা-বিপত্তি থাকবে এটাই স্বভাবিক। এই বাধা-বিপত্তি থেকে মানুষ বুদ্ধিমত্তার দ্বারাই পরিত্রাণ পায়। বুদ্ধিমত্তার কারণেই মানুষ সকল কাজে বিজয়ী

হয়। *পঞ্চতন্ত্র*-এর শুরুতেই বিষ্ণুশর্মা বুদ্ধির জয়গান গেয়েছেন। গায়ের জোরে, অস্ত্র-শস্ত্রে যা সম্ভব নয় বুদ্ধির দ্বারা তা অতি সহজেই সম্ভব। যেমন –

ন তচ্ছস্ত্রৈর্ন নাগেন্দ্রৈর্ন হয়ৈর্ন পদাতিভিঃ।
কার্যং সংসিদ্ধিমভ্যেতি যথা বুদ্ধ্যা প্রসাধিতম্॥১/১২৫

অর্থাৎ, যে কাজ সেরা সেরা হাতি, ঘোড়া, পদাতিক, অস্ত্র-শস্ত্রবলে হয় না – সে কাজ অনায়াসেই বুদ্ধিবলে হয়। যেমন – মিত্রভেদে 'বিষ্ণুরূপধারী তাঁতি' গল্পে বুদ্ধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

সুপ্রযুক্তস্য দম্ভস্য ব্রহ্মাপ্যন্তং ন গচ্ছতি।
কৌলিকো বিষ্ণুরূপেণ রাজকন্যাং নিষেবতে॥১/২০৩

অর্থাৎ, ভালো করে বুদ্ধি আটলে ব্রহ্মা দেবতাও বশ হয়। যেমনি তাঁতি হয়েও বুদ্ধির জোরে রাজকন্যাকে বশ করে। এক তাঁতি নগরের একটি অনুষ্ঠানে অতি সুন্দর এক রাজ কন্যাকে দেখে তাঁর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। সে মদনবাণে বিদ্ধ হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়ে যার। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে তার বন্ধুকে বলল এই রাজকন্যাকে না পেলে সে আর বাঁচবে না। তখন পেশায় ছুতোর তার এক বন্ধু বলে। বুদ্ধির জোরে সবই সম্ভব। নীতিশ্লোকে বলা হয়েছে –

ঔষধার্থসুমন্ত্রাণাং বুদ্ধেশ্চৈব মহাত্মনাম্।
অসাধ্যং নাস্তি লোকেঽত্র যদ্ ব্রহ্মাণ্ডস্য মধ্যগম্॥১/২০৪

অর্থাৎ, ঔষধ, অর্থ, সুমন্ত্রণা এবং মহৎজনের বুদ্ধির দ্বারা পৃথিবীতে সবই সম্ভব।

তখন ছুতোর দুঃখ ভারাক্রান্ত তাঁতিকে শান্ত করে বলে, আমি যন্ত্রচালিত গরুড় তৈরি করে দিচ্ছি। তুমি বিষ্ণুরূপ ধারণ করে গরুড়ে চড়ে কন্যান্তঃপুরে যাও। সেখানে সাত তলা ভবনে রাজকন্যা থাকে তাকে গিয়ে বাৎসায়নোক্ত বিধিতে ভজনা করো। ঠিক দেখা গেল বন্ধুর বুদ্ধিতে তাঁতি হয়েও সে রাজকন্যাকে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করে সুখে দিন কাটাতে

থাকে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – তিরন্দাজের তির ভুল নিশানায় যেতে পারে কিন্তু বুদ্ধিমানের বুদ্ধি অভ্রান্ত। যেমন –

একং হন্যান্ন বা হন্যাদিষুর্মুক্তো ধনুষ্মতা।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতোৎসৃষ্ট হন্তি রাষ্ট্রং সরাজকম্॥১/২০৯

অর্থাৎ, ধানুকী তির ছোঁড়ে যখন, কেউ তাতে মরতে পারে, নাও পারে, ঠিক নেই। কিন্তু বুদ্ধিমানে বুদ্ধি ছাড়লে সাবাড় হবে রাজা সমেত সমস্ত রাজ্যই।

এরপর 'কাকী কেউটে ও সোনার হার' গল্পে পঞ্চতন্ত্রকারের মতে বুদ্ধি বা কৌশল জানলে আকারে ছোট হলেও বীরের কাছেও হার মানতে হয় না। যেমন –

উপায়েন জয়ো যাদৃগ রিপোস্তদৃগ্ ন হেতিভিঃ।
উপায়জ্ঞেঽল্পকায়েঽপি ন শুরৈঃ পরিভূয়তে॥১/২১২

অর্থাৎ, কৌশলের দ্বারা যেভাবে শত্রুজয় করা যায়, তা অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারাও করা যায় না। কৌশল জানলে আকারে ক্ষুদ্র হলেও অনেক বীরের কাছেও হারতে হয় না।

পঞ্চতন্ত্রকারের বুদ্ধির বিখ্যাত গল্প 'খরগোশ ও সিংহ' এখানে খরগোশ আকারে ছোট হলেও বুদ্ধির জোরে সিংহকে হত্যা করতে সক্ষম হয়।

'সিংহ শেয়াল ও উট' গল্পে চতুরক নামে এক শেয়াল কৌশলে উটকে মারে। পরে সিংহ ও নেকড়েকে ফাকি দিয়ে বুদ্ধির জোরে উটকে একা ভক্ষণও করে। এ প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকার দেখিয়েছেন বুদ্ধির জোরে সবকিছু হয়। যেমন –

অবধ্যং চাথবাগম্যমকৃত্যং নাস্তি কিঞ্চন ।
লোকে বুদ্ধিমতাং বুদ্ধেস্তস্মাৎ তাং বিনিযোজয়েৎ॥১/৩৭৩

অর্থাৎ, দুনিয়ায় বুদ্ধিমানের বুদ্ধির কাছে অবাধ্য, অগম্য, অকৃত্য বলতে কিছুই নেই। অতএব, বুদ্ধি খাটাতে হয়।

'বক ও বেজি' গল্পে কাজ উদ্ধার করার জন্য বুদ্ধির জোরে শত্রুকে বিভ্রান্ত করে, পরাজিত করে, কীভাবে জয়ী হওয়া যায় পঞ্চতন্ত্রকার তা নিম্নোক্তভাবে দেখিয়েছেন। যেমন –

নবনীতসমাং বাণীং কৃত্বা চিত্তং সুনির্দয়ম্।

তথা প্রবোধ্যতে শত্রুঃ সান্বয়ো ম্রিয়তে তথা॥১/৪১১

অর্থাৎ, মুখের বাণী হবে ননীর মতো, হৃদয়টা হবে সুনির্দয়, শত্রুকে শিখিয়ে দিবে এমন বুদ্ধি-যাতে, তার সবংশে ধ্বংস হয়।

কাকোলূকীয় তন্ত্রে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ স্থিরজীবী বুদ্ধির লক্ষণ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। তার কথা থেকে বুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ও দ্বিতীয় লক্ষণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় । যেমন –

অনারম্ভো হি কার্যাণাং প্রথমং বুদ্ধিলক্ষণম্।
প্রারব্ধস্যান্তগমনং দ্বিতীয়ং বুদ্ধিলক্ষণম্ ॥ ৩/১২৭

অর্থাৎ, বুদ্ধির প্রথম লক্ষণ হলো কাজ শুরু না করা। আর বুদ্ধির দ্বিতীয় লক্ষণ হলো কাজ শুরু করলে ঠিকভাবে তা শেষ করা।

লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে প্রথমেই বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এখানে উপস্থিত বুদ্ধির জোরে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে যেভাবে রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন –

সমুৎপন্নেষু কার্যেষু বুদ্ধির্যস্য ন হীয়তে।
স এব দুর্গং তরতি জলস্থো বানরো যথা॥৪/১

অর্থাৎ, সেইতো বিজয়ী হয়, যে শত বিপদেও উপস্থিত বুদ্ধি না হারায়। যেমন করে বানর মাহাবিপদে পড়েও ঠিকই উদ্ধার পায়। এ প্রসঙ্গে গল্পটি হলো –

রক্তমুখ নামে এক বানর ছিল। সে রোজ সুমিষ্ট অমৃতের মতো জাম খেত আর করালমুখ নামে এক কুমিরকেও নিয়মিত দিত। একদিন করালমুখ কয়েকটি জাম স্ত্রীকে নিয়ে দিল। সে এই জাম খেয়ে তাজ্জব হয়ে স্বামীকে বলল, যে নিয়মিত অমৃততুল্য এই জাম খায় তার কলজেটা নিশ্চই অমৃত হয়ে আছে। সেটি খেয়ে জিহ্বার আস্বাদ মিটাতে চাই। স্ত্রীর কথানুসারে করালমুখ রক্তমুখকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে বলল তোমাকে মেরে তোমার কলজে খাওয়ার জন্য তোমায় নিয়ে চলেছি। ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করো। রক্তমুখ তখন বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, সেকথা আগে বলবে না, কলজেতো আমি জাম গাছে লুকিয়ে রেখেছি। করালমুখ কলজের জন্য আবার তাকে সমুদ্রের তীরে নিয়ে চলল।

তীরে পৌঁছার সাথে সাথে রক্তমুখ লাফ দিয়ে বলল, দূর হও বিশ্বাসঘাতক। এভাবেই উপস্থিত বুদ্ধির জয় দেখানো হয়েছে।

আবার অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে 'শতবুদ্ধি, সহস্রবুদ্ধি, একবুদ্ধি' গল্পে পঞ্চতন্ত্রকার দেখিয়েছেন, অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি। এখানে একবুদ্ধি বিপদের আশঙ্কা দেখে নিরাপদ আশ্রয়ে গেল কিন্তু শতবুদ্ধি, সহস্রবুদ্ধি বিপদকে আমলে না নিয়ে বুদ্ধির জোরে টিকে থাকবে সিদ্ধান্ত নিল। পরবর্তীতে একবুদ্ধি বিপদ থেকে ঠিকই রক্ষা পেল অপরদিকে শতবুদ্ধি, সহস্রবুদ্ধি অতি বুদ্ধির জন্য প্রাণ দিল। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – 'নৈকান্তে বুদ্ধিরপি প্রমাণম্'[৪] অর্থাৎ শুধু বুদ্ধিই মাপকাঠি নয়। ক্ষেত্র বিশেষে অন্য রকমও হতে পারে। তবে বাস্তবিকভাবে বুদ্ধিই সেরা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পঞ্চতন্ত্রকারের মতে –

ন যত্রাস্তি গতির্বায়ো রশ্মীনাং চ বিবস্বতঃ।
তত্রাপি প্রবিশত্যাশু বুদ্ধির্বুদ্ধিমতাং সদা॥৫/৪৬

অর্থাৎ, যেখানে বায়ু সূর্যকিরণ ঢুকতে পারে না সেখানে বুদ্ধিমানের বুদ্ধি অনায়াসেই ঢুকতে পারে।

সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় যে, অবস্থানুসারে বুদ্ধি খাটাতে হবে। তা নাহলে জীবনে সংকট নেমে আসতে পারে।

'অনির্বেদঃ শ্রিয়ো মূলম্'

লেগে থাকলে লক্ষ্মী মেলে।

জীবনে লেগে থাকলে তথা পরিশ্রম করলে অসাধ্য কাজও সাধন করা যায়। সফলতা লাভের জন্য পরিশ্রম করে লেগে থাকতে হয়। তাইতো বিষ্ণুশর্মা তৎপরতার সাথে লেগে থেকে বিজয়ী হওয়ার দৃষ্টান্ত বিভিন্ন গল্পে উপস্থাপন করেছেন। মিত্রভেদে 'সমুদ্র ও টিট্টিভ ' গল্পে সমুদ্রের তীরে টিট্টিভী এক জোড়া ডিম পাড়ল। পূর্ণিমার জোয়াড়ে সমুদ্র ডিম দুটো

ভাসিয়ে নিল। টিট্টিভ ক্ষুদ্র পাখি। সে কীভাবে সমুদ্রের কাছ থেকে ডিম ফিরিয়ে আনবে? এ প্রসঙ্গে নীতিবাক্যে বলা হয়েছে –

দুরধিগমঃ পরভাগো যাবৎ পুরুষেণ পৌরুষং ন কৃতম্।
জয়তি তুলামধিরূঢ়ো ভাস্বানপি জলদপটলানি।১/৩৩৩

অর্থাৎ, পুরুষ যতক্ষণ না শত্রুর সামনাসামনি মোকাবেলা করে, পৌরুষ না দেখায় ততক্ষণ পর্যন্ত উৎকৃষ্ট পদ বা প্রতিষ্ঠা লাভ করা কঠিন। সূর্য তুলায় আরোহণ করলে তবেই মেঘরাশিকে জয় করা সম্ভব হয়।

টিট্টিভ হাল ছড়ল না। সকল পাখিদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তাদের রাজা গরুড়ের কাছে গেল। গরুড় তার প্রজাদের কষ্টের কথা শুনে সান্ত্বনা দিয়ে বলল নিশ্চই এর ব্যবস্থা করছি। গরুড়ের পক্ষেও সমুদ্রের কাছ থেকে ডিম ফিরিয়ে আনা সম্ভব না। সে তার দেবতা বিষ্ণুর কাছে গেল। বিষ্ণু সমুদ্রকে ডিম ফিরিয়ে দিতে বলল। সমুদ্র তখন ডিম ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলো।

মিত্রপ্রাপ্তি তন্ত্রে 'সোমিলক, গুপ্তধন ও উপভুকক্তধন' গল্পে কর্মের জয় দেখানো হয়েছে। সোমিলকের স্ত্রী ভাগ্যকে বিশ্বাস করত। কিন্তু সে স্ত্রীর কথায় কান না দিয়ে কর্মের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করবে। এ প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকারের মতে –

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্যাণি ন মনোরথৈঃ।
ন হি সিংহস্য সুপ্তস্য পবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥২/১৩৫

অর্থাৎ, উদ্যম তথা পরিশ্রমের দ্বারাই কার্যলাভ হয়, মনোরথের দ্বারা হয় না। যেমন ঘুমন্ত সিংহের মুখে কখনও মৃগ প্রবেশ করে না।

এমনিভাবে বিষ্ণুশর্মা রাজকুমারদের কর্মে প্রবৃত্ত করার জন্য ভাগ্যের দোহাই না দিয়ে প্ররিশ্রম করে জীবনে জয়ী হতে পরামর্শ দিয়েছেন, যেমন –

উদ্যমেন বিনা রাজন্ন সিধ্যন্তি মনোরথাঃ।
কাতরা ইতি জল্পতি যদ্ ভাব্যং তদ্ ভবিষ্যতি॥২/১৩৬

অর্থাৎ, পরিশ্রম না করলে, হে রাজন! জীবনের কোনো সাধই সিদ্ধ হয় না। যা হবার হবে এ কথা কেবল দুর্বল ব্যক্তিরাই বলে থাকে।

অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে 'চার ব্রাহ্মণ ও সিদ্ধবর্তিকা' গল্পে দুঃসাহসী চার যুবক বদ্ধপরিকর, যে-কোনো মূল্যে ধন অর্জন করবে। পঞ্চতন্ত্রকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন পরিশ্রম করে দেহ খাটাতে পারলে বাঞ্ছিত ধন অবশ্যই পাবে –

ক্লেশস্যাঙ্গমদত্ত্বা সুখমেব সুখানি নেহ লভ্যন্তে ।
মধুভিন্মথনাযস্তৈরাশ্লিষ্যতি বাহুভির্লক্ষ্মীম্॥ ৫/৩২

অর্থাৎ, দেহকে কষ্ট না দিয়ে শুধু আরাম ভোগ করলে বিচিত্র সুখ এবং ধন-সম্পদ পাওয়া যায় না। যেভাবে লক্ষ্মী-নায়ায়ণ সমুদ্র মন্থনের পর পরিশ্রান্ত বাহু দিয়ে জড়িয়ে স্বর্গীয় সুখ পেয়েছিলেন।

'একতাপি বলম্'

একতাই বল।

জগতে একতার মতো বল আর নেই। একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে অনেক কঠিন কাজও সহজে করা যায়। সৃষ্টির ঊষা লগ্নে মানুষ একা ছিল, তাই তারা অসহায় ছিল। ঐক্যবদ্ধ জীবন গঠন করে প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা সফল হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রে* দেখা যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীও একত্রিত হয়ে অসাধ্য কাজও সাধন করেছে। আর একতাহীন জীবনে কঠিন পরিণতি নেমে এসেছে। মিত্রভেদ তন্ত্রে 'চড়ুই, কাঠঠোকরা, মাছি, ব্যাঙ ও হাতি' গল্পের (১/১৫) অবতারণা –

> এক হাতি চড়ুইয়ের ডিম ভেঙ্গে চুরমার করেছে। চড়ুই কোনোভাবে প্রাণে বেঁচে যায়। তার বিলাপ শুনে কাঠঠোকরা এগিয়ে এসে বলল, মাতাল হাতিটার অবশ্যই এর শাস্তি পেতে হবে। তখন চড়ুই, কাঠঠোকরা, মাছি, ব্যাঙ একত্রিত হয়ে বুদ্ধি করল। প্রথমে মাছি দুপুর বেলা হাতিটির কানে বীণাধ্বনির মতো শব্দ করতে থাকবে, যাতে আরামে বুদ্ হয়ে চোখ বন্ধ করে থাকে, সাথে সাথে কাঠঠোকরা ঠোঁঠ দিয়ে ওর চোখ বিদ্ধ

করে দিবে। এতে হাতিটি তৃষ্ণায় ছটফট করতে থাকবে। তখন গর্তের কাছে বসে থাকা ব্যাঙ ডাকতে থাকলে জলাশয় মনে করে হাতিটা গর্তে পড়ে মারা যাবে।

এভাবে তারা একজোট হয়ে কাজ করে প্রতিশোধ নিল। এ প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকারে উক্তিতে –

বহুনামপ্যসারাণাং সমবায়ো হি দুর্জয়ঃ।
তৃণৈরাবেষ্ট্যতে রজ্জুর্যয়া নাগোঽপি বধ্যতে॥১/৩৩৫

অর্থাৎ, ঘাসের মতো তুচ্ছ জিনিসের দড়িতেও শক্তি হয় দুর্জয়। তাতেই হাতি-ঘোড়া অনায়াসে বাঁধা যায়।

মিত্রপ্রাপ্তি তন্ত্রে কথামুখে দেখা যায় পায়রারাজ চিত্রগ্রীব জীবন ধারণের জন্য হাজার অনুচর নিয়ে ব্যাধের পাতা জালের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া চাল খেতে নামল। অমনি সমস্ত পাখি আটকা পড়ল। পায়রারাজ সকলকে ভয় না পেয়ে সাহস সঞ্চয় করতে বলল –

ব্যসনেষ্বেব সর্বেষু যস্য বুদ্ধির্ন হীয়তে।
স তেষাং পারমভ্যেতি তৎপ্রভাবাদসংশয়ম্॥২/৬

অর্থাৎ, বিপদে যে হতবুদ্ধি না হয়, সেই মনের জোরে নিশ্চিত বিপদ পাড়ি দিতে পাড়ে। এভাবে পাখিরা মনস্থির করে একত্রিতভাবে জাল সমেত উড়ে গেল। পরে পরম বন্ধু হিরণ্যকের সহায়তায় বিপদ মুক্ত হলো।

কাকোলূকীয় তন্ত্রে মন্ত্রী প্রজীবীর উক্তিতে পঞ্চতন্ত্রকার রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনীতি প্রসঙ্গে নিম্নোক্তভাবে একতাবদ্ধতার কথা আলোচনা করেছেন। যেমন –

মাহানপ্যেকজো বৃক্ষো বলবান্ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
প্রসহ্য ইব বাতেন শক্যো ঘর্ষয়িতুং যতঃ॥
অথ যে সংহতা বৃক্ষাঃ সর্বতঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।
তে ন রৌদ্রানিলেনাপি হন্যন্তে হ্যেকসংশ্রয়াৎ॥৩/৫৪

অর্থাৎ, অতি মজবুত মূলবিশিষ্ট বিরাট গাছও যদি একটি হয় তবে সামান্য ঝড়ো হাওয়ায়ও উৎপাটিত হতে পারে। অপরদিকে অনেকগুলো বৃক্ষের বদ্ধমূল বিস্তৃত থাকে বলে শক্তিশালী ঝড়েও উপড়ে ফেলতে পারে না।

লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে 'সিংহ ও উট' গল্পে এক ছুতোরের কয়েকটি উট ছিল। সেগুলো থেকে অনেক উট হলো। বিশাল উটের পাল। ওগুলো যখন একটি পালে থাকে তখন কোনো প্রাণী থেকেই ভয় থাকে না। কিন্তু একদিন প্রথম উটটি দল থেকে ছিটকে পড়ল। তা দেখে বনের সিংহ ওঁৎ পেতে থাকল। অমনি একা পেয়ে জাপটে ধরে মেরে ফেলল। এ হলো একা থাকার পরিণতি।

অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে পঞ্চতন্ত্রকার একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। বন্ধু হয়ে বন্ধুকে একা ফেলে রেখে যাওয়া ঠিক নয়। মিলেমিশে একত্রে একে অপরের পাশে থাকতে বলেছেন। যেমন –

যস্ত্যজ্বা সপাদং মিত্রং যাতি নিষ্ঠুরতাং সুহৃৎ।
কৃতঘ্নস্তেন পাপেন নরকে যাত্যসংশয়ম্॥৫/৮২

অর্থাৎ, বন্ধু হয়ে যদি নিষ্ঠুরের মতো বিপন্ন বন্ধুকে ফেলে রেখে চলে যায়, সেই পাপে সুনিশ্চিত সে নরকে যায়।

'অব্যাপারেষু ব্যাপারম্'

যেখানে নাক গলানোর দরকার নেই সেখানে নাক গলানো ঠিক নয়।

সমাজ জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে যেখানে কিছু বলতে গেলে এমনকি একটু চোখ তুলে দেখতে গেলেও অনেক সময় নিজের ঘাড়ের উপর অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বিপদ চলে আসে। পঞ্চতন্ত্রকার মিত্রভেদের প্রথম গল্পে দেখিয়েছেন – যেখানে নাক গলানোর দরকার নেই সেখানে নাক গলালে গোঁজ উপড়োন বানরের মতো নির্ঘাৎ মৃত্যু হতে পারে। বনের মধ্যে কারিগরেরা কাঠ ফালি করছিল। দুপুর বেলায় তারা যখন খাবার খেতে গেল, তখন একদল বানর আধাচেরা গাছের উপর লাফালাফি করছিল। একটি বানর আধাচেরা গাছের গোঁজ ধরে দিল টান। অমনি সাথে সাথে সে অর্ধ-চেরা গাছের চাপে মারা গেল। বিষ্ণুশর্মা তাই বলেছেন –

অব্যাপারেষু ব্যাপারম্ যো নরঃ কর্তুমিচ্ছতি।

স এব নিধনং যাতি কীলোৎপাটীব বানরঃ॥১/২১

অর্থাৎ, অপ্রয়োজনে কোনো কাজ করতে গেলে গোঁজ উপড়োন বানরের মতো মৃত্যু হতে পারে।

তাইতো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই করা ভালো। এর ব্যত্যয় হলেই বিপদ অবশ্যম্ভাবি।

‘ন হি অবিজ্ঞাতশীলস্য প্রদাতব্যঃ প্রতিশ্রয়ঃ’

যার স্বভাব-কুল-পরিচয় জনা নেই তাকে আশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

অনেক সময় অপরিচিত দুষ্ট লোক নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আপন হয়। জগৎ সংসারের সহজ সরল মানুষ এতে ভুলে গিয়ে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। ঐ দুষ্ট লোকগুলো অনেক সময় সুযোগ বুঝে বড় ধরনের ক্ষতি করে থাকে। তাই যাদের স্বভাব-কুল-পরিচয় জানা নেই, তারা যাতে ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য সাবধান হতে মিত্রভেদে ‘উকুন ও ছারপোকা’ গল্পের অবতারণা করা হয়েছে। মন্দবিসর্পিণী নামে এক উকুন রাজার বিছানায় থেকে রক্ত খেয়ে সুখে দিন কাটায়। একদিন অগ্নিমুখ নামে এক ছারপোকা এসে তার সাথে রক্ত খেতে চাইল। উকুন রাজী না হলেও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তাকে রাজী করাল। উকুন বলল, রাজামশাই ঘুমিয়ে পড়লে তুমি রক্ত খাবে। সে বলল ঠাকুরুণ যেমনটি বলছ তেমনটি করব। কিছুক্ষণ পর রাজা বিছানায় আসলে ছারপোকার আর তর সইল না, দিল এক কামড়। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুশর্মা বলেছেন –

স্বভাবো নোপদেশেন শক্যতে কর্তুমন্যথা।

সুতপ্তমপি পানীয়ং পুনর্গচ্ছতি শীততাম্॥

যদি স্যাচ্ছীতলো বহ্নিঃ শীতাংশুর্দহনাত্মকঃ।

ন স্বভাবেঽত্র মর্ত্যানাং শক্যতে কর্তুমন্যথা।১/২৬০-২৬১

অর্থাৎ, স্বভাব উপদেশ দিয়ে বদলানো যায় না। কেননা জল যতই গরম হোক না কেন ঠাণ্ডা হবেই। চাঁদ গরম আর আগুন ঠাণ্ডা হলেও, মানুষের স্বভাব কিছুতেই বদলায় না। রাজামশাই সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠে ভৃত্যদের ডাকলেন। বিছানায় নিশ্চই উকুন অথবা ছারপোকা আছে। উল্টিয়ে দেখল কাপড়ের ভাজে উকুন লুকিয়ে রয়েছে, ভৃত্যরা তাকে মেরে ফেলল আর ছারপোকা দ্রুতগতিতে কাঠের ভিতর ঢুকে পড়ল। তাই অনুস্মরণীয় –

ন হ্যবিজ্ঞাতশীলস্য প্রদাতব্যঃ প্রতিশ্রয়ঃ।
মৎকুণস্য চ দোষেণ হতা মন্দবিসর্পিণী॥১/২৫৫

অর্থাৎ, যার স্বভাব-কুল-পরিচয় জনা নেই তাকে আশ্রয় দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। যেভাবে ছারপোকাকে আশ্রয় দিয়ে আশ্রয়দাতা উকুনের প্রাণ গেল ।

‘কুল্যাং খননং কৃত্বা কুম্ভীরমানয়নম্’

খাল কেটে কুমির আনা।

গঙ্গদত্ত নামে এক ব্যাঙ জ্ঞাতি-গুষ্ঠির জ্বালায় খুব বিরক্ত। তাই সে তাদের ধ্বংস করার জন্য এক কেউটেকে আমন্ত্রণ করে আনল। এরপর থেকে কেউটে নিয়মিত খেতে খেতে তার জ্ঞাতি শত্রুদের সব সাবার করে ফেলল। সর্বশেষ তার পরিবারের সদস্যদের খেতে দেওয়ার জন্য বলল। গঙ্গদত্ত বলল না তা হয়না। এখন তুমি বেড়িয়ে যাও। কেউটে রাজী হলো না। একদিন গঙ্গদত্তের ছেলে যমুনা দত্তকে খেয়ে ফেলল। ছেলেকে খাওয়ার পরে তারস্বরে বিলাপ করতে লাগল। কিন্তু কেঁদে কোনো লাভ হলো না। পরের দিন তার স্ত্রীকে খেল। শেষ পর্যন্ত পরিবারের কেউ বাকি রইল না। পরে গঙ্গদত্ত মিথ্যাকে আশ্রয় করে অন্য ব্যাঙ আনার কথা বলে নিজের বাসস্থান থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচল।
এমতাবস্থায় গঙ্গদত্ত বুঝতে পারল অন্যের ক্ষতি করতে চাইলে তাতে নিজেরও ক্ষতি হতে পারে। এ প্রসঙ্গে গল্পকার বলেন –

যোঽমিত্রং কুরুতে মিত্রং বীর্যাভ্যধিকমাত্মনঃ।

স করোতি ন সন্দেহঃ স্বয়ং হি বিষভক্ষণম্॥৪/২৬

অর্থাৎ, যে বীর্যবান শত্রুকে অন্যের ক্ষতির জন্য বন্ধু করে এতে সন্দেহ নেই সে নিজ হাতে বিষ ভক্ষণ করে।

এভাবে *পঞ্চতন্ত্র*-এর নীতিকথা বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নৈতিক শিক্ষা অর্জন করা ও মেনে চলা মানব জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান। বিষ্ণুশর্মা নানাভাবে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন শিক্ষাকে। শিক্ষা বা জ্ঞানই মনুষ্যত্ব অর্জনের মূল চাবিকাঠি। এটি অর্জিত হলেই নৈতিকতাবোধ জন্ম নেয়। এরপর তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে অর্থের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে অর্থ ব্যয়, অর্থ সংরক্ষণ, দানের কথা, ভোগের কথা, বিনিময়ের বিষয় উল্লেখ করেছেন। এছাড়া নীতির ক্ষেত্রে তিনি লোভ ও লোভের পরিণতি, বুদ্ধির শক্তি, পরিশ্রমের সুফল, একতার প্রয়োজনীয়তা এবং অতি উৎসাহী হয়ে কোনো কাজ না করা প্রভৃতি অত্যন্ত যুক্তি সহকারে গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তিনি সৎ পথে থেকে অর্থ উপার্জনের নির্দেশনা দিয়েছেন। সেটি আজও সমভাবে প্রজোয্য। কিন্তু আজকাল যারা অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করছে সে অর্থ কোনো কাজে আসেনি, বরং অনর্থ সৃষ্টি করে তাদের জীবনে করুণ পরিণতি নেমে এসেছে। অনুরূপভাবে মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যা কিছু করছে তা শুধু অশুভ পরিণতির দিকে যাচ্ছে। এছাড়া *পঞ্চতন্ত্রে* পরিশ্রমের মূল্যায়ন, একতাবদ্ধতার শক্তি, অপ্রয়োজনীয় কাজ না করা, দুর্জন বিদ্বান হলেও ত্যাগ করা, বহুর সঙ্গে বিরোধ না করা, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ইত্যাদি ছাড়াও আরও নীতিকথা সর্বযুগে-সর্বকালে অনুকরণীয়। সেই সাথে পঞ্চতন্ত্রকারের নীতিশিক্ষা অধ্যয়ন মানবজীবনের সুন্দর-সুষ্ঠু-পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র

১. ন হি তদ্ বিদ্যতে কিঞ্চিদ্ যদর্থেন ন সিধ্যতি।

যত্নেন মতিমাংস্তস্মাদর্থমেকং প্রসাধয়েৎ॥১/২

প্রসূন বসু সম্পাদিত, বিষ্ণুশর্মা, *পঞ্চতন্ত্রম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১৫দশ খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩,পৃ.২৩৬

২. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ৩০২

৩. অকৃতত্যাগমহিম্নো মিথ্যা কিং রাজরাজশব্দেন।

গোপ্তারং ন নিধীনাং কথয়ন্তি মহেশ্বরং বিবুধাঃ ॥২/৭৪

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ৩০২

৪. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ৩৭৭

সপ্তম অধ্যায়

পঞ্চতন্ত্রে সমাজনীতি ও রাজনীতির আলোচনায় বিষ্ণুশর্মার সার্থকতা

ষষ্ঠ অধ্যায়ে *পঞ্চতন্ত্রে* নীতিশিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে পঞ্চতন্ত্রে সমাজনীতি ও রাজনীতির আলোচনায় বিষ্ণুশর্মার সার্থকতা বিষয়ে আলোচনা করা হবে। সমাজনীতি ও রাজনীতির আলোচনায় বিষ্ণুশর্মার সার্থকতা অনন্যসাধারণ। তিনি তাঁর অনুপম সৃষ্টি *পঞ্চতন্ত্রে* অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সমাজনীতি ও রাজনীতির নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এ গল্পগ্রন্থে তিনি অতি সাধারণ বিষয় থেকে আরম্ভ করে সমাজনীতি ও রাজনীতির জটিল ও কুটিল তত্ত্বগুলির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি সমাজনীতি ও রাজনীতির বিচিত্র বিষয় গল্পের মাধ্যমে পরিবেশন করায় তা পাঠকমানস ব্যাপকভাবে স্পর্শ করেছে। তিনি সহজ-সরল ভাষায় সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, নারীর অবস্থা, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, ধর্ম, কৃষি, খাদ্য, জ্যোতিষশাস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, কুসংস্কার, সংস্কৃতি, মানবতা- মনস্তত্ত্ব-আদর্শ-জীবন-প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি রাজনৈতিক বিষয়ের ক্ষেত্রে রাজসেবা, রাজধর্ম, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ষড়গুণ তথা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, রাষ্ট্রীয় নীতি-পদ্ধতি, বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি তথা মন্ত্রীদের ধর্ম-দর্শন, শত্রুতা, যুদ্ধ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, দুর্গ, ন্যায়বিচার, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ক্রিয়াকলাপ, রাজকর্মচারীদের ভূমিকা ও মতামতের যৌক্তিকতা প্রভৃতি দিক তুলে ধরেছেন। এ পর্যায়ে *পঞ্চতন্ত্রে* সমাজনীতি ও রাজনীতির আলোচনায় বিষ্ণুশর্মার সার্থকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বর্তমান সময়ে যেমন সবচেয়ে বড় বিষয় শিক্ষা লাভ করা, তৎকালীন সমাজেও শিক্ষার অত্যধিক গুরুত্ব ছিল। তাই বিষ্ণুশর্মা *পঞ্চতন্ত্র*-এর শুরুই করেছেন শিক্ষার কথা বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায় তিনি কতটা শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি রাজকুমারদের

উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সহজে যেভাবে তারা শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারে সেজন্য গল্প রচনা করে আনন্দের মাধ্যমে শেখাতে চেয়েছেন এবং তাতে তিনি সফলও হয়েছেন। তিনি শিক্ষা সম্পর্কিত নীতিশ্লোক সন্নিবেশিত করে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছেন। তাঁর এই শিক্ষাতত্ত্ব বর্তমান সময়েও অনেক কার্যকরী।

অর্থ সম্পর্কে পঞ্চতন্ত্রকার যে তথ্য দিয়েছেন আধুনিক অর্থনীতিতেও তাঁর সে মতবাদ অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেছেন – অর্থ কীভাবে উপার্জন করা যায়, অর্থ উপার্জনের জন্য কি ধরনের পন্থা অবলম্বন করতে হয়, অর্থশালী ব্যক্তির চরিত্র কেমন হয়, অর্থাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অবস্থা, অর্থ ভোগী ভৃত্যের অবস্থা, কোন ভৃত্যদের কখন কীভাবে অর্থ দিতে হবে, অর্থ আয় করা কেমন কষ্টকর, অর্থ কীভাবে ব্যয় করতে হবে, অর্থ ব্যয় করা কষ্টকর কি-না, অর্থের চেয়ে জীবন বড় কি না ইত্যাদি। এছাড়া অর্থের গতি-প্রকৃতি ও ধরন-ধারণ প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।[১] এছাড়া অর্থের সংরক্ষণ, অর্থ ব্যয়ের নীতিমালা প্রভৃতি অর্থনৈতিক বিষয়েও পঞ্চতন্ত্রকার বর্ণনা করেছেন। তবে এই গ্রন্থ গল্পসাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হলেও নান্দী শ্লোকে লেখক সকল অর্থশাস্ত্রকে পর্যালোচনা করে তাঁর গ্রন্থ রচনার কথা স্বীকার করেছেন।[২]

অর্থের বিষয় আলোচনার পরে তৎকালীন সময়ে ব্যবসার গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীতে ব্যবসায় চেয়ে ভালো পেশা আর কিছু নেই। কেননা ধন-সম্পদ উপার্জনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ব্যবসা। ব্যবসায় নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা যায়। বিষ্ণুশর্মা মিত্রভেদে সাত রকমের ব্যবসার কথা বলেছেন, যেমন – গন্ধদ্রব্যের ব্যবসা, নিক্ষেপ-প্রবেশ, যৌথ ব্যবসা, চেনা খদ্দেরের আগমন (দোকানদারী), মিথ্যে ক্রয়কথন, কূট দাড়িপাল্লায় ওজন, বিদেশ থেকে মালপত্র নিয়ে আসা।[৩] অপরদিকে কোন ব্যবসা ভালো, কোন ব্যবসা মন্দ, কোন ব্যবসায় বেশি উপার্জন করা যায়, কোন ব্যবসায় ক্রেতা ও বিক্রেতার চারিত্রিক অবস্থা কেমন হয়, সে সম্পর্কে *পঞ্চতন্ত্রে* বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চতন্ত্রে ভৃত্যবৃত্তির নানা দিক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ভৃত্য পরিপালনের জন্য পঞ্চতন্ত্রকার উদার হওয়ার কথা বলেছেন। যত টাকা-পয়সা থাক না কেন, কৃপণ হলে ভৃত্য তার কাছে থাকবে না।[৪] প্রভু যেমন ভৃত্যকে বিভিন্ন সুবিধাদি দেন, তেমনি ভৃত্যও নানা সুবিধাদির উপর ভিত্তি করে তার প্রতি আজ্ঞাবহ থাকে। এর ব্যত্যয় হলে ভৃত্য প্রভুকে ত্যাগ করবে। তাই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক কেমন ছিল, কার প্রতি কি কর্তব্য-কর্ম করতে হতো সে সম্পর্কে পঞ্চতন্ত্রকার নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন।[৫]

পঞ্চতন্ত্রকার তৎকালীন সমাজের কুসংস্কার সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তবে কুসংস্কার সম্পর্কে যে সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলো – উপমার আঙ্গিকে সমাজের কিছু চিত্র। তিনি সরাসরি সমাজের কুসংস্কারের কথা তুলে ধরেননি। তিনি নীতিকথা এবং গল্পের মধ্যে মানুষ, পশু-পাখি, জীব-জন্তু এমনকি প্রকৃতির নানা বিষয় নিয়ে কুসংস্কারের উদাহরণ দিয়েছেন। মিত্রভেদে 'গোঁজ উপড়োনো বানর' গল্পের শেষে বলা হয়েছে – 'দূর্বাপি গোরোমতঃ'[৬] অর্থাৎ, গোরুর লোমে দূর্বা। এটি অবাস্তব বিষয়। এছাড়া এই তন্ত্রে 'বিষ্ণুরূপধারী তাঁতি' গল্পে মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুক দিয়ে কার্য সিদ্ধির কথা বলেছেন।[৭] মিত্রপ্রাপ্তি তন্ত্রে 'অতিলোভী শেয়াল' গল্পে হিরণ্যকের উক্তিতে কুসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় – ছাগলীদের উড়ানো ধুলো এবং ঝাঁটার ধুলো উড়লে মানুষ যেমন সরে যায়, তেমনি প্রদীপের আলোয় পড়া খাটের ছায়া দেখলে লোকে দ্রুত সরে যায়। শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকায় কিছুই হয় না, সাপ হাওয়া খেয়ে জীবন ধারণ করে।[৮] অপরদিকে কাকোলূকীয় তন্ত্রে 'মিত্রশর্মা ও তিন ধূর্ত ' গল্পে বর্ণিত আছে যে, বিশেষ কোনো পশু এবং মৃতদেহ স্পর্শ করলে মানুষের মুক্তি নেই। তাতে শরীর অপবিত্র হয়ে যায়। তবে চান্দ্রায়ণ ও অন্যান্য নিয়ম পালন করে শুদ্ধি হওয়ার কথা বলা হয়েছে।[৯] তৎকালীন সময়ে মানুষ এসব মেনে চলত বলেই বিষ্ণুশর্মা তা প্রচ্ছন্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্তমান এই

আধুনিক যুগেও ক্ষেত্র বিশেষে এগুলোর ধারণা পোষণ করতে দেখা যায়। তবে বেশিরভাগ কুসংস্কার কৌতূহল উদ্দীপক আবার কতগুলো কিংবদন্তী যার বাস্তবিক কোনো ভিত্তি নেই।

পঞ্চতান্ত্রিক যুগে সমাজে জুয়াখেলা প্রচলিত ছিল। জুয়াখেলা একটি ভয়ঙ্কর নেশা। তবে এবিষয়ে বর্তমান সময়ের মত তৎকালীন সময়ে সামাজিক পর্যায়ে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। মিত্রভেদের প্রথমেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজার বিশ্বস্ত কর্মচারীরাও প্রাকাশ্যে রাজার কাছে জুয়াখেলার কথা প্রকাশ করেছে।[১০] এভাবে উক্ত গল্পে গোরম্ভ একাধিকবার জুয়ার নেশার কথা রাজার কাছে ব্যক্ত করেছে। যার জন্য রাজা তাকে একবারের জন্যও ধমক দেননি বা শাসন করেননি। এ থেকে তৎকালীন সময়ে প্রকাশ্যেই জুয়াখেলা হতো তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে নীতিগতভাবে জুয়াখেলা যে ভয়ঙ্কর কাজ এবং নিন্দিত ছিল তা 'গোঁজ-উপড়োন বানর' গল্পের শেষে দমনকের উক্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। [১১]

পঞ্চতন্ত্রে পূজা-যাগ-যজ্ঞ ব্রতপালন প্রভৃতি ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুরুতেই কথামুখে বিভিন্ন দেব-দেবী-মুণি-ঋষিদের বন্দনা করা হয়েছে। এছাড়া *বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র* বিবিধ ধর্মশাস্ত্র থেকে বহু শ্লোক দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি নানাভাবে ফুটে উঠেছে, যা ব্যাপক ধর্মবোধের পরিচয় বহন করে।

দাক্ষিণাত্যের রাজা অমরশক্তি চৌষট্টি কলায় পারদর্শী ছিলেন। এই কলাসমূহের মধ্যেও ধর্মীয় বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং তাঁর মন্ত্রিবর্গও ধর্মশাস্ত্রের কথা বলেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় অমরশক্তির রাজত্বকালে খুব ভক্তিসহকারে ধর্মচর্চা হতো এবং ধর্মীয় বিশ্বাসবোধও প্রবল ছিল। মিত্রভেদে দমনক, সঞ্জীবক ও পিঙ্গলকের কথোপকথনে ধর্মীয় নানা বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ধর্মের আড়ালে যেমন ভণ্ডামি ছিল, তেমনি ত্যাগী সন্ন্যাসীও ছিল। 'সন্ন্যাসী, ধূর্ত, শিয়াল ও দুই দুষ্টা' গল্পে দেবশর্মাকে একজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ও শিবের আরাধনাকারী আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসেবে দেখা যায়। তাঁর শিষ্য হিসেবে আষাঢ়ভূতির মনে দুষ্ট বুদ্ধি ছিল। কিন্তু সে 'ওঁ নমঃ শিবায়' বলে গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে এবং সংসার ধর্মের অসারতার বিষয়ে নানা আধ্যাত্মিক কথা ব্যক্ত করেছে। গুরুদেবও শিষ্যকে যা বলেছেন তা বস্তুত ধর্ম ও আধ্যাত্মিক উপদেশে পরিপূর্ণ।[১২] এছাড়া পাপ-পুণ্য বিচার, স্বর্গ-নরক-পরকাল, জীন-ভূতের-পূজাস্তুতি-বন্দনা প্রভৃতি সম্পর্কে ধর্ম বিষয়ক নানা তথ্য পাওয়া যায়।[১৩]

পঞ্চতন্ত্রে প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারীকে ভোগ্যা, দ্বেষ্যা, নিষিদ্ধা, অসম্মানের পাত্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছে ।[১৪] তবে ব্যতিক্রমও রয়েছে – কালোলূকীয় তন্ত্রে 'ব্যাধ ও কপোত দম্পতি' গল্পে স্বামী স্ত্রীর বিরহে কাতর হয়ে করুণ সুরে বিলাপ করেছে। স্ত্রীও স্বামীর প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করে পতিব্রতা নারীর পরিচয় দিয়েছে।[১৫] এখানে বিষ্ণুশর্মা স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসায় স্বর্গীয় সুখ দেখিয়েছেন। 'বিষ্ণুরূপধারী তাঁতি' গল্পে রাজার অন্তরে কন্যার জন্য ব্যাকুল চিত্তের নানা ধরনের আকুতি আমরা প্রত্যক্ষ করি। এ থেকে তৎকালীন সময়ে নারীর প্রতি পিতৃহৃদয়ের হাহাকারের সাথে অপত্য স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৬] লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে 'তিন মুনি' গল্পে কন্যা বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে যে স্বাধীন মতামতের কথা বলা হয়েছে তাও শিক্ষণীয়। গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় এর মধ্যে নারী চরিত্রের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। তবে সমাজ বাস্তবতায় সবযুগেই নারীকে দুর্বল-হীনজন মনে করে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে আসছে এবং দোষারোপ করে আসছে। *পঞ্চতন্ত্র*-এর যুগেও একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

তবে ভালো-মন্দ নানা বিষয়ে নারীদের সম্পর্কে আলোচনায় বিষ্ণুশর্মার সার্থকতা রয়েছে।

পঞ্চতন্ত্র-এর নানা স্থানে অতিথিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। অতিথিদের দেবতা জ্ঞানে সেবা এবং সন্তুষ্টি বিধান করা বিভিন্ন গল্পে লক্ষ্য করা যায়।[১৭] আবার

তাদের আদর-যত্ন, খোজ-খবর নেওয়াকে ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করে তা থেকেই স্বর্গ প্রাপ্তি তথা মোক্ষলাভের কথা বিষ্ণুশর্মা উল্লেখ করেছেন।[১৮] কালোলূকীয় তন্ত্রে 'ব্যাধ ও কপোত দম্পতি' গল্পে দরিদ্রতার জন্য অতিথিকে সেবা করাতে না পেরে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে আত্মোৎসর্গ করতেও দেখা যায়।[১৯] এভাবে অতিথিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিষ্ণুশর্মার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

পঞ্চতন্ত্রে সমাজের উচ্চবৃত্ত থেকে আরম্ভ করে নিম্নবৃত্ত পর্যন্ত মাদকাসক্তির বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। নারী-পুরুষ উভয়েই নেশায় আসক্ত ছিল। বিষ্ণুশর্মা নেশায় আসক্ত ব্যক্তির লক্ষণ, তাদের চরিত্র কেমন হয়, তারা কি ধরনের কাজ করতে পারে প্রভৃতি সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন।[২০] অপরপক্ষে যারা মাদকাসক্ত নয়, তাদেরকে লক্ষ্মী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২১] এখানে মাদকাসক্ত ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মাদকে অনাসক্ত ব্যক্তির প্রশংসা সর্বোপরি মাদককে নিরুৎসাহিত করায় পঞ্চতন্ত্রকারের সার্থকতা রয়েছে।

জ্যোতিষশাস্ত্র একটি বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র। বিষ্ণুশর্মা বিভিন্ন প্রসঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচিত বিষয়, যেমন – চন্দ্র-সূর্যের আবর্তন, ভবিষ্যৎ কথন্, গ্রহ-নক্ষত্রের বিচার-বিশ্লেষণ, ঋতু পরিবর্তনসহ প্রকৃতির নানা বিষয় তুলে ধরেছেন। তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে গল্পের ভিতরে কখনোবা নীতিবাক্যে জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে করণীয় সম্পর্কে বলেছেন। বিভিন্ন কাজে মানুষ এসব বিষয় মেনে চলে কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিষ্ণুশর্মার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

পঞ্চতান্ত্রিক যুগে নানা ধরনের খাবার সম্পর্কে জানতে পারা যায়। তখন উন্নত মানের খাবার থেকে আরম্ভ করে সাধারণ খাবারেরও প্রচলন দেখা যায়। সমাজের উচ্চ শ্রেণির লোকেরা ভালো-ভালো দামি খাবার খেতেন। যেমন – সুস্বাদু নানারকম ব্যঞ্জন – চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয় প্রভৃতি তৈরি খবার।[২২] আর সাধারণ লোকেরা বিভিন্ন সিমোই, মণ্ডা, মাসকলাইয়ের গুড়ো খেত। এছাড়া পশু-পাখির মাংস খাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পঞ্চতন্ত্রে স্বদেশপ্রেম ও বিদেশযাত্রা দুটি বিষয়ই লক্ষ্য করা যায়। মিত্রভেদের প্রথমে দমনকের উক্তিতে পঞ্চতন্ত্রকার স্বদেশপ্রেমের এক গভীর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন – অতি সহজেই বাবা-দাদার ভিটে-বাড়ি ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়।[২৩] মানুষ বিদেশে যায় টাকা উপার্জনের জন্য, কিন্তু টাকা আয়ত্ত হলে আর বিদেশ তার ভালো লাগে না। দেশের কথা মনে পড়ে, ফেরার পথে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সামান্য পথও অনেক দূর মনে হয়। এমনিভাবে পঞ্চতান্ত্রিক যুগে যেমন স্বদেশের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি বিদেশ যাত্রার প্রবণতাও বিভিন্ন গল্পে প্রত্যক্ষ করা যায়। মিত্রভেদে 'উকুন ও ছারপোকা' গল্পে অগ্নিমুখের উক্তিতে পেটের ক্ষুধার জন্য বিদেশ গমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু দেশকে ভালোবেসে তার মরা উচিত নয়। বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে থেকে বাবার কুয়োর খর জল খেয়ে কাপুরুষই বলে বেশ ভালো আছি। এছাড়া অন্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বিশ্বের সর্বত্র যে যেতে পারে, তার পক্ষে যে স্থান মঙ্গল সে স্থানই বেছে নেওয়া উচিত।[২৪] 'ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি' গল্পে পঞ্চতন্ত্রকার বিদ্যা, বিত্ত, শিল্প, কৌশল অর্জন করতে হলে অবশ্যই পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। এ থেকেও বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

কৃষি সম্পর্কে কাকোলূকীয় তন্ত্রে 'হরিদত্ত ও ক্ষেত্রদেবতা' গল্পে হরিদত্ত ব্রাহ্মণ হয়েও কৃষিকাজ করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ভালো ফসল উৎপাদন করতে পারেননি ঠিক, তবে ক্ষেত্রদেবতার পূজা দিয়ে আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও হীরক লাভ করেছিলো। *পঞ্চতন্ত্র*-এর নানা স্থানে তৎকালীন সমাজের কৃষক ও কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মিত্রভেদের প্রথমে 'সন্ন্যাসী, ধূর্ত, শেয়াল ও দুই দুষ্টা' গল্পে কৃষি ও অর্থকে সমান গুরুত্ব দিয়ে কৃষিকে কিভাবে সুরক্ষা করা যাবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ।

পঞ্চতন্ত্র-এর যুগে পোষাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য কাপড় তৈরির ক্ষেত্রে তাঁত শিল্পের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। *পঞ্চতন্ত্রে* অনেক গল্পেই তাঁতি চরিত্রটির দেখা মেলে। মিত্রভেদে তাঁতি প্রধান চরিত্র হিসেবে আছে 'বিষ্ণুরূপধারী তাঁতি' গল্পে। এছাড়া তাঁতি চরিত্রটি দেখা যায় – 'সন্ন্যাসী, ধূর্ত, শেয়াল ও দুই দুষ্টা' গল্পে। 'সোমিলক গুপ্তধন ও উপভুক্তধন' গল্পে সোমিলক চরিত্রটি হচ্ছে একজন তাঁতির। এ গল্প থেকে সূক্ষ্ম ও মোটা কাপড় বোনার কথা আমরা জানতে পারি। সোমিলক সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম, মিহি-মিহি কাপড় বোনায় পরদর্শী ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে দরিদ্র ছিল। অপরপক্ষে অন্যরা মোটা কাপড় বুনেও ধনী বনে গিয়েছিল।

এছাড়া বিষ্ণুশর্মা শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, কর্মবাদ, মানবতা, শান্তি ও সত্য সন্ধানের কথা বলেছেন। সেই সাথে যৌতুকপ্রথা, সতীদাহ, নরমাংস বিক্রি প্রভৃতি অসঙ্গতির কথা বলে সমাজের বাস্তবচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিষ্ণুশর্মা রাজনীতির ক্ষেত্রেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করেছেন। তিনি আশি বছরের প্রবীণ হয়েও রাজকুমারদের রাজনীতি শিক্ষার জন্য সংঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিলেন।[২৫] তাঁর রাজনীতির তত্ত্ব আধুনিক রাজনীতিতেও অনেক কার্যকরী। যেমন, তিনি রাজসেবা, রাজধর্ম, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ষড়গুণ তথা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, রাষ্ট্রীয় নীতি-পদ্ধতি, মন্ত্রীদের ধর্ম, শত্রুতা, যুদ্ধ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, দুর্গ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ক্রিয়াকলাপ, রাজকর্মচারীদের ভূমিকা ও মতামতের যৌক্তিকতা প্রভৃতি বিষয় নানা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আবার *পঞ্চতন্ত্র* রচনার প্রেক্ষাপটে দেখা য়ায়, কুমারদের বোধোদয়ের জন্য গ্রন্থটি রচিত হলেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এটি রাজনীতির বই। মূলত রাজকুমারদের রাজনীতি শিক্ষার জন্য বইটি রচিত হয়েছে। এ হিসেবে রাজনীতিতে বিষ্ণুশর্মার সার্থকতা রয়েছে।

রাজসেবা প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকার যে কথা বলেছেন, তা থেকে রাজনীতি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করা যায়। তাঁর মতে রাজাদের কাছাকাছি থাকতে হবে। আত্মাভিমান করে যে রাজার কাছে যাবে না সে রাজনীতি জানে না। তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চিত।[২৬]

রাজধর্ম হলো প্রজাদের মনোরঞ্জন বিধান করা। রাজা আদর্শিক কর্ম দ্বারা, ধর্মাচরণ দ্বারা, তাঁর স্বভাব, তাঁর মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করাই রাজধর্ম।[২৭] *পঞ্চতন্ত্রে* রাজাকে ধৈর্যশীল, বিবেকবান, উদার, মিষ্টভাষী, শ্রদ্ধাবান হয়ে রাজধর্ম পালন করতে বলা হয়েছে। ভৃত্যদের নিয়োগ ও পরিচালনা, দণ্ডবিধান করা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয়ে রাজাকেই বুদ্ধিদ্বারা, প্রজ্ঞা দ্বারা রাষ্ট্র রক্ষা করতে হয়। এছাড়া রাজাকে কঠিনে-নরমে সংমিশ্রিত একজন প্রশাসক হতে হয়। তিনি যদি শুধু উদার-দয়াল-কৃপাময় হন তাহলে রাজ্য পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। এভাবে রাজধর্ম প্রসঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনায় বিষ্ণুশর্মার সার্থকতা রয়েছে।

বিষ্ণুশর্মা যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতিতে সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ আলোচনা করে সামের মাধ্যমে অর্থাৎ শান্তিময় উপায়ে পরিস্থিতি সমাধানের কথা বলেছেন। কেননা রাজনৈতিক এই নীতিগুলোর মধ্যে সাম হলো আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পন্থা। তাই রাজনীতিতে সম্ভব হলে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যাওয়ার আগে সাম প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থাৎ মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়ে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে বিষ্ণুশর্মা পরামর্শ দিয়েছেন। এজন্য বলা যায় যে, রাজনীতিতে সামের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার সিদ্ধান্ত প্রদান করে বিষ্ণুশর্মা সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

পঞ্চতন্ত্রকার ষড়গুণ সম্পর্কে অর্থাৎ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় এবং দ্বৈধীভাব রাজনীতিতে ছয়টি করণীয় বিষয়ে যে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন, তা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় বড়ই প্রাসঙ্গিক। তিনি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ছয়জন মন্ত্রীর উক্তিতে স্থান-

কাল-পাত্রভেদে, কখন কোনটি প্রয়োগ করতে হয় সে পথও বাতলে দিয়েছেন। তাই রাজনীতিতে ষড়গুণের প্রয়োগে বিষ্ণুশর্মার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

রাজধর্মে মন্ত্রীদের উপদেশ বা মন্ত্রণা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে বিষ্ণুশর্মা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যে রাজা মন্ত্রীদের উপদেশ শোনেন না, তিনি নানা বাধা-বিপত্তিতে পড়েন। ফলে রাজ্যে নানা অনর্থের সৃষ্টি হয়। তারপরও রাজারা বস্তুতপক্ষে সংকটে না পড়লে মন্ত্রীদের উপদেশ শোনেন না। রাজা এবং মন্ত্রীর গোপন মন্ত্রণা যদি মন্ত্রী ফাঁস করে তাহলে সে নরকে পতিত হবে এবং পঞ্চতন্ত্রকার সেই মন্ত্রীকে ঘাতক বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৮] এভাবে মন্ত্রীদের দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে রাজনীতিতে বিষ্ণুশর্মা সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

রাজনীতিতে শত্রু থাকবে এটাই স্বাভাবিক। *পঞ্চতন্ত্রে* পদে পদে শত্রুর পদধ্বনি আমরা শুনতে পেয়েছি। তবে বিষ্ণুশর্মা পরামর্শ দিয়েছেন – শত্রুকে কখনও ছোট করে দেখা ঠিক নয়। শত্রুর ভিতরের খবর জেনে কৌশলে মোকাবেলা করতে হয়। অপরদিকে শত্রুর আক্রমণে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে প্রাণ যখন বিপন্ন, তখন শত্রুকে রাগান্বিত না করে প্রাণে বাঁচার জন্য অল্প অল্প উপহার দিয়ে খুশি করার কথা বলা হয়েছে। এভাবে শত্রুকে চিহ্নিত করতে, মোকাবেলা করতে এবং শত্রু থেকে সতর্ক হওয়ার ক্ষেত্রে রাজনীতিতে বিষ্ণুশর্মার সার্থকতা রয়েছে।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে যখন চরম মতানৈক্য বিরাজ করে তখন যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে, চরম সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও প্রাণহানিও ঘটে থাকে। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তবে রাজনীতি থাকলে যুদ্ধ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। *পঞ্চতন্ত্রে* বহু গল্পে এ রকম ঘটনা দেখা যায়। মিত্রভেদে 'শিয়াল ও দামামা' এবং 'বিষ্ণুরূপধারী তাঁতি' গল্পে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার চিত্র দেখা যায়। এছাড়া দমনকের কুপরামর্শে পিঙ্গলকের সাথে সঞ্জীবকের যুদ্ধ বাঁধে, তাতে সঞ্জীবকের মৃত্যু হয়। কাকোলূকীয় তন্ত্রেও আমরা যুদ্ধের অবস্থা দেখি। লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে 'কুমোর যুধিষ্ঠির' গল্পে

যুদ্ধের চিত্র দেখা যায়। এমনিভাবে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ এবং যুদ্ধের ফলাফল বিষ্ণুশর্মা বর্ণনা করেছেন। তবে যুদ্ধে যদি লাভ না হয় তবে সে যুদ্ধ বর্জনের কথা বলেছেন। বিশেষ করে তিনি সংকটময় পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের কথা বলেছেন। তাই রাজনীতিতে যুদ্ধ নয় শান্তি সেই মর্মবাণীও আমরা শুনতে পাই। রাজনীতিতে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দুর্গের বর্ণনা, ধৈর্যশীলতা, বন্ধুত্ব, পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তার দিক ও সৈনিকদের দায়িত্ব পালন ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় বিষ্ণুশর্মার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

এভাবে পঞ্চতন্ত্রকার সমাজনীতি ও রাজনীতির বিষয়ে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, পাঠককুল এসমস্ত বিষয় ধারণ করে প্রাগ্রসর হতে পারবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র

১. প্রসূন বসু সম্পাদিত, বিষ্ণুশর্মা, *পঞ্চতন্ত্রম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১৫দশ খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩,পৃ.২৩৭-২৪১

২. সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্ ।১/২

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৩৫

৩. তচ্চ বাণিজ্যং সপ্তবিধমর্থাগমায় স্যাৎ। তদ্ যথা গান্ধিকব্যবহারঃ নিক্ষেপপ্রবেশঃ গোষ্ঠিককর্ম পরিচিতগ্রাহকাগমঃ মিথ্যাক্রয়কথনং কূটতুলামানং দেশান্তরাদ্ ভণ্ডানয়নং চেতি।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৩৭

৪. কাচে মণির্মণৌ কাচো যেষাং বুদ্ধিবিকল্পতে।

ন তেষাং সন্নিধৌ ভৃত্যো নামমাত্রেঽপি তিষ্ঠতি॥১/৭৭

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৪২

৫. ন বিনা পার্থিবো ভৃত্যৈর্ন ভৃত্যঃ পার্থিবং বিনা।

তেষাং চ ব্যবহারেঽয়ং পরস্পরনিবন্ধনঃ॥

ভৃত্যৈর্বিনা স্বয়ং রাজা লোকানুগ্রহকার্যপি।

ময়ূখৈরিব দীপ্তাংশুস্তেজস্ব্যপি ন শোভতে॥

অরৈঃ সন্ধার্যতে নাভির্নাভৌ চারাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

স্বামিসেবকয়োরেবং বৃত্তিচক্রং প্রবর্ততে॥১/৭৯-৮১

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৪৩

৬. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৪৩

৭. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৫৮

৮. অজাধূলিরিব ত্রস্তৈর্মার্জনীরেণুবজ্জনৈঃ।

দীপখট্টোত্থচ্ছায়েব ত্যজ্যতে নির্ধনো জনৈঃ॥

শৌচাবশিষ্টয়াপ্যস্তি কিঞ্চিৎ কার্যং ক্বচিন্মুদা।

নির্ধনেন জনেনৈব ন তু কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্॥২/১০৪-১০৫

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ৩০৫

৯. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ৩০৩

১০.প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৫০

১১. দ্যূতং যো যমদূতাভং হালাং হালাহলোপমাম্।

পশ্যেদ্ দারান্ বৃথাকারান্ স ভবেদ্ রাজবল্লভঃ॥১/৫৮

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৩৯

১২. পূর্বে বয়সি যঃ শান্ত স শান্তঃ ইতি মে মতিঃ।

ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষু শমঃ কস্য ন জায়তে॥

আদৌ চিত্তে ততঃ কায়ে সতাং সম্পদ্যতে জরা।

অসতাং তু পুনঃ কায়ে নৈব চিত্তে কদাচন॥১/১৬৬-১৬৭

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৫২

১৩. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ১২৮-৩৬৯

১৪. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৪৯

১৫. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ৩৩৩

১৬. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৫৯

১৭. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৫৪

১৮. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ৩৪৬

১৯. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ৩৩৫

২০. মদবিহ্বলাঙ্গো মুক্তকেশঃ পদে পদে প্রস্খলন্ গৃহীতমদ্যভাণ্ডঃ সমভ্যেতি। তং চ

দৃষ্ট্বা সা দ্রুততরং ব্যাঘুট্য স্বগৃহং প্রবিশ্য মুক্তশৃঙ্গারা যথাপূর্বমভবৎ।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৫৪

২১. উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রং ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্ ।

শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদং চ লক্ষ্মীঃ স্বয়ং মার্গতি বাসহেতোঃ॥২/১২৫

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ৩০৯

২২. তদ্ যদি প্রসাদং করোষি তদস্য নৃপতের্বিবিধব্যঞ্জনান্নপানচোষ্যলেহ্যস্বাদ্বহারবশাদস্য শরীরে

যন্নিষ্টং রক্তং সঞ্জাতং তদাস্বাদনেন সৌখ্যং সম্পাদয়ামি জিহ্বায়া ইতি।

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৬৮

২৩. প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ৩২৫

২৪. পরদেশভয়াদ্ ভীতা বহুমায়া নপুংসকাঃ।

স্বদেশে নিধনং যান্তি কাকাঃ কাপুরুষা মৃগাঃ॥

যস্যাস্তি সর্বত্র গতিঃ স কস্মাৎ স্বদেশরাগেণ হি যাতি নাশম্।

তাতস্য কূপোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ পিবন্তি ॥১/৩২৪-৩২৫

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৭৭

২৫. 'নাহং বিদ্যাবিক্রয়ং শাসনশতেনাপি করোমি। পুনরেতাংস্তব পুত্রান্ মাসষট্কেন যদি নীতিশাস্ত্রজ্ঞান্ ন করোমি ততঃ স্বনামত্যাগং করোমি।'[৩]

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৩৬

২৬. যে জাত্যাদিমহোৎসাহান্নরেন্দ্রান্নোপযান্তি চ।

তেষামামরণং ভিক্ষা প্রায়শ্চিত্তং বিনির্মিতম্॥১/৩৮

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৪০

২৭. যঃ সম্মানং সদা ধত্তে ভৃত্যানাং ক্ষিতিপোঽধিকম্।

বিত্তাভাবেঽপি তং দৃষ্ট্বা তে ত্যজন্তি ন কর্হিচিৎ॥

সদাচারেষু ভৃত্যেষু সংসীদৎসু চ যঃ প্রভুঃ ।

সুখী স্যান্নরকং যাতি পরত্রেহ চ সীদতি॥২/২২-২৪

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৯৫

২৮. যো মন্ত্রং স্বামিনো ভিন্দ্যাৎ সচিবো সংনিয়োজিতঃ।

স হত্বা নৃপকার্যং তৎ স্বয়ং চ নরকং ব্রজেৎ॥

যেন যস্য কৃতো ভেদঃ সচিবেন মহীপতেঃ।

তেনাশস্ত্রবধস্তস্য কৃত ইত্যাহ নারদঃ॥১/২৭৫-২৭৬

প্রাগুক্ত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, পৃ. ২৭০

উপসংহার

মহামতি বিষ্ণুশর্মা সংস্কৃত সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক। *পঞ্চতন্ত্র* নামক তাঁর মহান সৃষ্টি গদ্যে-পদ্যে প্রণীত। তিনি গ্রন্থখানি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রচনা করেন। তিনি একটিমাত্র গ্রন্থ রচনা করে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। ভারতীয় মনীষীরা তাঁর গল্পের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে গল্পসাহিত্যের রচয়িতা হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি একজন সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও নীতিশাস্ত্রবিদ হিসেবে পরিগণিত। *পঞ্চতন্ত্রে* তিনি সমাজের কথা বলেছেন, রাজনীতির কথা বলেছেন, ন্যায়-নীতির কথা বলেছেন। মূলত মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির মূর্খ পুত্রদের সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করার জন্য তাঁর উপর দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি ঐ সুকুমারমতি রাজকুমারদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সকল বিদ্যার সংক্ষিপ্তসার হিসেবে *পঞ্চতন্ত্র* রচনা করেন।

পঞ্চতন্ত্রে উল্লিখিত সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, মানবজীবনের বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো সমাজ। সমাজে বহু রকমের অনুষঙ্গ থাকে। থাকে বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা, প্রথা-পদ্ধতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি। প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমাজে ভালো-মন্দ দুইয়ের অবস্থান পাশাপাশি রয়েছে। মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ভালোকেই সর্বাগ্রে গ্রহণ করতে হয়। পঞ্চতন্ত্রকার যথার্থভাবেই তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ভালো-মন্দ, প্রয়োজনীয় নীতিকথা ও দিক-নির্দেশনা উদাহরণসহ উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে সর্বাগ্রে তিনি শিক্ষার কথা বলেছেন। তবে তিনি প্রচলিত ও প্রথাগত শিক্ষার ধারণা দেননি। তিনি দিয়েছেন প্রকৃতির সান্নিধ্যে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার ধারণা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা-দর্শনেও এমনটি লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রকৃতির সান্নিধ্যে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী নির্মাণ করেছেন।

বিষ্ণুশর্মা রাজা অমরশক্তির পুত্রদের সুশিক্ষার জন্য বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। শিক্ষা ব্যতীত জীবনের সকল পর্যায়ে নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তার একটি সম্যক চিত্র *পঞ্চতন্ত্রে* দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বিষ্ণুশর্মা অত্যন্ত চমৎকার উদাহরণ তুলে ধরেছেন। যেমন, 'বানর চড়ুইনি' গল্পে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সুজনকে শিক্ষা দিলে ফল হয়, কিন্তু দুর্জনকে নয়। সুজন মানুষের জন্য সম্মান বয়ে নিয়ে আসে। পঞ্চতন্ত্রকারের সঙ্গে প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের শিক্ষাদর্শনের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শিক্ষা ও জ্ঞান সম্পর্কে সক্রেটিসে বলেছেন – 'পৃথিবীতে একটাই ভালো সেটি হলো জ্ঞান, আর একটি মন্দ সেটি হলো অজ্ঞানতা।' বর্তমানকালেও সকল অন্ধকার, অরাজকতা, অব্যস্থাপনা, দুর্নীতি প্রভৃতি বিদূরিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষাকেই একমাত্র আলোকবর্তিকা হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। *পঞ্চতন্ত্র* গ্রন্থটির মাধ্যমে আমরা অবগত হই তৎকালীন সমাজে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ *বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, নীতিশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ব্যাকরণ, তর্ক-মীমাংসা, মনুসংহিতা,* অন্যান্য *ধর্মশাস্ত্র,* চাণক্য প্রমুখের *অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নাদি কামশাস্ত্র* প্রভৃতি গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করতেন। এসব গ্রন্থের নানা দৃষ্টান্ত, দর্শন পঞ্চতন্ত্রকার বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট করেছেন। এভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞানের প্রমাণ মেলে।

পঞ্চতন্ত্রে শিক্ষার পরে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে, সেটি হলো অর্থ। অর্থ সমাজ-সভ্যতার মূল চালিকা শক্তি। পঞ্চতন্ত্রকার বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের উপায়, অর্থ ব্যয়ের পথ, বিত্তবানদের চরিত্র, অর্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি যে ছয়টি উপায়ের কথা বলেছেন সেগুলো সর্বকালে-সর্বযুগে সমভাবে প্রযোজ্য। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অর্থবান লোকের গুরুত্ব, তার প্রভাব, সম্মান ইত্যাদি বিষয় তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। পাশাপাশি দরিদ্র ও অর্থহীন লোকের দুর্দশার কথাও তাঁর বর্ণনায় বিধৃত হয়েছে। অর্থহীন লোকের ভদ্রতা, ক্ষমা, মাধুর্য ইত্যাদি গুণের মর্যাদা

সমাজ মূল্যায়ন করে না। বিষ্ণুশর্মা ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরন সম্পর্কেও অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। ব্যবসায় কি দোষ-গুণ রয়েছে, ব্যবসায়ীর কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়, সে সম্পর্কে তিনি একটি বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া ব্যবসায় লাভের দিক তথা কোন মালামালে লাভ বেশি, বিদেশে গিয়ে ব্যবসা করা, ব্যবসায় শ্রম ও সাধনা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এভাবে ব্যবসা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে পঞ্চতন্ত্রকারের বাণিজ্যতত্ত্ব বর্তমান সময়েও সমভাবে কার্যকর।

পঞ্চতন্ত্রে ভৃত্য বা কর্মচারী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ভৃত্যকে দেওয়া সুবিধাদির উপর নির্ভর করে প্রভুর প্রতি তার আনুগত্যের মাত্রা, প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক উভয়ের কর্তব্য-কর্মের উপর নির্ভর করে। রাজকর্মচারী হওয়া যেমন সম্মানের, তেমনি সেখানে পদে-পদে ভয় ও আশঙ্কা কাজ করে সেই বাস্তব বিষয়ের কথা বিষ্ণুশর্মা উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চতান্ত্রিক যুগে নানা ধরনের কুসংস্কারে সমাজ নিমজ্জিত ছিল। বিষ্ণুশর্মা গল্পের মধ্যমে তা চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। মন্ত্র-তন্ত্র, ঝার-ফুক প্রভৃতির উল্লেখও এখানে রয়েছে। বর্তমান সময়ে কতিপয় লোক এগুলো বিশ্বাস করলেও এর বাস্তবিক কোনো ভিত্তি নেই।

ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, পূজার্চনা, অহিংসাসহ বহুবিধ বিষয় সম্পর্কে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন দেব-দেবী, জিন-ভূতের প্রতি নির্ভরতার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া *পঞ্চতন্ত্রে* নিয়তি-বিধির-বিধান, পূর্বজন্মের কর্মফল, পাপ-পুণ্যের বিচার, স্বর্গ-নরক প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তবে তখন ধর্মকে পুঁজি করে মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হতো তার প্রমাণও পাওয়া যায়।

পঞ্চতন্ত্রকার এ গ্রন্থে নারীদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তবে তৎকালীন সমাজ পুরোপুরিভাবেই নারীবিদ্বেষী ছিল। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া নারীকে সর্বদাই

ভোগ্যা, দ্বেষ্যা, নিষিদ্ধা তথা তাচ্ছিল্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে নারী যেমন লোকের কাছে পড়বে তেমন ভাবেই চলবে। সেক্ষেত্রে পুরুষের ভালো-মন্দের উপর নারীর ভালো-মন্দ নির্ভর করে। তবে এখানে নারী চরিত্রের চটুলতার নানা দিক অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি নারীদের ব্যভিচারের বিষটিও তিনি উল্লেখ করেছেন। নারী স্বামীর প্রেম-ভালোবাসা ব্যতীত পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি পুরুষদের সাবধান হতে বলেছেন। সেই সাথে নারীর প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত না হতে পরামর্শ দিয়েছেন। আবার বিষ্ণুশর্মা জগৎ-সংসারে নারীর গুরুত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে নারীবিহীন ঘরকে অরণ্য হিসেবে অভিহিত করেছেন। নারীর মান-অভিমান, ভালো-মন্দ, সতী-সাধ্বী নারীর স্বামীপরায়ণতা, বিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়েও তিনি মত প্রকাশ করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো বর্তমান সময়েও যেখানে অনেক ক্ষেত্রে নারীরা পছন্দমত বর নির্বাচন করতে পারে না, সেখানে লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে 'তিন মুনি' গল্পে পছন্দমত বর নির্বাচনের কথা বলে তিনি নারীর স্বাধীনতার পথকে উন্মোচিত করেছেন। অপরদিকে নারীকে ভালোবেসে মর্যাদার শ্রেষ্ঠতম আসনে অধিষ্ঠিত করে মায়ের সাথে তুলনা করে প্রিয়ংবদা বলেছেন। তবে তৎকালীন সময়ে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে ব্যভিচার লক্ষ করা যায়। সেক্ষেত্রে নারীকেই বেশি দোষারোপ করা হয়েছে, শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এটি ঠিক হয়নি। কেননা এবিষয়ে নারী এককভাবে দায়ী নয়। সমাজ-সংসারের কঠিন বাস্তবতায় পুরুষের উপরও এর দায় পড়ে। বর্তমানে নারীর পক্ষে পশ্চিমাবিশ্বসহ সারা পৃথিবীতে নারীনীতি তৈরী হয়েছে।

পঞ্চতান্ত্রিক যুগে সমাজে জুয়াখেলা প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়ের মত তৎকালীন সময়ে জুয়াখেলায় তেমন কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। রাজার কর্মচারীরাও প্রাকাশ্যে রাজার কাছে জুয়াখেলার কথা প্রকাশ করেছে। সাধারণ কর্মচারী হয়ে একাধিকবার জুয়ার নেশার কথা রাজার কাছে ব্যক্ত করলেও রাজা তাকে একবারের জন্যও ধমক দেননি বা শাসন করেননি। এ থেকে তৎকালীন সময়ে প্রকাশ্যেই জুয়াখেলা প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়,

আজকের যুগে যেটি নিন্দিত ও অপ্রকাশযোগ্য বিষয়। তবে পঞ্চতন্ত্রকার জুয়াখেলা যে ভয়ঙ্কর নেশা তা ব্যক্ত করেছেন।

পঞ্চতন্ত্রকার তৎকালীন সমাজে শিক্ষা ও ধর্মীয় বক্তব্যের পাশাপাশি হিংসা, বিদ্বেষ, পরচর্চা-পরনিন্দা প্রচলিত ছিল সে বিষয়েও উল্লেখ করেছেন। তিনি অতিথিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা বলেছেন। অতিথি সেবাকে ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি কৃষি ব্যবস্থাপনা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি, বিশেষ করে সঙ্গীতের ব্যাকরণ সম্পর্কে জ্ঞানমূলক নির্দেশনা দিয়েছেন। এছাড়া সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি, যেমন – চুরি, ডাকাতি, মাদকাসক্তি, যৌতুকপ্রথা, মাৎস্যন্যায়, সতীদাহ, নরমাংস বিক্রি প্রভৃতির কথা বলে সমাজের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। একই সাথে খরা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কিত আলোচনাও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

বিষ্ণুশর্মার সমাজনীতিতে স্বদেশপ্রেমের নানা দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। শত প্রতিকূলতার মাঝেও পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি রক্ষার্থে শক্তিতে কম হয়েও প্রভাবশালীদের সাথে কীভাবে লড়তে হয়, কীভাবে পরাস্ত করতে হয় সে কৌশল তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। অপরদিকে উন্নত জীবন-যাপনের জন্য বিদেশ নীতিকেও মনেপ্রাণে ধারণ করতে বলেছেন। সর্বত্র যে যেতে পারে তাকে কূপমণ্ডুকের মতো দেশে না থেকে বিদেশ গিয়ে ভালোভাবে বাঁচতে এবং অর্থ উপার্জনের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন – ধীর মনস্বীর কী বা স্বদেশ আর কী বা বিদেশ? তিনি যে দেশেই আশ্রয় করেন বাহুবলে সে দেশকেই নিজের করে নেন। সিংহ যেমন দাঁত, নখ ও লেজ এই অস্ত্রগুলি নিয়ে যে বনেই ঢোকে, সেখানেই বড়ো বড়ো হাতিকে মেরে রক্তপান করে তৃষ্ণা মেটায়। তেমনি মানুষকে বিশ্বজনীনতায় বিশ্বাসী হয়ে জ্ঞানের দিকে ধাবিত হয়ে স্বপ্ন-সাফল্যকে ছিনিয়ে নিতে হয়।

সমাজে গতিশীলতার একটি প্রধান নিয়ামক হচ্ছে যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন। বর্তমান সময়ে মানুষ যেমন পারস্পরিক মেলামেশা বা তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজের

Dhaka University Institutional Repository

জীবনকে উন্নত করছে, পাঞ্চতান্ত্রিক যুগেও বিভিন্নভাবে যোগাযোগ, পারস্পরিক মেলামেশা, তথ্য আদান-প্রদানের বিষয়টি বিষ্ণুশর্মা উল্লেখ করেছেন। ওষুধ প্রযুক্তি, মানবদেহের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়াবলী, ভৌতিক অবকাঠামোগত বিদ্যা তথা স্থাপত্য চর্চার আভাস বিষ্ণুশর্মার রচনায় পাওয়া যায়। এ থেকে তাঁর বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় পাই।

পঞ্চতন্ত্রকারের সমাজনীতি যুগ-যুগ পেরিয়ে আজও মানুষের কাছে সমভাবে সমাদৃত ও অনুকরণীয়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের যুগেও সামাজিক বিকাশের ধারায় এই সামাজিকীকরণের নীতিবিদ্যাসমূহের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মানবজীবনে নীতিচর্চাকে সর্বদাই গতিশীল রাখা উচিত। জীবনে ব্যর্থ হলেও বা সর্বক্ষেত্রে সফলতা না পেলেও নীতিহীন কাজ করা উচিত নয়। অপরিণামদর্শীরাই নীতিভ্রষ্ট কাজ করে পরবর্তীতে তার মাশুল দেয়। বিষ্ণুশর্মা তাই কথামুখে বলেছেন –

অধীতে য ইদং নিত্যং নীতিশাস্ত্রং শৃণোতি চ।
ন পরাভবমাপ্নোতি শক্রাদপি কদাচন॥১/কথা-৭

অর্থাৎ, এই নীতিশাস্ত্র নিয়মিত যে অধ্যয়ন করে, সে ইন্দ্রের কাছে কখনও পরাজিত হয় না।

রাজনীতি সম্পর্কে বিষ্ণুশর্মার যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভাত হয়েছে তার সঙ্গে আধুনিককালের রাজনীতির নানা বিষয়ের সামাঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান, রাজা, রাজকর্মচারী প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তৎকালীন যুগের রাজসেবার উদাহরণ দিয়ে তিনি বিশেষ করে রাজভৃত্য, রাজকর্মচারী প্রমুখের কর্মকাণ্ড কীরূপ হবে তার একটি বাস্তব প্রেক্ষাপট অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। বিষ্ণুশর্মা রাজার দায়িত্ব-কর্তব্য, রাজার প্রশাসনিক কার্য, ভৃত্য নির্বাচন, রাজার প্রতি জনগণের কর্তব্য, রাজার বিচক্ষণতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে একটি বাস্তবসম্মত ধারণা দিয়েছেন। এখানে রাজাকে ধৈর্যশীল ও গুণবান শ্রোতা হতে বলা হয়েছে। রাজ দরবার নিয়ন্ত্রণ,

Dhaka University Institutional Repository

রাজগৃহের ভৃত্য ও রাজ কর্মচারী পরিচালনা, নিরাপত্তার ধরন প্রভৃতি বিষয়েও এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। অপরদিকে রাজভৃত্য, প্রজা সাধারণ রাজার প্রতি কী কী কর্তব্য পালন করবে, সে বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়েছে। এখানে ন্যায় বিচার, রাজধর্ম ও কর্মে প্রজ্ঞাবানদের পরামর্শ, সাম-দান-দণ্ড-ভেদ প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা পরিদৃষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে এখানে রাজনীতির ক্ষেত্রে শত্রু পক্ষকে পরাজিত করার বিভিন্ন কৌশল নানা উপমার সাহায্যে দেখানো হয়েছে। বন্ধুত্ব ও শত্রুতার প্রকৃতি সম্পর্কেও এখানে অত্যন্ত বাস্তধর্মী আলোচনা স্থান পেয়েছে। মন্ত্রীদের কর্তব্য-কর্ম সম্পর্কেও বিস্তৃত বর্ণনা সংযোজিত হয়েছে। শাসক শ্রেণির জন্য স্তুতিবাচক কিছু ঘটনার প্রাধান্য দিয়ে গল্পকার এখানে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের চরিত্রের বিভিন্ন রূপ তুলে ধরেছেন। এ বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে তৎকালীন রাজনীতি বিষয়ে বিষ্ণুশর্মার প্রজ্ঞা লক্ষ্য করা যায়, যা আজকের সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। অতীতের অভিজ্ঞতালব্ধ এই নির্দেশনা ভবিষ্যৎ রাজা, মন্ত্রী, রাজভৃত্য সেই সাথে জনগণের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে সহায়তা করবে। সর্বশেষে বলা যায়, রাজা ও রাজদরবারের সার্বিক কর্মপন্থা নির্ধারণে এই উপদেশগুলোর যথার্থতা ও আবশ্যিকতা রয়েছে।

নৈতিক শিক্ষা অর্জন করা ও মেনে চলার ক্ষেত্রে বিষ্ণুশর্মার পরামর্শগুলো প্রণিধানযোগ্য। এখানে তিনি নানাভাবে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সবচেয়ে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন । শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জিত হলেই নৈতিকতাবোধ অপনা-আপনি জন্ম নেয়। এরপর তিনি অর্থনীতির প্রসঙ্গে লোভের বশীভূত না হয়ে বুদ্ধির শক্তি, পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তার কথা স্পষ্ট করেছেন। তিনি সৎ পথে থেকে অর্থ উপার্জনের পরামর্শ দিয়েছেন। তা না হলে বিপদ নিশ্চিত। আজকের বাস্তবতায় এটি সমভাবে প্রজোয্য। যারা অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করছে সে অর্থ কোনো কাজে আসেনি বরং তাদের জীবনে করুণ পরিণতি নেমে এসেছে। এছাড়া একতাবদ্ধতার শক্তি, অপ্রয়োজনীয় কাজ না করা, দুর্জন বিদ্বানকে

Dhaka University Institutional Repository

ত্যাগ করা, বহুর সঙ্গে বিরোধ না করা, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা সেই সাথে খাল কেটে কুমির না আনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে নীতিকথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো সর্বযুগে-সর্বকালে অনুকরণীয়। তাই বিষ্ণুশর্মার এই সমাজনীতি, রাজনীতি ও নীতিশিক্ষা জীবনে ধারণ করলে মানবের কল্যাণ অবিশ্যম্ভাবী।

বিষ্ণুশর্মা যে বিষয়গুলোর উপর জোর দিয়েছেন তা হলো – সমাজ ও সভ্যতাকে গতিশীল রাখা ও ন্যায় পথে চলা। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে শিক্ষা, শিল্প, অর্থ, তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগ প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রযুক্তির নানারকম ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। প্রযুক্তির এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও বর্তমান সমাজে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, মনুষ্যত্বের বিকাশ তথা মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য বেশি বেশি নীতিবিদ্যার চর্চা করা উচিত। তা না হলে সমাজে তথা মানুষের মনে অন্যায়, অসত্য, দুরভিসন্ধি, পাপ, ঘৃণা, বিবেকহীনতা ইত্যাদি অসৎ গুণের জন্ম নেয়। এজন্য নীতি আদর্শের চর্চা বিশেষ জরুরি। তা না হলে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। তাই একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণ ও পরিচালনায় পঞ্চতন্ত্রকারের নীতিসমূহ অবশ্য গ্রহণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. প্রসূন বসু সম্পাদিত, বিষ্ণুশর্মা, *পঞ্চতন্ত্রম্, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* ১৫দশ খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩

২. M.R. Kale (ed.), *Pancatantra of Visnusarman,* Motilal Benarasidass Publishers Private Limited, Delhi, 7th Reprint, 2015

৩. দুলাল ভৌমিক অনূদিত, *পঞ্চতন্ত্র,* সাহিত্য বিলাস, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০

৪. শ্রীমলয়েন্দুকুমার সেন অনূদিত, *বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র,* ক্যালকাটা পাবলিকেশনস্, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৪

৫. অমিতা চক্রবর্তী, *বিষ্ণুশর্মাপ্রণীতম্ পঞ্চতন্ত্রম্ মিত্রভেদ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, বিধান সরণী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৫

৬. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, *নারায়ণ-প্রণীতঃ হিতোপদেশঃ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮

৭. নারায়ণ, *হিতোপদেশঃ,* প্রসূন বসু সম্পাদিত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার,* ১৩দশ খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২

৮. দুলাল ভৌমিক অনূদিত, *রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প,* সাহিত্য বিলাস, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬

৯. করুণাসিন্ধু দাস, *সংস্কৃত সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯

১০. সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য,* আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৬

১১. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

১২. বিমান ভট্টাচার্য, *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা,* বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, ষোড়শ মুদ্রণ, ২০০৪

১৩. Dr. S.K. De, *History of Sanskrit Poetics,* Firma KLM Private Limited, Calcutta, Second Edition, 1976.

১৪. এস রামকৃষ্ণ কবি সম্পাদিত, *ভরতনাট্যশাস্ত্রম্,* গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ নং ৬৮, ওরিয়েন্টাল ইনিস্টিটিউট, বরোদা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯৭

১৫. বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণঃ,* অধ্যাপক শ্রীবিমলাকাণ্ড মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা - ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

১৬. রামেশ্বর শ, *সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ

১৭. দেবকুমার দাস, *সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, বিধান সরণী, কলিকাতা ১৪০৪

১৮. যুধিষ্ঠির গোপ, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* সংস্কৃত বুক ডিপো, কলিকাতা প্রথম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৭

১৯. কানাইলাল রায়, *দণ্ডী প্রণীত দশকুমার চরিত,* সাহিত্য বিলাস, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১

২০. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত, *মহাভারত,* সারানুবাদ-রাজ শেখর বসু, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, ১৪২২

২১. বাল্মীকিকৃত, *রামায়ণ,* সারানুবাদ-রাজ শেখর বসু, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দশম মুদ্রণ, ১৩৯৬

২২. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১১

২৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোট গল্প,* মিত্র ও ঘোষ পারলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪১৬

Dhaka University Institutional Repository

২৪. সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র,* নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৪

২৫. শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *বৈদিক পাঠসংকলন,* শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কোলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪১৫

২৬. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, *সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পরিচয়,* বেদবাণী প্রকাশনী, গোপালগঞ্জ, ২০১৬

২৭. জ্যোতি বিশ্বাস, *সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত, ঐতিহাসিক ও সমাজিক বিশ্লেষণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮

২৮. হায়াৎ মামুদ, *ভাষা-শিক্ষা,* দি এ্যাটলাস পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭

২৯. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০২

৩০. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* সাহিত্য একাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০৪

৩১. মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২

৩২. অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত বাংলা অভিধান*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ